বনফুল
বীথিকা

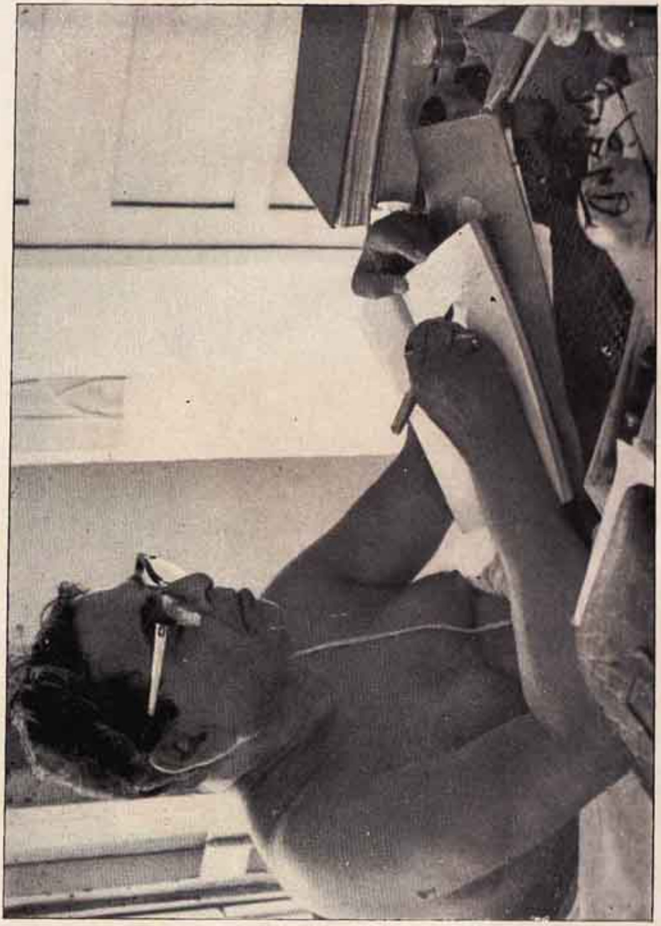

প্রসঙ্গত

এই গ্রন্থকে আমার লেখার 'চয়নিকা' বলা যাইতে পারে। আমার নানাবিধ রচনা হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া এই বীথি রচিত হইয়াছে। আমার উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটিকা, কবিতা, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য সব রকম লেখাই আছে এই বইটিতে। পাঠক-পাঠিকারা আমার লেখা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা এই পুস্তক হইতে করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এ-গ্রন্থে আমার ব্যঙ্গরচনার কোনও নিদর্শন সম্পাদকমহাশয় সংগ্রহ করেন নাই, সম্ভবত পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে।

বনফুল

এই পর্যায়ে আমাদের আরো দুটি বই

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিভূতি বীথিকা ১০·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তারাশঙ্কর বীথিকা ১০·০০

www.boiRboi.blogspot.com

সূচীপত্র

উপন্যাস

হাটে-বাজারে ৩—১৩৪

ছোটগল্প-নাটিকা

বেহুলা ১৩৭
চম্পা মিশির ১৪০
বিনতা দস্তিদার ১৪৬
রঘুবীর রাউত ১৫০
চম্পা ১৫৭
বীরেন্দ্রনারায়ণ ১৬২
হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে ১৬৫
সবিলা ১৭১
দুধের দাম ১৭৪
দন্ত-কৌমুদী ১৭৯
একই বারান্দায় ১৮১
পুত্র ১৮৫
স্মৃতির খেলা ১৮৮
অঙ্কুর ও বৃক্ষ ১৯৩
অন্তরালে ১৯৭
দাবী ২১৩
শিল্পী ২১৮
ঋণশোধ ২২২
সাঁতারের পোশাক ২২৭
সতী ২৩৩

শিক-কাবাব ২৩৯

কবিতা-প্রবন্ধ

নূতন বাঁকে ২৫৭
ললিত ঘাট ২৫৮
পঁচিশে বৈশাখ ২৫৯
গান্ধীজী ২৬০
রাজপথ ২৬১
বিভূতি ২৬১

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ২৬৩
বুদ্ধদেবের জীবনে নারী ২৭৫

শিশুসাহিত্য

যুগল যাত্রী ২৮৫
করুণা ২৮৭
অসম্ভব গল্প ২৯৪
খোকনের স্বপ্ন ২৯৬
পাখী ২৯৭
একালের রূপকথা ৩০০
স্বাধীনতা ৩০৯
ফুলদানীর একটি ফুল ৩১১

www.boiRboi.blogspot.com

উপন্যাস

www.boiRboi.blogspot.com

হাটে বাজারে

ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য মাছের বাজারের সামনে তাঁর মোটরটি থামালেন। তারপর ড্রাইভার আলীর দিকে চেয়ে বললেন—"গাড়ি বাঁয়ে দাবাকে রাখ্‌খো। আর টিফিন-কেরিয়ার ঠো লেকে হামারী সাথ আও।"

"বহুত খু—"

বাঁ দিকের গলি দিয়ে মাছের বাজারে ঢুকলেন সদাশিব। গ্রীষ্মকাল। একটা বেজে গেছে। মাছের বাজার উঠে গেছে প্রায়। একটা বুড়ী মেছুনী কানা-উঁচু পরাতের মতো একটা টুকরিতে কিছু ভোলা মাছ নিয়ে বসে' আছে তখনও। মাছগুলোর পেট বেলুনের মতো ফোলা।

অসময়ে ডাক্তারবাবুকে বাজারে দেখে সে একটু শশব্যস্ত হ'য়ে উঠল। একটু আগেই তো ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, আবার এলেন কেন! আলী টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে পিছু-পিছু আসছিল, সে নীরবে তার বাঁ হাতের তর্জনী এবং মধ্যমা সংযুক্ত করে' ঠোঁটের উপর রাখল, তারপর চোখের ভঙ্গী করে' জানিয়ে দিল—টুঁ শব্দটি কোরো না।

সদাশিব ভ্রূকুঞ্চিত করে' তাকে প্রশ্ন করলেন—"আবদুল কোথা—"

"আবদুল? গুদামে আছে বোধ হয়। কিংবা হয়তো বাড়ি চলে' গেছে।"

"আলী দেখ তো—"

"বহুত খু—"

আলী সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বন্‌বন্‌ করে' চলে' গেল গুদামের দিকে। আলীর ধরন-ধারণ হাব-ভাব অনেকটা সার্কাসের ক্লাউনের মতো। সদাশিব টিনের শেডের ছায়ায় আর একটু সরে' গেলেন। তারপর মেছুনীর দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন—"তোর নাতনী কেমন আছে—"

"ভালো আছে ডাক্তারবাবু।"

"যে-কটা ইন্‌জেকৃশন নিতে বলেছিলাম, নিয়েছে?"

বুড়ী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে পায়ের পাতাটা চুলকোতে লাগল, যেন শুনতে পায়নি। কিন্তু সদাশিব ছাড়বার পাত্র নন।

"দশটা ইন্‌জেক্‌শন নিয়েছে?"

"না। নেবার সময় পায়নি। তার স্বামী এসে তাকে নিয়ে গেল যে। কত মানা করলুম—"

গুম হ'য়ে রইলেন সদাশিব।

তারপর বললেন—"মজাটা পরে বুঝবে। পটাপট পেট থেকে যখন মরা ছেলে বেরুতে থাকবে তখন বুঝবেন বাবাজী—"

মেছুনীর নাতজামাইকেই বাবাজী বলে' উল্লেখ করলেন সদাশিব।

আবদুলকে নিয়ে আলী এসে হাজির হ'ল।

আলী আশঙ্কা করছিল বোমার মতো কেটে পড়বেন ডাক্তারবাবু। তা তিনি পড়লেন না। আবদুলের দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন—"টিফিন-কেরিয়ারে তোমার জন্যে মাছ রান্না করে' এনেছি। খাও। আমার সামনে খাও—"

আবদুলের চক্ষু ছানাবড়া হ'য়ে গিয়েছিল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে সদাশিবের দিকে।

"দেখছ কি, খাও—"

বুড়ী মেছুনী সভয়ে জিগ্যেস করল—"কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?"

"আবদুলকে জিগ্যেস কর। যে মাছ ও টাটকা বলে' একটু আগে আমাকে বিক্রি করেছিল তা নিজেই খেয়ে দেখুক টাটকা কিনা।"

"আমি বুঝতে পারিনি হুজুর। আমি ভেবেছিলাম ভাল করে' বরফ দেওয়া আছে, খারাপ হবে না।"

"হয়েছে কিনা খেয়ে দেখ নিজে—"

আলীর হাত থেকে টিফিন-কেরিয়ারটা ছিনিয়ে নিলেন তিনি। তারপর যা করলেন তা অপ্রত্যাশিত। এক টুকরো মাছ বের করে' গুঁজে দিলেন সেটা আবদুলের মুখে। তারপর টিফিন-কেরিয়ারটা দড়াম করে' ফেলে দিয়ে হনহন করে' চলে গেলেন চালপট্টির দিকে।

চালপট্টির এক কোণে ডিম বিক্রি করে রহিম। কালো, বেঁটে, মুখে বসন্তের দাগ। ভুরু প্রায় নেই। তার পাশে বসে' আছে তার মেয়ে ফুটফুটে ফুলিয়া। যদিও তার বয়স আট-ন' বছর, কিন্তু বসে' আছে যেন পাকা গিন্নীর মতো। রহিমের উপর নজর রাখবার জন্যে, তার মা তাকে বসিয়ে রেখে যায়। রহিমের একটু 'আলু' দোষ আছে। দবিরগঞ্জের রঙীন-কাপড়-পরা চোখে-কাজল-দেওয়া উন্নত-বক্ষা মেয়েগুলো যখন চাটের জন্য ডিম কিনতে আসে,

www.boiRboi.blogspot.com

তখন আত্মহারা হ'য়ে পড়ে রহিম। তাদের বাঁকা চোখের চাউনি আর ঠোঁট-টেপা হাসিতে অভিভূত হ'য়ে দামই নিতে ভুলে যায় সে অনেক সময়। কেন ভুলে যায় তা জানে হানিফা, রহিমের স্ত্রী। তাই সে ফুলিয়াকে নিযুক্ত করেছে পাহারায়। ফুলিয়া সম্ভবতঃ নিগূঢ় সব খবর জানে না, তবে সে এইটুকু জানে যে তার বাপজান অন্যমনস্ক হ'য়ে অনেক সময় ন্যায্য পয়সা নিতে ভুলে যায়। অন্যমনস্কতাজনিত এ অন্যায় তাকে সংশোধন করতে হবে, এ জ্ঞানটুকু আছে তার।

সদাশিব রহিমকে বললেন—"আমাকে দু'ডজন ভালো ডিম দিয়ে আয় গাড়িতে; দেখিস যেন পচা না হয়। আবদুল আজ পচা মাছ দিয়েছিল, খেতে পারিনি। ফুলিয়া, তুই দেখিস তোর বাবা যেন না ঠকায়।"

একটা পাঁচটাকার নোট বার করে' দিলেন তিনি রহিমকে। ফুলিয়া মিষ্টি হাসি হেসে চাইল ডাক্তারবাবুর দিকে, তারপর ডিম বেছে বেছে জলে ডুবিয়ে দেখতে লাগল যে ডিমটা দিচ্ছে সেটা ভালো কিনা। সদাশিব সানন্দে লক্ষ্য করলেন ফুলিয়া কানে দুটি ছোট ছোট মাকড়ি পরেছে। সোনার নয়, রূপার। কিন্তু মানিয়েছে বেশ। কিছুদিন আগে ডাক্তার সদাশিবই তার কান বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন।

"ডিমগুলো নিয়ে আয় গাড়িতে—"

চলে' গেলেন তিনি। অন্য কেউ হ'লে প্রত্যেকটি ডিম ভালো করে' দেখে দেখে নিত, কিন্তু সদাশিব দেখলেন না। কখনও দেখেন না, মাঝে মাঝে ঠকেন তবুও দেখেন না। জনশ্রুতি ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। কিন্তু অনেকবার ঠকেও সদাশিব ভয় পান না, কারণ তিনি গরু নন, মানুষ। তাই তিনি মানুষকে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করে' আনন্দ পান।

সদাশিব গাড়ির কাছে এসে দেখলেন আবদুল টিফিন-কেরিয়ারটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সদাশিবের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই চোখ নামিয়ে নিলে সে। সদাশিব থমকে দাঁড়ালেন, নিষ্পলক দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে অত্যন্ত কোমলকণ্ঠে বললেন—আজ কি হয়েছিল তোর! অমন পচা মাছটা আমাকে দিলি—"

"আমি বুঝতে পারিনি। তাছাড়া মাথারও ঠিক ছিল না—"

"মদ খেয়েছিলি নাকি—"

"না হুজুর। রমজুটা জ্বরে বেহোঁশ হ'য়ে গিয়েছিল। এখনও জ্বর ছাড়েনি—"

"ওষুধ দাওনি কিছু ?"

"না, এখনও দিইনি। ভেবেছিলাম এমনি সেরে যাবে—"

সদাশিবের চোখের দৃষ্টিতে আবার আগুন জ্বলে' উঠল।

"আমাকে বলনি কেন—"

আবদুল ক্ষণকাল চুপ করে' রইল।

তারপর বলল—"আপনাকে বার বার বিরক্ত করতে লজ্জা করে হুজুর—"

সদাশিব কিছু বললেন না। গুম হ'য়ে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন শুধু।

তারপর বললেন—"এখুনি আমি রমজুকে দেখতে যাব। গাড়িতে উঠে বোস—"

ঠিক এই সময় ফুলিয়া হাজির হ'ল ডিম আর বাকী পয়সা নিয়ে। আলী ডিমগুলো নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। সদাশিব পয়সাগুলো গুনে দেখলেন না। কেবল একটা এক-আনি তুলে দিয়ে দিলেন ফুলিয়াকে। ফুলিয়া একমুখ হেসে ছুটে চলে' গেল। স্মিত দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে রইলেন সদাশিব। তাঁর মনে হ'ল ফুলিয়া নামটা সার্থক হয়েছে ওর। সত্যিই ফুলের মতো।

দুই

ডাক্তার সদাশিবের মতো লোক সাধারণতঃ দেখা যায় না। কোনো ভালো জিনিসই সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না। হীরা-মুক্তা খোলামকুচির মতো পড়ে থাকে না পথেঘাটে। খনির অন্ধকারে অথবা সমুদ্রের অতলে ওদের জন্ম হয়, রহস্যময় উপায়ে। প্রচণ্ড চাপে কয়লা হীরকে পরিণত হয়, ঝিনুকের ভিতর সূক্ষ্ম বালুকণা প্রবেশ করে' সৃষ্টি করে মুক্তা। প্রচণ্ড চাপ অথবা বালুকণার প্রদাহ না থাকলে হীরা-মুক্তার জন্ম হ'ত না। সদাশিবের জীবনেও চাপ এবং প্রদাহ এসেছিল, কিন্তু সে তো অনেকের জীবনেই আসে, সবাই কি সদাশিব হয় ? সদাশিবের সদাশিবত্বের সম্ভাবনা নিগূঢ়ভাবে সুপ্ত ছিল তাঁর চরিত্রে, পরিবেশের প্রভাবে তা পরিস্ফুট হবার সুযোগ পেয়েছিল।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটা নিহিত কারণ থাকে পূর্বপুরুষদের জীবনধারায়। সদাশিবের পূর্বপুরুষদের সকলের খবর জানা নেই, কিন্তু সদাশিবের প্রপিতামহ সুরেশ্বর শর্মা একজন গৃহী সন্ন্যাসী ছিলেন একথা অনেকে জানে। রবীন্দ্রনাথের একজন পূর্বপুরুষ যেমন 'ঠাকুর' নামে খ্যাত ছিলেন, তেমনি 'দেবতা' বলে' বিখ্যাত হয়েছিলেন সুরেশ্বর শর্মা। সবাই তাঁকে 'দেবতা' বলে' ডাকত।

www.boighar.blogspot.com

বৈষ্ণব সাধু হয়েছিলেন তিনি। তাঁর কয়েকটা বিশেষত্ব ছিল। তাঁর নিজের খাবারটা তিনি বিতরণ করে' দিতেন। তিনি সামান্য দুধ এবং ফল খেয়ে থাকতেন। সংসার থেকে তাঁকে যে খাবরটা দেওয়া হ'ত সেটা তিনি পালা করে' এক একজন গরীবকে ডেকে খাওয়াতেন। আর স্বহস্তে সেবা করতেন সেই গাভীটিকে যার দুধ খেতেন তিনি। যে গাছগুলি তাঁকে ফল দিত তাদেরও সেবা করতেন। গাইটিকে নিয়ে বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা বাগানে বাস করতেন তিনি। সেইখানেই দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন সাধন ভজন করে'। কিছু জমি ছিল তাতেই সংসার চলে' যেত। উদরান্নের জন্য চাকরি বা ব্যবসা তাঁকে করতে হয়নি।

তাঁর ছেলে পীতাম্বরকে কিন্তু করতে হয়েছিল। তিনিই প্রথম গ্রাম ছেড়ে ক'লকাতায় যান একটা মার্চেন্ট অপিসের কেরানী হ'য়ে। প্রথমে দিনকতক একটা মেসে ছিলেন, তারপর বাগবাজারে গলির গলি তস্য গলির মধ্যে ছোট বাসা ভাড়া করেন একটা। সে বাসা আর তাঁরা ছাড়েননি। পুরুষানুক্রমে সেই বাসাতেই বাস করছেন।

সদাশিবের জন্ম ওই বাসাতেই হয়েছিল। ক'লকাতা শহরেই বাল্য ও যৌবন কেটেছিল তাঁর। ওইখানেই তিনি স্কুল আর কলেজের পড়া শেষ করে' মেডিকেল কলেজে ঢোকেন। মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করার আগেই বিয়ে হয়েছিল সদাশিবের। যখন বিয়ে হয়েছিল তাঁর বয়স বাইশ আর স্ত্রী মনুর (মনোমোহিনী) বারো।

নববধূরা তখন পায়ে পাঁয়জোর নুপূর আর মল পরত। ঝুমঝুম করে' শব্দ হ'ত যখন ঘুরে ফিরে বেড়াত তারা। গুরুজনদের দেখলে ঘোমটা টেনে দিত। পায়ে আলতা পরত, গোল খোঁপার মাঝখানে পরত সোনার চিরুনি, খোঁপাকে ঘিরে থাকত বাহারের ফুল-তোলা কাঁটা। খোঁপার বিনুনিই ছিল কত রকম। মনুর এই ছবিটা এখনও মনে পড়ে সদাশিবের। পাঁয়জোর আর মলের ঝুমঝুম শব্দ এখনও শুনতে পান তিনি। বিশেষ করে' একটা ছবি তাঁর মনে অক্ষয় হ'য়ে আছে। মনু যখন রাত্রে শুতে আসত তখন তার মুখে অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে উঠত। ঠিক সলজ্জ ভাব নয়, একটু লজ্জার আভাস থাকত অবশ্য, কিন্তু ভাবটা ঠিক সলজ্জ নয়, দুষ্টু-দুষ্টু। মাথার ঘোমটা সরে' যেত তখন। উপরের দু'তিনটি দাঁত দিয়ে কামড়ে থাকত পানে-রাঙা নীচের ঠোঁটটি। ভ্রূযুগল ঈষৎ

কুঞ্চিত, চক্ষু আনত, আর সমস্ত মুখে চাপা হাসির আভাস। সদাশিব ডাকলে বাঁ হাতের ছোট্ট কিল তুলে দেখাত। এই ছবিটি অম্লান হ'য়ে আছে সদাশিবের মনে।

সদাশিব পাস করেই চাকরি পেয়েছিলেন। অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল তাঁকে। চাকরি-জীবনেরও অনেক টুকরো টুকরো স্মৃতি গাঁথা আছে তাঁর মনে। অনেক এবং বিচিত্র। সদাশিব রিটায়ার করেছিলেন বিহারেরই একটা শহরে। সেইখানেই বাড়ি কিনেছেন একটা। আশে-পাশে কিছু জমিজমাও। ব্যাঙ্কে টাকাও জমিয়েছেন। জমানো টাকার যা সুদ পান তাতেই সংসার চলে' যায় স্বচ্ছন্দে। সংসারে খাবার লোকও বিশেষ কেউ নেই। মনু যৌবনেই মারা গেছে। একটি মাত্র সন্তান হয়েছিল, মেয়ে। সোহাগিনী। সোহাগিনীর বিয়ে হ'য়ে গেছে অনেকদিন আগে। জামাই সুজিত বড়লোকের ছেলে, বড় চাকরিও করে। বছরে দু'বার তারা সদাশিবের কাছে আসে কেবল। প্রকাণ্ড বাড়িটায় সদাশিব থাকেন তাঁর ভাইপো আর ভাইপো-বউকে নিয়ে।

ভাইপো চিরঞ্জীব কোন কাজকর্ম করে না। সদাশিবের জমিজমার তদারক করে সে, তাঁর নানারকম ফাইফরমাশও খাটে। এককথায় চিরঞ্জীব সদাশিবের প্রাইভেট সেক্রেটারি। সদাশিবের বৈষয়িক ঝামেলা এবং চারিত্রিক খামখেয়ালের সমস্ত ঝঞ্ঝাট সে-ই পোয়ায়। চিরঞ্জীবের বউ মালতীও নিঃসন্তানা। ঘরকন্নার ভার তার উপর। চাকর দাই রাঁধুনী সব আছে, কিন্তু কর্ত্রী সে-ই। মালতী মোটাসোটা কালো রং। চোখ দুটি বড় বড়। শরীর বেশ আঁটসাট। ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী, কিন্তু বেশী মোটা নয়। বেশ রাশভারী। চিরঞ্জীব তো বটেই, সদাশিবও ভয় করেন তাকে। সদাশিব আর একটা কারণেও তাকে সমীহ করেন—সে রাঁধে ভালো। নিরামিষ আমিষ দু'রকম রান্নাতেই সিদ্ধহস্ত। খাদ্যরসিক সদা-শিব তার এ প্রতিভাকে খাতির না করে' পারেন না। রোজ একটা তরকারি নিজের হাতে করে সে। বাকী রান্না ঠাকুরকে দিয়ে করায়। ঠাকুরকে দিয়ে করায় বটে, কিন্তু ঠাকুরের পিছনে সে দাঁড়িয়ে থাকে নিজে মহিষমর্দিনীর মতো, এক চুল এদিক ওদিক হবার উপায় থাকে না। মৈথিল ঠাকুর আজবলাল মালতীর তত্ত্বাবধানে থেকে প্রথম শ্রেণীর রাঁধিয়ে হয়েছে। সে-ও মালতীকে ভয় করে খুব। মুখে যদিও বলে 'লছমী

www.boighar.blogspot.com

মাঈ', কিন্তু মনে মনে জানে ও একটি বাঘিনী। একটু বেচাল হলেই প্রচণ্ড ধমক দেয়।

আজবলাল সদাশিবের কাছে অনেকদিন আছে। মনুর আমল থেকে। আট টাকা মাইনেতে বাহাল হয়েছিল। এখন তার সঙ্গে আর মাইনের সম্পর্ক নেই। ঘরের লোক হ'য়ে গেছে, যখন যা দরকার হয় নেয়। বিকেলের দিকে একটু সিদ্ধি খায় সে। ওইটুকুই তার বিলাস। বেশ তরিবৎ করে' সিদ্ধির শরবৎটুকু খায়। সদাশিব আপত্তি করেননি। সিদ্ধি খেয়ে আজবলালই বিপদে পড়ে মাঝে মাঝে। কোন কোন দিন তার মনে হয় সে মালতীর চেয়ে অনেক বড়, প্রায় তার বাপের বয়সী, তার মেয়ে জানকী বেঁচে থাকলে অত বড়ই তো হ'ত, সে কেন মালতীর ভয়ে গরুড়টি হ'য়ে থাকবে চিরকাল, মালতীরই বরং উচিত তাকে ভয় করা। মেয়েছেলেদের অমন খাণ্ডারনী হওয়া কি ভালো? তার উচিত মালতীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে মেয়েমানুষের বেশী 'তেজ' হওয়া ঠিক নয়। সিদ্ধির ঝোঁকে এই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে সে মালতীকে বোঝাতে যায় এবং বোঝাতে গিয়ে আরও বকুনি খায়। নিজেই শেষে সে বুঝতে পারে জল দিয়ে ধুয়ে লালজবাকে সাদাজবা করা যায় না।

কিছুদিন আগে সদাশিব যখন চাকরি থেকে অবসর নেন তখন তিনি অতীতের দিকে চেয়ে খোঁজবার চেষ্টা করেছিলেন জীবনে তাঁর এমন কোন প্রকৃত বন্ধু বা আত্মীয় আছে কিনা যার কাছে গিয়ে তিনি বাকী জীবনটা আনন্দে কাটাতে পারেন। যন্ত্রের ইঞ্জিন তেল, কয়লা বা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। মানুষ-ইঞ্জিনের সেটা দরকার, কিন্তু তার আর একটা জিনিস চাই, ভালবাসা। কেবল টাকার জোরে সুখে থাকা যায় না। বেঁচে থাকবার প্রেরণা চাই একটা, সে প্রেরণার উৎস হওয়া চাই মহৎ কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা অথবা ভালবাসা।

সদাশিবের জীবনে কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসার টানে জোয়ার আসেনি কখনও। তিনি সারাজীবন চাকরি করেছেন এবং ডাক্তারি করেছেন। নামকরা ডাক্তার ছিলেন অবশ্য, যেখানেই গেছেন তাঁর পসারের 'গর্জন' শুনেছে সবাই। কিন্তু নামকরা ডাক্তাররা ঠিক বৈজ্ঞানিক নন। তাঁরা অপর

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারকে প্রয়োগ করেন মাত্র। প্রয়োগ করে' পয়সা রোজগার করেন। তাঁরা অনেকটা কেরানীর মতো। আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিক যে প্রেরণার আনন্দে বিভোর হ'য়ে থাকেন, সে আনন্দ কখনও স্পর্শ করে না সাধারণ জেনারেল প্রাক্‌টিশনার ডাক্তারের চিত্তকে। জেনারেল প্রাক্‌টিশনারের একমাত্র লক্ষ্য জনপ্রিয় হওয়া এবং জনপ্রিয় হওয়ার উদ্দেশ্য উপার্জন। বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য সত্যের সন্ধান এবং প্রয়োজন হ'লে তার জন্যে দারিদ্র্য এবং অপমান বরণ করা।

এ প্রেরণা সদাশিবের জীবনে আসেনি কখনও। তিনি টাকা রোজগার করতেই চেয়েছিলেন এবং প্রচুর টাকা রোজগার করতে পেরেওছিলেন। কিন্তু টাকা রোজগার করতে করতে জীবনের শেষের দিকে এসে হঠাৎ তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে—এসব কিসের জন্য করছি? কার জন্যে? মনু তো চলে' গেছে অনেকদিন আগে, সোহাগেরও বিয়ে হ'য়ে গেছে—তবে? কিসের জন্যে এত পরিশ্রম, এত দুশ্চিন্তা? অতীতের দিকে ফিরে তিনি অনুভব করলেন ভালবাসবার মতো আর কেউ বেঁচে নেই। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যারা বেঁচে আছে, তারা নামেই আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। প্রেম নেই কারো মনে। আছে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা আর তার উপর একটা প্রেমের ভান। ঝুটো প্রেমের মেকি অভিনয়ে মন আরও বিষিয়ে ওঠে।

যে অদ্ভুত জীবন ডাক্তার সদাশিব আজকাল যাপন করেন—হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ানো—সে জীবন আরম্ভ করবার আগে যে জীবন তিনি যাপন করতেন তার কিছু আস্বাদন না পেলে বর্তমান জীবনের সম্যক্‌ অর্থ বোঝা যাবে না। সে জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায় তাঁর ডায়েরিতে। স্থান এবং তারিখের উল্লেখ না করে' তারই ঘটনাগুলি উদ্ধৃত করছি। ঘটনাগুলি একটানা ঘটেনি। মাঝে মাঝে সময়ের ব্যবধান আছে।

তিন

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম তাঁর স্ত্রীকে দেখতে। আমি ভেবেছিলাম বাড়াবাড়ি কোনও অসুখ বুঝি। কিন্তু গিয়ে দেখলাম তিনি বেশ সেজেগুজে সোফায় ঠেস দিয়ে বসে' আছেন। বললেন সকালের দিকে তাঁর মাথাটা বড্ড ধরে। আর কানের ডগা দিয়ে আগুনের হল্‌কা

www.boiRboi.blogspot.com

বের হয়। প্যাল্‌পিটেশনও আছে। শিরদাঁড়ার কাছটা শিরশির করে মাঝে মাঝে। সব বলবার পর হেসে বললেন, চিকিৎসার কোনও ত্রুটি করিনি। ক'লকাতার সব বড় বড় ডাক্তাররা দেখেছেন। ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিয়োগ্রাম, এক্সরে, অপারেশন সব হ'য়ে গেছে। একজন বড় ডাক্তারের নাম করে' বললেন—তাঁরই চিকিৎসায় আছি এখন। একগাদা রিপোর্ট আর প্রেস্কৃপ্‌সন্‌ বার করলেন আর সেগুলো এমনভাবে দেখাতে লাগলেন যেন গয়না দেখাচ্ছেন এবং দেখিয়ে গর্ব অনুভব করছেন।

আমার মনে হ'ল তিনি আমাকে চিকিৎসা করাবার জন্য ডাকেননি, তিনি যে বড় বড় ডাক্তার দেখাতে পারেন এবং হামেশাই দেখিয়ে থাকেন, এইটে সাড়ম্বরে আমার কাছে আস্ফালন করবার জন্যেই আমাকে ডেকেছেন।

ভদ্রমহিলার সন্তান হয়নি। হবার সম্ভাবনাও নেই। বয়স ত্রিশের কোঠায় মনে হ'ল, যদিও আমাকে বললেন পঁচিশ। দেখলুম নানারকম কম্‌প্লেক্স্‌ জট-পাকানো রয়েছে মনে। অকারণে বাপের বাড়ির গল্প করলেন খানিক। তাঁর কোন্‌ ভাই কবে বিলেত গেছেন তা বললেন। তাঁর যে ভাই এ. পি., সে যে বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে' ফিরেছে তা-ও কথায় কথায় জানিয়ে দিলেন। আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন মাঝে মাঝে গিয়ে খবর নি' তাঁর। বললেন—'একা এই জংগুলে দেশে পড়ে' আছি, একটা কথা বলবার লোক পর্যন্ত নেই। উনি তো সমস্ত দিন বাইরে বাইরে থাকেন। আয়া, বেয়ারা আর চাপরাসী নিয়ে কতক্ষণ আর কাটানো যায় বলুন? বই-টই পড়ি। কিন্তু বই সব সময়ে ভালো লাগে না। আপনি দয়া করে' আসবেন মাঝে মাঝে। এই ইন্‌জেক্‌শন-গুলো কি নেব?' একজন নামজাদা ডাক্তারের প্রেস্কৃপ্‌সন্‌, সুতরাং 'না' বলতে পারলুম না। বললাম, নিন। 'আপনি তাহ'লে দয়া করে' এসে দিয়ে যাবেন। যাবেন তো?' এবারও 'না' বলতে পারলাম না। যদিও বুঝলাম ও ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে তাঁর অসুখ সারবে না। অসুখ সারত একটি ছেলে হ'লে। কিন্তু হবে না, গত বছরই ইউটেরাসটি কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। টিউমার হয়েছিল নাকি। উনি নিজেও মনে মনে জানেন যে ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে কিছু হবে না। আমাকে ডাকছেন আমার সঙ্গ কামনায়। আমাকে সামনে বসিয়ে বক্‌বক্‌ করে' বকে' যাবেন খালি, নিজের

অন্তর্নিহিত নিদারুণ বেদনাটাকে চাপা দিয়ে বাহাদুরির ফুলঝুরি কেটে চেষ্টা করবেন নিজেকে এবং আমাকে ভোলাতে। আমাকে চাইছেন উনি ডাক্তার হিসেবে নয়, শ্রোতা হিসেবে। আমার চিকিৎসানৈপুণ্যে ওঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। একটা সাদা পট না থাকলে সিনেমার ছায়াছবি দেখানো যায় না। আমাকে উনি সেই সাদা পটের মতো ব্যবহার করতে চান।

www.boiRboi.blogspot.com

মনুকে আজ খুব বকেছি। একটা তরকারী নুনে পোড়া, মাংসটা আলুনি। রাঁধুনী রয়েছে, তবু বাহাদুরি করে' নিজে রাঁধতে যাওয়া চাই।...সমস্ত দিন মনু আজ কেঁদেছে। আসল কারণ অবশ্য ওর পিসেমশাই নিতাই-বাবু। ভদ্রলোককে ইতিপূর্বে দেখিনি কখনও। উনি এসে আমাদের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ। বারবার বলছেন কলিযুগে আমাদের মতো দম্পতি নাকি বিরল। হর-গৌরী আখ্যা দিয়েছেন আমাদের। মনু যখন রাঁধছিল তখন রান্নাঘরে গিয়েছিলেন তিনি। মনুকে রান্না শেখাচ্ছিলেন। মাংসে নুন না দেওয়াটাই বোধ হয় নূতনত্ব।

উনি কেন এসেছেন আমাদের কাছে আর কেনই বা আছেন এতদিন ধরে', তা বুঝতে পারিনি আগে। আজ বিকেলে বুঝতে পারলুম। ভেবেছিলুম মনুর প্রতি স্নেহবশতঃ এসেছেন বুঝি। কিন্তু দেখলাম তা নয়। পাওনাদারকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছেন। কালো কুচকুচে তাঁর পাওনাদারটি খুঁজে খুঁজে আজ এসে ধরেছিলেন তাঁকে। দুশমনের মতো চেহারা লোকটার। যদিও বাঙালী কিন্তু কথাবার্তার ধরন থেকে মনে হ'ল কাবুলির বেহদ্দ। প্রথমেই এসে 'শালা' সম্বোধন করলেন পিসেমশাইকে। তারপর গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন। এই নাটকীয় কাণ্ড ঘটতে লাগল আমার বৈঠকখানার বারান্দায়। বাধ্য হ'য়ে শেষে আমাকে বন্দুক বার করতে হ'ল।

পৃথিবীতে সবাই শক্তের ভক্ত, পাওনাদার মশাইও অবিলম্বে আমার ভক্ত হ'য়ে পড়লেন। শেষে বার করলেন তাঁর ন্যায্য পাওনার দলিলখানা। দেখলাম সুদে-আসলে তিনি পিসেমশায়ের কাছে পাঁচশ' টাকা পাবেন। আর একটা নাটকীয় কাণ্ড ঘটল। পিসেমশাই হঠাৎ আমার পা ধ'রে হাউ হাউ করে' কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, তুমি আমাকে

এখন ওই কশাইটার হাত থেকে বাঁচাও বাবা, আমি ফিরে গিয়েই টাকাটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি মনু বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে কাঁদছে। কিছুক্ষণ নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনুর এই নিদারুণ অপমানে আমিও যেন অপমানিত বোধ করতে লাগলাম। অনুভব করলাম টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। ড্রয়ার থেকে টাকাটা বার করে' বাইরে গেলাম। পাওনাদারের হঠাৎ একটা অন্য চেহারা বেরিয়ে পড়ল। সে বলল—টাকাটা দিচ্ছেন দিন, আমার ভালোই হ'ল, কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে' দিচ্ছি। নিতাইবাবুর কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। ও আপনাকে টাকা দেবে বলছে কিন্তু দেবে না। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আমাকে আজ দু'বচ্ছর ধরে' ঘোরাচ্ছে। আপনি অন্ততঃ একটা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিন ওর কাছে। তা না হ'লে টাকাটা মারা যাবে।

আমি জবাব দিলাম, সবাই তোমার মতো কশাই নয়। মুখে বললাম বটে, কিন্তু মনে মনে তারিফ করলাম লোকটার।

পিসেমশাই সেইদিন রাত্রেই উধাও হলেন। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে কিংবা মনুর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে' গেলেন না। উনি চলে' যাবার পর মনু আর একটা কথা বললে। 'জান? উনি আমার বিয়ের সময় বাগড়া লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন? বেনামী চিঠি লিখে দু'এক জায়গায় বিয়ে ভেঙেও দিয়েছেন।' এরাই কি আমার আত্মীয়? আশ্চর্য!

বিধুবাবুর ছেলের টাইফয়েড হয়েছে। প্রথমতঃ প্রতিবেশী, দ্বিতীয়তঃ গরীব মানুষ। ফি না নিয়েই চিকিৎসা করছিলাম। দুবেলা তো যেতামই, কোন কোন দিন তিনবারও গেছি। আজ সকালে গিয়ে দেখি একটি ফরসা ছোকরা বসে' আছে। বেশ ফিটফাট ছিমছাম। চোখে প্যাঁশনে, পরনে আদ্দি, পায়ে পেটেন্ট লেদারের 'শু'। আমি ঘরে ঢুকতে বিধুবাবু দাঁড়ালেন, কিন্তু সেই ছোকরা দাঁড়াল না। বিধুবাবু বললেন, ইনিই আমাদের প্রতিবেশী ডাক্তার সদাশিববাবু। পটলার চিকিৎসা ইনিই করছেন। আমি ডাক্তার শুনে ছোকরা এমনভাবে আমাদের দিকে চাইলে যেন সে কোন অদ্ভুত জীব দেখছে। তারপর বাঁ হাতটা তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—অ, আপনি এর চিকিৎসা করছেন। বসুন, বসুন,

আপনাকে অনেক কথা বলবার আছে। বিধুবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—ইনি কে? বিধুবাবু হাত কচলে উত্তর দিলেন—এ আমার ভাগ্নে, বিলাস। মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছে। পটলের প্রেস্কৃপ্‌সনের ও কিছু অদলবদল করতে চায়। ও বলছে আজকাল মেডিকেল কলেজে না কি···। থামিয়ে দিলুম বিধুবাবুকে। বললুম—আপনার ভাগ্নে এখনও ডাক্তার হন নি। আমি অনেক দিন ধরে' ডাক্তারী করছি। মেডিকেল কলেজে আজকাল কি ধরনের চিকিৎসা হচ্ছে তা আমিও জানি। আপনার ভাগ্নের মারফত সেটা আমার জানবার দরকার নেই। বিধুবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, হ্যাঁ, তাতো বটেই। তবে ও কি বলছে সেটা একবার শুনলে হ'ত না? আমি উত্তর দিলাম, না, যে এখনও ডাক্তারি পাস করেনি তার সঙ্গে আমি চিকিৎসা-বিষয়ে কোন কথা বলব না। আপনারা ওকে দিয়েই চিকিৎসা করান, আমি চললুম।

বাঙালীর ভদ্রতাবোধ কি একবারে চলে' গেছে? বিধুবাবু কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে বাহাদুরি দেখাবার জন্যেই এটা করলেন উনি। উনি বোধহয় অজ্ঞাতসারেই আমার কাছে জাহির করতে চাইলেন—দেখ হে, আমিও নেহাত কেউ-কেটা নয়। আমার ভাগ্নেও মেডিকেল কলেজে পড়ে, দু'দিন পরে তোমার মতোই ডাক্তার হবে। সত্যি, আমরা চাষা হ'য়ে গেছি। যে শিক্ষার প্রধান লক্ষণ বিনয়, সেই শিক্ষা লোপ পেয়ে গেছে আমাদের ভিতর থেকে। ছি, ছি।

রঘুবাবু ছেলের বিয়ে দিলেন খুব ধুমধাম করে'। বড়লোক কুটুম হয়েছে। ক'লকাতা থেকে রাঁধুনী এসেছিল, কাশী থেকে সানাই। শহরের অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বেশীর ভাগই অফিসার। হাসপাতালের ডাক্তার হিসাবে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। গিয়েছিলাম আমি। গিয়ে দেখলাম আয়োজনের কোনও ত্রুটি নেই! চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সব রকম ব্যবস্থাই আছে। মদের ব্যবস্থাও ছিল। পরের পয়সায় মদ খাওয়ার সুযোগ যারা ছাড়ে না, বাড়িতে যাদের জোলো চা ছাড়া অন্য কোন প্রকার পান-বিলাস নেই, তাদের অনেককেই দেখলাম দাঁত বার করে' গিয়ে আসর জমিয়েছে মদের টেবিলের ধারে আর উচ্চকণ্ঠে গুণগান করছে রঘুবাবুর কাল্‌চারের!

রঘুবাবু নিজে দেখলাম ব্যস্ত আছেন বড় বড় অফিসারদের নিয়ে। কমিশনার সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর পুলিস সাহেব—এই তিনজন সাহেবকে বসিয়ে ছিলেন তিনি একটি বিশেষভাবে সজ্জিত টেবিলে এবং সেইখানেই সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে হেঁ—হেঁ করছিলেন। আমাদের কাছে একবারও আসেননি। আমাদের অভ্যর্থনা করছিল তাঁর একজন মুহুরি।

ওভারশিয়ার সুরথবাবুর চরিত্রের একটা দিক সহসা উদ্ঘাটিত হ'ল আজ আমার কাছে। তাঁকে সাধারণ ঘুষখোর ওভারশিয়ার বলেই জানতাম। কিন্তু তিনি যে মানব-চরিত্রের গহনেও সন্ধানী-আলো নিক্ষেপ করতে সক্ষম, তা জানতাম না। এখানকার স্কুলের হেডমাস্টার গগন বসু প্রবীণ লোক, মাথার চুলে পাক ধরেছে। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

সুরথবাবু কিছুদিন আগে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁর বগলে একটা দাদ আছে, সেইটের জন্যে মাঝে মাঝে মলম নিতে আসেন আমার কাছে। কথায় কথায় সেদিন গগনবাবুর কথা উঠল। আমি বললাম, আপনাদের খুব ভাগ্য যে গগনবাবুর মতো পণ্ডিত চরিত্রবান লোক আপনাদের স্কুলের হেডমাস্টার। সুরথবাবুর চোখে-মুখে একটা কুটিল হাসির চমক খেলে গেল। তারপর বললেন, ভাগ্যই বটে। বলে' মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি একটু বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—অমন করে' হাসছেন যে। সুরথবাবু একটু দুলে মাথা নেড়ে বললেন, হাসি পেল বলেই হাসছি। আপনারা সাদাসিধে মানুষ, সকলের ওপরটা দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে যান। আমরা সব জানি কিনা তাই অত সহজেই মুগ্ধ হ'তে পারি না। জিগ্যেস করলাম, কি জানেন? তিনি একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, সব কথা কি বলা যায়! বলেই রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে চলে' গেলেন।

আজ যোগেন এসেছিল। যোগেন আমার বাল্যবন্ধু। সে হেসে আমাকে বললে—'কি রে, তুই আজকাল ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস নাকি?' 'কি রকম?' —আকাশ থেকে পড়লাম আমি। তখন যোগেন বললে—সে ট্রেনে যে কামরায় ছিল সেই কামরায় সুরথবাবু নামে একজন ওভারশিয়ার ছিলেন। তিনি তাঁর ইয়ারবক্সিদের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলেন। একজন তোর প্রশংসা করাতে সুরথবাবু বললেন—'তোমরা ওপরটা দেখেই গদগদ হ'য়ে পড়। কিন্তু আমি পারি না, কারণ আমি ভিতরের অনেক খবর জানি যে।

কিন্তু সে সব কথা বলে' আর লাভ কি? তবে এটা জেনে রাখ উনি ডুবে ডুবে জল খান।' আমি যে এতবড় একজন ডুবুরী তা আমার নিজেরই জানা ছিল না! দুনিয়ায় কত রকম মানুষই যে আছে!

www.boiRboi.blogspot.com

বাড়িতে মহা হুলুস্থূল পড়ে' গেছে। অনেকদিন পরে আমার এক বোন আমার কাছে চেঞ্জে এসেছে। তার অসুখবিসুখ কিছু নেই। কিন্তু ক'লকাতার লোকেদের চেঞ্জে যাওয়া একটা বাতিক। বিশেষতঃ কোথাও বিনা-পয়সায় থাকবার খাওয়ার জায়গা যদি থাকে তাহ'লে তো কথাই নেই, কোন রকমে থার্ড ক্লাসের ভাড়াটা যোগাড় করে' ছুটবে সেখানে। আমার আপন বোন নয়, পিসতুতো বোন। সে আসছে বলে' আমি সে অসন্তুষ্ট হয়েছি তা নয়, কিন্তু সে আসাতে আমার ভীষণ অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে।

আমার বোনের ছেলেমেয়েগুলো ভারি অসভ্য। পাঁচটা ছেলে, পাঁচটাই বর্বর। এসেই আমার ঘরের দামী পর্দাগুলো ধরে' ঝুলতে লাগল সবাই। একটা পর্দা ছিঁড়ে গেছে। ধমক দিলে শোনে না। আমার বোন ইনিয়ে বিনিয়ে তাদের মানা করে বটে কিন্তু ছেলেগুলো তার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করে না। বোনের বকুনিটাও বকুনির মতো শোনায় না, মনে হয় মানা করতে হয় তাই করছে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ভৎর্সনার সুরটা ঠিক ফুটছে না। বড় ছেলেটা, এসেই আমার রেডিওটা খারাপ করে' দিয়েছে। এই মফঃস্বল শহরে সারানো মুশকিল। ক্রিকেট ম্যাচের খবর শুনতে পাচ্ছি না। মেজাজটা বিগড়ে গেছে। ফুলবাগানটাকে তছনছ করে' দিলে। পটাপট করে' ফুলগুলো তো তুলছেই, গাছের ডালও ভাঙছে। আমার স্প্যানিয়েল কুকুরটাকে তো অতিষ্ঠ করে' তুলেছে। কেউ তার কান টানছে, কেউ ল্যাজ, কেউ তার পিঠে চড়ে' ধামসাচ্ছে। ভালো জাতের ভালো কুকুর তাই কিছু বলে না, আভিজাত্য একটু কম থাকলে কামড়ে দিত। আমার শখের বাইনকুলারটা তাক থেকে পেড়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে' দেখছে সবাই মিলে। তাদের ধরন-ধারণ দেখে মনে হয় এসব যেন তাদের বার্থরাইট। মামার বাইনকুলার নিয়ে দেখবে না তো কার বাইনকুলার নিয়ে দেখবে?

একজন ছুতোর মিস্ত্রী কিছুদিন আগে আমার রোগী হয়েছিল। তার স্ত্রীর কুষ্ঠের চিকিৎসা করেছিলাম, কিছু চাইনি। সে একটা ড্রেসিং টেবিল উপহার দিয়েছে আমাকে। চমৎকার একটি আয়না 'ফিট' করা আছে তাতে। আমার

বোন সেটা দেখে বললে—দাদা, আমাকে ওটা দাও না। তোমার তো আর একটা রয়েছে। বললাম—তুই একটা কিনে নিস, আমি দাম দিয়ে দেব। এখান থেকে ওটা নিয়ে যেতে হ'লে ভেঙে যাবে, তাছাড়া একজনের দেওয়া উপহার, নিজের কাছেই রাখা উচিত।

বোনের মুখভাব দেখে বুঝলাম আমার কথায় সে সন্তুষ্ট হ'ল না। মনু তাকে অনেকগুলো শাড়ি দিয়েছে, কিন্তু দেখলাম মনুর বাটিকের শাড়িটার উপর তার লোভ খুব। মনুকে বলেছি ওটা দিয়ে দিতে, আমি আবার তাকে কিনে দেব। মনু মুখে বললে, আচ্ছা। কিন্তু তার গম্ভীর মুখ দেখে বুঝলাম সে মনে মনে পছন্দ করেনি প্রস্তাবটা।

কিন্তু মনু সবচেয়ে চটেছে আর একটা ব্যাপারে। আমার বোনের বড় ছেলে টুলটুল আমার মেয়ে সোহাগের গালে কামড়ে দিয়েছে। সোহাগের বয়স পাঁচ বৎসর, টুলটুলের দশ। আমার বোন জিগ্যেস করলে, ও কি রে, ওর গালে অমন করে' কামড়ে দিলি কেন? টুলটুল হেসে উত্তর দিলে—গালটা ঠিক টমাটোর মতো যে! আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না, হাণ্টার বার করে' খুব চাবকেছি ছেলেটাকে। ভেবেছিলাম লাঠ্যৌষধি পড়েছে, এইবার ঠিক হয়ে যাবে সব। কিন্তু হ'ল না। আজ সকালে চাকরগুলো হৈ হৈ করে' ওঠাতে বেরিয়ে দেখলাম আমার বোনের মেজ ছেলে একটা হাঁসের গলা টিপে ধরেছে। পাতিহাঁস। নিখুঁত সাদা রং বলে' কিনেছিলাম একজোড়া। তারই একটার গলা টিপে ধরেছে ছেলেটা। আর একটু হ'লে মরে' যেত।…ভাবছি কবে এই সব পাপ দূর হবে বাড়ি থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, এদের দূর করতে চাইছি কেন! এরাই তো আমার আত্মীয়!

বিধুবাবুর ছেলে পটল কাল রাত্রে মারা গেছে। মেডিকেল কলেজের আপ-টু-ডেট্ ছাত্র বিলাস তাকে বাঁচাতে পারেনি। আমি তার চিকিৎসা আর করছিলাম না। করলেই বাঁচত কি?

রোগী আসে, রোগী যায়। কেউ বাঁচে, কেউ মরে। কিন্তু মনের উপর কেউ তো দাগ রেখে যায় না। আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কিছু বাড়ে শুধু। মনটা যেন নির্মম আয়নার মতো! কোনও ছবিই ধরে' রাখে না। যদি ক্যামেরার মতো হ'ত তাহ'লে কি ভালো হ'ত? অত ছবি রাখতাম কোথায়? মনের

চিত্রশালায় অত জায়গা কি আছে ? হঠাৎ মনে হ'ল আছে বই কি ? অনেক জায়গা আছে। কিন্তু রাখবার মতো ছবি একটাও পেয়েছি কি ?

আজ লক্ষ্মীবাজারে রোগী দেখতে গিয়ে অদ্ভুত জিনিস দেখে এসেছি একটা। লক্ষ্মীবাজার এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। লক্ষ্মীবাজারের প্রসিদ্ধি তার বাজারের জন্য নয়, তার গড়ের জন্য। প্রায় আধ মাইলব্যাপী বিরাট বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ আছে সেখানে। প্রবাদ, বহুকাল আগে সেখানে এক রাজবংশ বাস করতেন। তাঁদের উপাধি ছিল চৌধুরী। চৌধুরী বংশের এক রাজা লক্ষ্মী চৌধুরী (যাঁর নামের স্মৃতি বহন করছে লক্ষ্মীবাজার গ্রাম) তাঁর যৌবন-কালে নব-বিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে সহসা অন্তর্ধান করেন। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন তা কেউ জানে না। তিনি আর ফেরেন নি। কেউ বলে সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছেন, কেউ বলে মারা গেছেন, কারও মতে তিনি পর্তুগীজ বম্বেটেদের হাতে পড়েছিলেন, তারা তাঁকে আর তাঁর স্ত্রীকে আরবদের কাছে বিক্রি করে' দিয়েছে। এই ধরনের নানা জনশ্রুতি আছে তাঁর সম্বন্ধে। মোট কথা তিনি আর ফেরেননি। কোন খবরও পাঠাননি। তিনি চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অত বড় চৌধুরী গড় খালি হ'য়ে যায়নি। তাঁদের বংশের অনেকেই বেঁচে ছিলেন সেখানে অনেকদিন ধরে'। কিন্তু কালক্রমে ক্রমশঃ সব খালি হ'য়ে গেল। বংশে ছেলে হ'ল না কারও, মৃত্যুর করালগ্রাসে অবলুপ্ত হ'য়ে গেল অত বড় বংশ। বংশের শেষ প্রদীপ (কমলাপতি চৌধুরী) নির্বাপিত হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। তারপর থেকে প্রেতপুরীর মতো পড়ে' আছে অতবড় গড়টা। চারদিকে বনজঙ্গল গজিয়েছে, বড় বড় অশ্বত্থ বট বিদীর্ণ করেছে বিশাল অট্টালিকার পঞ্জরকে। জঙ্গলে সাপ আর শেয়ালের আড্ডা, গাছের মাথায় মাথায় শকুনদের। বাড়িটার ভাঙা ঘরগুলোর মধ্যে ভীষণ-দর্শন প্যাঁচাও আছে নাকি। দিনের বেলাতেও চৌধুরী গড়ের জঙ্গলে যায় না কেউ। কিছুদিন আগে এক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মালমসলা সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। সর্পাঘাতে মারা গেছেন। এ ঘটনার পর থেকে আর কেউ ওদিক মাড়ায় না।

আজ কিন্তু দেখে এলাম সেখানে লোকে লোকারণ্য, এক মহাসমারোহ পড়ে' গেছে। দীর্ঘকায় এক কাবুলী ঘোড়সোয়ার এসে হাজির হয়েছে সেখানে। সে আকারে ও ভাষায় কাবুলী বটে, কিন্তু তার পোশাকটা প্রায় বাঙালীরই মতো। তার ঘোড়াটাও প্রকাণ্ড। অত বড় ঘোড়া আমি অন্ততঃ দেখিনি।

সে নিজের নাম বলেছে, অ্যাচুট্‌অ্যাণ্ড। পরে বোঝা গেল ওটা অচ্যুতানন্দের কাবুলী সংস্করণ। তারা ভাষা কেউ বুঝতে পারছিল না। পাশের গ্রামের আগা সাহেব এসে তার বক্তব্যের মর্মোদ্ধার করেছেন। আগন্তুক পোস্তু ভাষায় আগা সাহেবকে যা বলেছে তাও বিস্ময়কর। সে বলেছে যে সে গৃহত্যাগী রাজা লক্ষ্মী চৌধুরীর বংশধর। লক্ষ্মী চৌধুরী কেন গৃহত্যাগ করেছিলেন তারই বিবরণ নিয়ে সে লক্ষ্মীবাজারে এসেছে। 'ল্যাখি চোড্‌রি'কে সে নিজে কখনও দেখেনি। তার জন্মের বহুপূর্বে তিনি মারা গেছেন। তিনি ছিলেন তাঁর ঠাকুরদার ঠাকুরদা। তিনি তাঁর গৃহত্যাগের বিবরণ একটি খাতায় লিখে রেখেছিলেন এবং মৃত্যুকালে ব'লে গিয়েছিলেন খাতাটি যেন লক্ষ্মীবাজারে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে' এখানে আসা এর আগে সম্ভবপর হয়নি এতদিন। তারপর বললে—"হঠাৎ আমরা একদিন লক্ষ্য করলাম যে খাতার কাগজ মলিন এবং ভঙ্গুর হ'য়ে গেছে। হাত দিলে ভাজা পাঁপরের মতো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তখন মনে হ'ল, আর দেরি করা উচিত নয়, আর দেরি করলে তাঁর শেষ ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করতে পারব না। তাই আমি এই খাতা নিয়ে এসেছি। ঘোড়াটি শোনপুরের মেলায় কিনেছি। ইচ্ছে আছে, ফিরবার সময় ট্রেনে যাব না, ঘোড়ার পিঠেই যাব।"

লক্ষ্মী চৌধুরীর লিখিত বিবরণের অধিকাংশই প্রায় পড়া যায়নি। লেখা অস্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেটুকু পড়া গেছে সেটুকু প্রণিধানযোগ্য। তার মর্ম এই—"আমি এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি যে আমাদের কেউ ভালবাসে না। আমরা প্রতিপত্তিশালী, আমরা ধনী, তাই সকলে বাধ্য হ'য়ে আমাদের আজ্ঞাবহ হ'য়ে থাকে। সেবা করে অর্থের বিনিময়ে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা ভয়ে। কারও মনে আমরা প্রেম সঞ্চার করতে পারিনি। এই সকল প্রভুত্বের সিংহাসনে বসে' আমাদের পূর্বপুরুষেরা সুখ পেয়েছেন, কিন্তু আমি পাচ্ছি না। আমার প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছে আমি যেন পাশবিক শক্তিবলে দুর্বলদের পীড়ন করছি। এ আমার পক্ষে অসহ্য। এখানে থেকে আমার সমস্ত সম্পত্তি যদি বিলিয়ে দিই তাহ'লেও আমার কাম্য সুখ আমি পাব না। কারণ এতদিন যেরূপে সকলে আমাকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে, সে অভ্যাসের মোহ তারা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না। আমি এমন কোন অপরিচিত স্থানে যেতে চাই যেখানে আমার কৌলীন্যের পরিচয় অর্থ বা প্রতিপত্তি দিয়ে কেউ মাপবে না, আমার চারিত্রিক মহত্ত্ব দিয়ে মাপবে। যে সমাজে আমি অপরিচিত অচেনা

www.boiRboi.blogspot.com

আগন্তুক সেই সমাজে গিয়েই আমি নূতন রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমার পূর্বপুরুষদের অর্জিত সম্পত্তি তাই আমি ত্যাগ করে' চলে' যাচ্ছি। আমার বংশের অন্যান্য শরিকরা অথবা গ্রামবাসীরা সে সম্পত্তির যে-কোনও রূপ সংব্যবস্থা করতে পারেন করুন, আমার আপত্তি নেই। পৈতৃক সম্পত্তির উপর আমার সমস্ত দাবি আমি ত্যাগ করলাম।”

রাজা লক্ষ্মী চৌধুরী যা যা বলেছেন তা কি সকলের সম্বন্ধেই সত্য নয়? আমাদের দেশে এরকম মহাপুরুষ আরও অনেক আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি।

প্রাণ-পতি সাধু নাম। সুদখোর বেনে। কারও প্রাণ-পতি হ'তে পারে নি, ধন-পতি হয়েছে অনেকের। অনেকের সম্পত্তি নিলাম করিয়েছে। সাধুও নয়, অসাধু। জাল দলিল বার করে' সর্বনাশ করেছে অনেকের। আমি তার বাড়িতে চিকিৎসা করেছিলাম কিছুদিন। অনেক ফি বাকি আছে। আজ দেব কাল দেব করছে। এখনও দেয় নি। ওষুধের দামও বাকি আছে অনেক। আজ সকালে এসে বলেছিল সে নাগেদের দোকানে জিগ্যেস করে' দেখেছে ওষুধের দাম নাকি আমি অনেক বেশি নিয়েছি। অর্ধেক হওয়া উচিত। দারোয়ান দিয়ে দূর করে' দিলাম লোকটাকে। দারোয়ান যখন তার হাত ধরে' টেনে বারান্দা থেকে নামিয়ে দিলে, তখন ভেবেছিলুম একটা প্রতিবাদ অন্ততঃ করবে। কিন্তু কিছু করল না, সুট সুট করে' চলে গেল। অথচ শুনেছি ওর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নাকি লক্ষ টাকার উপর।

রায়সাহেব উপাধি দিয়ে গভর্নমেণ্ট অকস্মাৎ আমাকে বিব্রত করেছেন। আমি এর জন্যে কিছুমাত্র চেষ্টা করিনি, পাবার জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িতও ছিলাম না। কমিশনার সাহেবের হাইড্রোসিলটি ভাল করে' অপারেশন করে' দিয়েছিলাম বলেই সম্ভবতঃ এই অযাচিত পুরস্কারটি পেলাম। এ যেন সাপের ছুঁচো-গেলা হয়েছে। গিলতেও পারছি না, ফেলতেও পারছি না। আমার চেনা-শোনা অনেকেই কিন্তু গদগদ হ'য়ে পড়েছেন দেখছি। রোজই অভিনন্দন জানিয়ে পত্র আসছে। আমার শালী 'রায়সাহেব ডকটর সদাশিব ভট্টাচার্য এম্-বি' ইংরেজী হরপে ছাপিয়ে লেটার প্যাড করিয়ে পাঠিয়েছে জলন্ধর থেকে। আমার যে বন্ধুর সঙ্গে কোনকালে বন্ধুত্ব ছিল না, যিনি বহুকাল আগে কিছুদিনের জন্য আমার সহপাঠী ছিলেন মাত্র, তিনি সন্দেশ খাওয়াবার দাবি জানিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। হে সদাশয় কমিশনার সাহেব, এ কি বিপদে ফেললে আমাকে!

www.boiRboi.blogspot.com

আজ আমার ডিস্পেনসারির সামনে বেশ একটা মজার দৃশ্য দেখলাম। উচ্চকণ্ঠের কলরব শুনে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি একদল হাফ্প্যাণ্টপরা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে উত্তেজিত হ'য়ে। কথাবার্তাও উত্তেজিত। কারণটাও চোখে পড়ল। হাফ্প্যাণ্টপরা ছেলেগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করলাম একজন আড়ময়লা খাকি একটা ফুলপ্যাণ্ট পরে' রয়েছে। তার হাতে একটা এয়ারগান। আর একটা ছেলের হাতে একটা মরা পায়রা। বুঝলাম 'এয়ারগান'টিই ওই হতভাগ্য জীবের ভবলীলার অবসান ঘটিয়েছে। ফুলপ্যাণ্টপরা ছেলেটার মুখের গর্বিত ভাব লক্ষ্য করে' অনুমান করলাম সে-ই বোধ হয় শিকারী। একটা রোগাগোছের ছেলে চীৎকার করে' বলছে—আমিই তো দেখিয়ে দিয়েছিলাম পায়রাটাকে। মোটা বেঁটে চশমাপরা আর একটা ছেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল—মিথ্যুক কোথাকার। তুমি দেখিয়ে দিয়েছিলে, না আমি? পাশেই ছেঁড়া-কেড্স্-পরা ট্যারা যে ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল সে রুখে এগিয়ে এল। বেঁটে ছেলেটাকে কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ফুলপ্যাণ্টপরা ছেলেটাকে সম্বোধন করে' বললে—তুমিই বল না। এই ফ্লাওয়ার মিলের ফোকরে যে পায়রা থাকে, তা আমিই তোমাকে প্রথমে বলিনি? আর একজন ছেলে বলে' উঠল—মাইরি আর কি! বুঝলাম ওই বারো-চোদ্দটা ছেলেই প্রত্যেকেই ওই মৃত পায়রাটির উপর অধিকার সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করছে। প্রত্যেকেরই চোখের দৃষ্টি লোলুপ। কিন্তু হায়, পায়রা যে মাত্র একটি।

এখানে কাল শখের থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' হয়েছিল। আমি যেতে পারিনি। মনু গিয়েছিল। মোটরে তাকে পৌঁছে দিয়ে আমি 'কলে' বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কথা ছিল ফেরবার সময় তাকে তুলে নিয়ে যাব। কিন্তু ফেরবার সময় রাস্তায় মোটরটা গেল বিগড়ে। ঠিক করতে বেশ দেরি হ'য়ে গেল। মনুকে হেঁটেই ফিরতে হয়েছিল। মনু বললে—ফেরবার সময় দেখলুম মণিবাবু মোটরে করে' যাচ্ছেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও রয়েছে। আমাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—গাড়ি কোথায়? বললাম, আসবার কথা ছিল, কি জানি কেন আসেনি। শুনে মণিবাবু মুচকি হেসে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে' গেলেন। তাঁর এটুকু ভদ্রতা হ'ল না যে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেন।

শহরের লোকে জানে মণিমোহন বসু আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু!··· একটু পরে সুবলবাবু এলেন। তিনি আমার এবং মণিমোহন উভয়েরই বন্ধু। ইংরেজীতে যাকে 'কমন ফ্রেণ্ড' বলে তাই। তাঁকে মণিবাবুর ব্যবহারের কথাটা বললুম। তিনি হেসে উত্তর দিলেন,—এতেই আশ্চর্য হচ্ছেন? ওর বাড়ির উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ আছে। তার ফল কখনও খেয়েছেন একটাও। প্রত্যেকটি পেয়ারা বিক্রি করে। কখনও হাত তুলে কাউকে কিছু দিতে জানে না। হাড় চামার। আমার ধারণা ছিল মণিবাবু সুবলবাবুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু! কিন্তু বন্ধুত্বের নীচে যে এমন বিষ-ফল্গু বহমান তা জানতাম না।

আজ আমার বাগানের ক্রোটন গাছ দুটোর শ্রী দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। প্রাণের প্রাচুর্য যেন উথলে উঠেছে রঙে, রূপে, লাবণ্যে। তার পরই মনে পড়ল রাজেনবাবুর কথা। তিনিই এই ক্রোটনের ডাল দুটো এনে পুঁতে দিয়েছিলেন। আমি বাগান ভালবাসি, রাজেনবাবু আমাকে ভালবাসতেন। এই দুই ভালবাসার মণি-কাঞ্চন যোগ হয়েছে ওই ক্রোটন গাছ দুটিতে। রাজেনবাবু আজ কোথায় জানি না, তাঁর যে দান সামান্য বলে' মনে হয়েছিল, তাই আজ অসামান্য হ'য়ে উঠেছে। আজ মনে হচ্ছে মানবতার নিগূঢ় মহত্ত্ব যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে ওই গাছ দুটিতে। ঝারিতে করে' জল এনে নিজে হাতে গাছ দুটিকে স্নান করালাম। মালীটা অবাক হ'য়ে গেল। সে বুঝতে পারল না যে আমি বাইরে গাছকে স্নান করাচ্ছি বটে, কিন্তু মনে মনে অভিষিক্ত করছি রাজেনবাবুকে কৃতজ্ঞতা দিয়ে। আজ এটা আমার জীবনের পরম দিন।

সুরেন বক্সি তাঁর বড় জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে আজ এসেছিলেন। তাঁর শৌখিন স্প্যানিয়েলটার কানে ঘা হয়েছে তাই দেখাবার জন্যে। এ অঞ্চলে পশু-চিকিৎসক নেই বলে' দরকার হ'লে পশুদের চিকিৎসা আমিই করি। আমি ঘায়ে লাগাবার একটা ওষুধ আমার ডিস্‌পেনসারি থেকেই দিলাম আর একটা ইন্‌জেক্‌শনের কথাও বললাম। বললাম, ওটা এখানে কোথাও পাবেন না, ক'লকাতা থেকে আনতে হবে। দামী ওষুধ। সুরেন বক্সি একটু দম্ভভরেই উত্তর দিলেন, দামের জন্য আমি পরোয়া

করি না, আপনি আমার নামে ভি. পি. করতে লিখে দিন। লিখে দিলাম। তারপর তাঁকে বিদায় দেবার জন্যে বাইরে এসে একটা মজার জিনিস চোখে পড়ল। দেখলাম, তাঁর সহিসের বাঁ কানে একটা ঘা হ'য়ে কানটা বেঁকে গেছে। সহিসটি আমাকে দেখে সেলাম করলে। বকসি-মশায়ের বাড়িতে অনেকদিন ধরে' আছে লোকটি। বক্‌সিমশাই কুকুরের কান সম্বন্ধে এত সচেতন, অথচ সহিসের কান সম্বন্ধে এত উদাসীন কেন বুঝতে পারলাম না। একবার মনে হ'ল সহিসের কানের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমার তখনই মনে হ'ল—না থাক, কি দরকার আমার। এ কথা কেন মনে হ'ল কে জানে। এখন মনে হচ্ছে সুরেন বক্‌সি তো অদ্ভুত লোক বটেনই, আমিও কম অদ্ভুত নই।

সোহাগের বিয়ে খুব ধূমধাম করে' হ'য়ে গেল। আমার একমাত্র মা-মরা মেয়েটিকে যে সৎপাত্রের হাতে সম্প্রদান করতে পেরেছি, এতে আমার আনন্দিত হওয়া উচিত। আনন্দিত যে হইনি তা নয় কিন্তু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণও হয়েছি। যদিও মুখে দেঁতো হাসি হেসে সবাই বললেন—বাঃ, চমৎকার হয়েছে, খুব আনন্দের কথা। কিন্তু সবাই যে আনন্দিত হননি, অনেকেই যে ঈর্ষা-ক্লিষ্ট হয়েছেন তা বোঝা গেল তাঁদের মুখের ভাব-ভঙ্গীতে। পরশ্রীকাতরতা জিনিসটা বিষ্ঠার মতো, ফুল দিয়ে চাপা দিলেও তার দুর্গন্ধটা গোপন করা যায় না। সেটা প্রকাশ হ'য়ে পড়েই। সরলতা এবং মহত্ত্ব যেমন চোখে মুখে স্বতঃস্ফূর্ত হয়, কুটিলতা এবং নীচতাও তেমনি হয়। প্রকাশ্যভাবে খুঁতও ধরেছেন অনেকে। অনেককে নাকি ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হয়নি, অনেককে নাকি দেরিতে পাঠানো হয়েছে। হয়তো আমার অজ্ঞাতসারে এসব ত্রুটি ঘটেছে কিন্তু যাঁরা সত্যিই আমার আত্মীয় বা বন্ধু, তাঁরা এসব ত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন? বিনা-নিমন্ত্রণেই তো তাঁদের আমার বাড়িতে আসবার অধিকার আছে, এসেছেনও কতবার, থেকে গেছেন, খেয়ে গেছেন। যাঁরা দূরে আছেন তাঁদের সকলকেই আমি চিঠি লিখেছিলাম, বিয়ের কথা সকলেই জানতেন। ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্রটার জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করে' ছিলেন কেন বুঝিতে পারছি না।

এই শহরেও আমার দুই একজন তথাকথিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নিমন্ত্রণ-না-পাওয়ার ছুতো করে' সরে' ছিলেন। একজন বললেন—বরবধূকে উপহার

দেওয়াটা এড়াবার জন্যেই আসেননি। এ কথাটা বিশ্বাস হয় না। একটা ঝুটো আত্মসম্মানের কবলে পড়েছেন তাঁরা। আমাকে সত্যি যদি ভালবাসতেন, বিনা-নিমন্ত্রণেই আসতেন। ভালবাসা জিনিসটা সত্যই বড় দুর্লভ।

এ বিয়ে উপলক্ষে আরও যে দু' একটা ঘটনা ঘটেছে তা আরও মর্মান্তিক। বাড়িতে ভিয়ান বসিয়ে অনেক মিষ্টান্ন করিয়েছিলাম। মিষ্টান্নের তদারক করার ভার ছিল গোপীনাথের উপর। লোকটি অনেকদিনের বিশ্বাসী চাকর, সোহাগকে কোলে-পিঠে করে' মানুষ করেছে। সে যা বললে তা শুনে' চক্ষুস্থির হ'য়ে গেছে আমার। সে বললে, সোনাপুকুরের বৌদি এবং তার ছেলে-মেয়েরা নাকি মিষ্টান্নের ভাঁড়ারে ঢুকে মিষ্টান্ন চুরি করত। বাল্‌তি বাল্‌তি পানতোয়া, রসগোল্লা, মিহিদানা সরিয়েছে। যদি খেত কষ্ট হ'ত না, কিন্তু খায়নি, সব ফেলে দিয়েছে পাদাড়ে। আমাকে অপ্রস্তুত করবার চেষ্টা। তারা যে ফেলে দিচ্ছে এ কথা গোপীনাথ প্রথমে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারামাত্রই আর কাউকে ঢুকতে দেয়নি সে। এতে নাকি অনেক আত্মীয়-আত্মীয়া অপমানিত বোধ করেছেন। এধরনের আত্মীয়-আত্মীয়াদের কবল থেকে কবে আমরা পরিত্রাণ পাব।

আমার একদল আত্মীয় চিঠি লিখেছেন তাঁদের আসবার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অনিবার্য 'কারণবশতঃ' আসতে পারেননি। পরে জানলাম অনিবার্য কারণটা আর্থিক। নিমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গে আমার নাকি গাড়ি-ভাড়াটাও পাঠানো উচিত ছিল। গাড়িভাড়া আমি দিতাম কিন্তু নিমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গে সেটা পাঠানো কি শোভন হ'ত! সে কথার উল্লেখ করাও যে অশোভন! এই আমাদের সমাজ, এই আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের নমুনা! একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। যিনি গাড়িভাড়ার জন্য আসেননি, তাঁর ছেলের বিয়েতে আমি সপরিবারে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তো আমাকে গাড়িভাড়া দেননি, দেবার প্রস্তাবও করেননি। অথচ তিনি যে খুব গরীব লোক তা-ও নন, ছেলের বিয়েতে নগদ মোটা পণও নিয়েছিলেন।

আজ হঠাৎ নুটবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। মুনসেফ ছিলেন ভদ্রলোক, সাবজজ্‌ হ'য়ে রিটায়ার করেছেন। যখন সাবজজ্‌ ছিলেন তখন মোটর ছিল, চাপরাসী ছিল, স্যুট পরতেন, হাকিমি গাম্ভীর্যে

www.boiRboi.blogspot.com

বিচরণ করতেন বাছা বাছা অফিসারদের সমাজে। আজ হঠাৎ তাঁকে দেখলাম রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছেন সাধারণ বাঙালী পোশাক পরে'। আধ-ময়লা ধুতি, আধময়লা শার্ট, পায়ে হতশ্রী একজোড়া অ্যালবার্ট শু, হাতে বাজারের থলি। মুখে বার্ধক্যের চিহ্ন, চুলে পাক ধরেছে, সামনের দাঁত নেই। তিনি যে আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তা বুঝতে পারিনি। আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, দেখে মনে হ'ল আমাকে বোধহয় চিনতে পারেননি। বললাম—"নুটবিহারীবাবু যে। নমস্কার। চিনতে পারছেন ?" মুখটা হঠাৎ কালো হ'য়ে গেল তাঁর।

"কে, ও, ডাক্তারবাবু! আজকাল এখানেই আছেন নাকি ?"

"হাঁ, মাস দুই হ'ল বদলি হ'য়ে এসেছি।"

"প্রমোশন হ'ল ?"

"মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছেছি—"

"সিভিল সার্জন হয়েছেন তাহ'লে—। ভালো—"

"আপনিও বদলি হ'য়ে এসেছেন না কি এখানে ?"

"আমি রিটায়ার করেছি। এখানেই আছি একটা বাড়িভাড়া করে'—"

"কোথায় আছেন ?"

ঠিকানাটা জেনে নিলাম। সন্ধ্যার পর গেলাম তাঁর কাছে। অনেকদিন এক ডিস্ট্রিক্টে একসঙ্গে ছিলাম। গিয়ে দেখলাম একটা আড়ময়লা লুঙ্গী পরে' একটা ভাঙ্গা বেতের চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে দেখে নিজেই আর একটা চেয়ার টেনে বার করে' আনলেন। সেটাও খুব মজবুত বলে' মনে হ'ল না। বসলুম। এক কাপ চা-ও খাওয়ালেন। ময়লা পেয়ালায় অতি জোলো চা। গল্প হ'ল খানিকক্ষণ। তাঁর চাকুরী জীবনেরই গল্প। কবে কোন্ সাহেব তাঁকে কি বলেছিল, কার কার চক্রান্তে তাঁর আশানুরূপ উন্নতি হ'ল না—এই কথা খালি। সারাক্ষণ যেন হায় হায় করে' গেলেন। চুপ করে' শুনলাম সব। ভালো লাগছিল না, তবু শুনলাম। শেষে জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন কি করেন ?"

"বাজার করি আর বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে সামলাই। আর সময় পেলে অঙ্ক কষি কি করে' আমার পেন্সন দিয়ে সংসার চালাব। সকালবেলা অবশ্য পূজো করি খানিকক্ষণ, স্বামী জীবনানন্দের কাছে দীক্ষা

নিয়েছি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে চলে' যাই। চিঠিপত্র লেখালিখি করছি—"

ন্টবিহারীর সম্বন্ধে একটা খবর জানি। ছাত্রজীবনে তিনি ইংরেজি সাহিত্য ভালো করে' পড়েছিলেন। ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর এম্-এ। সেক্স্পীয়র আর ব্রাউনিং সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর নিজের জীবনে কিন্তু সেক্স্পীয়র বা ব্রাউনিংয়ের চিহ্নমাত্র দেখলাম না। তাঁদের পরীক্ষার খাতায় ফেলে এসেছেন, সঙ্গে করে' আনতে পারেননি। সাধারণ লোকের মতোই হায় হায় করছেন।

তপেনবাবু আমার প্রতিবেশী। এখন এক অফিসে কেরানীগিরি করেন। বিয়ে করেননি। বলেন চাকরির উন্নতি না হ'লে বিয়ে করবেন না।

তপেনবাবুর বাড়িতে কিন্তু তপেনবাবুর চেয়ে অনেক বড় আসন তপেনবাবুর বোন রঙ্গনার। তাকে ঘিরেই বাড়িতে সর্বদাই আসর সরগরম। মেয়েটি রূপসী নয়, রং কালোই। কিন্তু হাবভাবে মুগ্ধ করে' দেয়। চোখের দৃষ্টিতে এবং যৌবনের সাবলীলতায় আগুন আছে। সেই আগুনে পুড়ে মরবার জন্যে একদল পুং-পতঙ্গ প্রায়ই সন্ধ্যের সময় ভিড় করে। মেয়েটি নাচ গান অভিনয় সব বিষয়েই পটীয়সী। তবলা আর ঘুঙুরের আওয়াজ প্রায়ই শুনতে পাই। তপেনবাবুর অফিসের যিনি হর্তাকর্তা বিধাতা, তিনি প্রবীণ লোক। তিনিও রোজ আসেন সন্ধ্যেবেলায়। সুতরাং মনে হচ্ছে এবার তপেনবাবুর চাকরির উন্নতি হবেই!

দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মহাভারতের আমলেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আগে সমাজে তাদের স্থান ছিল একটা বিশেষ পল্লীতে, বিশেষ সীমার মধ্যে। গৃহস্থের অঙ্গনে তাদের বসতি ছিল না। এখন আমাদের সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, তাই সব সীমারেখাও লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। পুরনারীদের মধ্যে কে বরনারী, কে বারাঙ্গনা তা এখন ঠিক করা মুশকিল। মালা ভ্রমে সাপকে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছেন অনেকেই। এ দেশেও ফরাসী সমাজ গজিয়ে উঠল।

একটা নূতন ফেরিওলা এসেছিল। এ শহরের প্রায় সব ফেরিওলাকেই চিনি আমি। এ লোকটি অচেনা। তার কাছ থেকে একটা ছুরি কিনলাম। তারপর জিগ্যেস করলাম—এখানে কোথায় আছ? সে বললে, ধরমশালায়

আছি। কোথাও আমি বেশীদিন থাকি না। এক সপ্তাহের বেশী কোথাও থাকিনি। ভারতবর্ষের সব শহরেই দু' চারদিন করে' থাকবার ইচ্ছা আছে তার। তার জীবনে বেড়ানোটাই লক্ষ্য, ফেরি করাটা উপলক্ষ মাত্র। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক শহরে বেশীদিন থাক না কেন? সে হেসে বললে, বেশীদিন থাকলে মন খারাপ হ'য়ে যায় বাবু। বেশী মাথামাথি করলে মানুষের চকচকে ভাবটা আর থাকে না, গিল্টি বেরিয়ে পড়ে, মন খারাপ হ'য়ে যায়।

তার কথা শুনে চমৎকৃত হ'য়ে গেলাম। এরকম দার্শনিক ফেরিওলা আগে কখনও দেখিনি। ফেরিওলার কথা শুনে নবকিশোরের কথা মনে পড়ল। লোকটাকে দেবতা মনে করেছিলাম। তার চেহারায় কথাবার্তায় সত্যিই একটা দেবত্ব ছিল। কিন্তু বেশী মাথামাথি করবার পর গিল্টি বেরিয়ে পড়ল। একদিন সকালে দেখি সে উধাও হয়েছে। আর উধাও হয়েছে আমার ক্যাশবাক্সটা। তাতে আড়াই শ' টাকা, দুটো গিনি এবং সোনার ঘড়িটা ছিল।

এখান থেকে কিছুদূরে বড় রাস্তার উপর যে পুলটি ছিল সেটি ভেঙে গেছে। পুল ভেঙে যাওয়া আশ্চর্য নয়, কিন্তু আশ্চর্য হলুম স্বয়ং একজিকিটিভ ইন্‌জিনিয়ার সেটির তদারক করতে এসেছেন দেখে। মফঃস্বলের এক পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় পুল ভেঙেছে তার জন্যে স্বয়ং একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার এসেছেন, এ যে মশা মারতে কামান দাগা। সাধারণতঃ সাব ওভারশিয়ার বা বড়জোর ওভারশিয়ার এসব ছোটখাটো ব্যাপারে আসেন এবং তাঁরা যা রিপোর্ট দেন তদনুসারেই গভর্নমেন্ট টাকা খরচ করেন; একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ারের আবির্ভাব একটু অস্বাভাবিক বলে' ঠেকল।

তার পরদিন ভদ্রলোক নিজেই এলেন আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে এক শিশি কার্মিনেটিভ মিক্‌শ্চার নিতে। বললেন—"ওটা আমি সর্বদা সঙ্গে রাখি এবং দু'বার করে' খাই। খেলে ভালো থাকি। এক শিশি আমাকে করে' দিন।" করে' দিলাম। তারপর আলাপ হ'ল তাঁর সঙ্গে। দেখলাম নগেনবাবু বেশ সদাশয় এবং রসিক। বিলেত-ফেরত, বড় চাকরি করেন, কিন্তু অহংকারের লেশমাত্র নেই। চমৎকার হাসিখুশী লোক। খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতেই বললেন—"ও, তাহ'লে তো বেঁচে যাই মশাই। চাপরাসীর হাতের রান্না খেতে খেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে গেছে। পেঁয়াজ আর লঙ্কা ছাড়া তৃতীয়

কোন মসলা জানা নেই মহাপ্রভুদের—কিছু যদি মনে না করেন, একটা অনুরোধ করবো ?” “কি বলুন—।” “একটু শুক্তো করাবেন। মুখটা বদলে নেব।” বললাম, “বেশ তো, বেশ তো—এ আর বেশী কথা কি।” আলাপ ঘনিষ্ঠতর হ’তে জিগ্যেস করলুম—“আচ্ছা এই অজ পাড়াগাঁয়ের পুল দেখতে আপনি এসেছেন কেন বুঝতে পারছি না।” একটু হেসে বললেন—“ওভারশিয়ার চক্রবর্তী আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে।”

জিগ্যেস করলাম—“কে তিনি ?”

হেসে বললেন—“তিনি একজন পুরানো পাপী। এখন রিটায়ার করেছেন। এরকম ধূর্ত লোক আমি আর জীবনে কখনও দেখিনি। কালো বামুন। কুচকুচে কালো রং। চোখেমুখে একটা শেয়াল-শেয়াল ভাব। প্রতিবছরই সে একটা পুরানো পুলের মেরামতি বাবদ একটা বিল করত। আমি আসবার আগে থেকেই করত। আমার আগে অন্ততঃ পাঁচজন একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার তার এ বিল পাস করছে। আমিও করে’ দিতাম। পুলটি ছিল একটি পাড়াগাঁয়ের রাস্তায়। সেখান থেকে রেলোয়ে স্টেশন কুড়ি মাইল দূরে। স্টেশন থেকে গরুর গাড়ি করে’ কিংবা বাইকে করে’ কিংবা হেঁটে সে জায়গায় পৌঁছাতে হয়। এ কষ্ট স্বীকার করে’ কোনও একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার সে পুল দেখতে যায়নি। আমিও যাইনি। রিপেয়ারের বিল প্রতি বছর পাস হ’য়ে যেত কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। স্টেশন থেকে ওই কুড়ি মাইল রাস্তা, জঘন্য ছিল সেটা। পাবলিকে অনেকদিন থেকে ওটা পাকা রাস্তা করে দেবার জন্যে আন্দোলন করছিল। হঠাৎ ঠিক হ’য়ে গেল ওটা পাকা করা হবে। আমাকে যেতে হ’ল সেখানে। ঠিক তার আগেই ওভারশিয়ার চক্রবর্তী ওখানকার পুল রিপেয়ারের জন্য টাকা চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম—‘পুলটা একবার দেখব। তারপর তোমার বিল স্যাংশন করব।’ গিয়ে কি দেখলুম জানেন ?” “কি—?” “কোনও পুল নেই! Non-existent পুলের রিপেয়ার খরচ বছরের পর বছর নিয়ে যাচ্ছে চক্রবর্তী!”

“বলেন কি। কি করলেন ?”

“তারপর একটা নাটকীয় কাণ্ড করল চক্রবর্তী! আমার পায়ে পড়ে’ পা জড়িয়ে হাউ হাউ করে’ কাঁদতে লাগল। শৃগালের চোখে কুমীরের অশ্রু ঝরণার মতো পড়তে লাগল। কিছুতেই পা ছাড়ে না। শেষটা তাকে বলতে হ’ল—‘আচ্ছা, এবার তোমার মাপ করলুম, কিন্তু আর এরকম যেন না হয়।’ পরের

বছর দেখি আবার চক্রবর্তীর সেই পুল রিপেয়ারের বিল এসেছে! তার দিকে চাইতেই সে বললে—'আমার কথাটা শুনুন আগে সার। বিল এনেছি, কারণ বিল না দিলে অডিট ধরবে না? যে পুল গত দশ বছর ধরে' বছর-বছর মেরামত হচ্ছে, এবার সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকলে সন্দেহ হবে না তাদের? এবার বিলটা পাস করে' দিন, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজটা ভেঙে ফেলবার একটা অর্ডার আর এষ্টিমেটও দিয়ে দিন। তারপর থেকে আর বিল আনব না।" হো হো ক'রে হেসে উঠলেন নগেনবাবু। তারপর বললেন, "সেই থেকে কোনও পুল ভাঙলে তা সে যত ছোটই হোক্, নিজের চোখে দেখে আসি।"

কাল রাত্রি এগারোটার সময় বিপিন কাকা কোন খবর না দিয়ে এসে উপস্থিত তাঁর বিধবা মেয়েটিকে নিয়ে। বিপিন কাকার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই। বাবাকে উনি দাদা বলতেন বলে' আমরা ওঁকে কাকা বলি। এসেই একটি মিথ্যে কথা বললেন—চিঠি দিয়েছিলাম, পাওনি? চিঠি হারানো যে অসম্ভব তা নয়, কিন্তু সাধারণতঃ আমার চিঠি হারায় না। তাছাড়া তাঁর চোখমুখ দেখেই মনে হচ্ছিল তিনি মিথ্যে কথা বলছেন। বিপিন কাকা ধার্মিক মানুষ। রাত এগারোটার সময় এসে তিনি গরম জলে স্নান করলেন। তারপর পূজো করলেন একঘণ্টা ধরে'। তারপর চা খেয়ে গল্প করলেন একটু। মনু অত রাত্রে উনুন নিকিয়ে শুদ্ধাচারে তাঁর মেয়ের জন্য লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম করে' দিলে। জিগ্যেস করলাম—"বিপিন কাকা, হঠাৎ এসে পড়লেন যে! কখনও তো খবর নেন না—"

একমুখ হেসে বিপিন কাকা বললেন, "তোমার জন্যে মনটা বড় উতলা হ'য়ে উঠলো। অনেকদিন দেখিনি তো—"

"আপনার মেয়েকে সঙ্গে এনেছেন কেন—"

"টুপিকে? পাশের গাঁয়েই ওর শ্বশুরবাড়ি যে। তোমার মোটরটা নিয়ে কালই ওকে পৌঁছে দিয়ে আসব—"

বুঝলাম 'উতলা' হওয়ার কথাটাও সর্বৈব মিথ্যে।

শীতলবাবুর বক্তৃতা শুধু যে শোনবার মতো তা নয়, দেখবার মতোও। তিনি বক্তৃতা দিতে দিতে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করেন। তাঁর নিজের জীবনের ঘটনাবলীই তাঁর বক্তৃতার উৎস। তিনি প্রায়ই বক্তৃতা করেন, আজকাল

ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে কোন লাভ নেই। লেখাপড়া শিখে আর ক'টাকা রোজগার করবে? দলে দলে বি-এ, এম-এ, এম-বি ক্যা-ফ্যা করে' রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথাটা মিথ্যে নয়, শীতলবাবুর বলবার ভঙ্গীও ওজস্বিনী। কিন্তু তাঁর বক্তৃতাটা সার্থক হ'ত যদি তিনি নিজের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে আধুনিক ভাষায় যাকে বলে 'আপ্রাণ' চেষ্টা—তা না করতেন। চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর চারটি ছেলেই বখা হয়েছে, নানারকম শৌখিন বেশভূষা করে' পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা মেরে বেড়ানোই তাদের কাজ। যাদের ছেলেরা লেখাপড়ায় ভালো শীতলবাবু সাধারণতঃ তাদেরই শুনিয়ে শুনিয়ে উক্ত বক্তৃতা অঙ্গভঙ্গী সহকারে করে' থাকেন। তাঁর নিজের পুত্রবধূ সুন্দরী হয়নি, তাঁর বন্ধু বগলাবাবুর পুত্রবধূটি সুন্দরী হয়েছে। শীতলবাবু বগলাবাবুকে বলেছিলেন—বউ সুন্দরী হ'য়ে কি তোমার চারটে হাত-পা বেরিয়েছে? বউ সুন্দরী হওয়া ভালো নয়। পাঁচজনে নজর দেবে, বখা ছেলেরা বাড়িতে উৎপাত করবে। বগলাবাবু বন্ধুকে চিনতেন, মুচকি হেসে চলে' গেলেন। তিনি চলে' যাবার পর শীতলবাবু বললেন—সুন্দরী না হাতী! ঢিবির মতো কপাল, ছোট ছোট চোখ, মুখের হাঁ ইয়া বড়! অঙ্গভঙ্গী করে' দেখালেন সব।

আধুনিক বাংলা উপন্যাস পড়লাম সেদিন একখানা। ইনিয়ে বিনিয়ে কেবল মেয়েমানুষের কথা। কেবল Sex, Sex আর Sex—ও ছাড়া অন্য প্রসঙ্গই নেই। ওর কথাই নানা রঙে ফেনিয়ে নানা ঢঙে বলবার চেষ্টা করেছেন ভদ্রলোক। আমার মনে হ'ল ভদ্রলোক Sex starved: মনে হ'ল গল্পলেখার ছুতোয় তারিয়ে তারিয়ে কামরসটা নিজেই তিনি যেন উপভোগ করেছেন। অপরের পক্ষে যা বীভৎস ও ন্যাক্কারজনক তাঁর পক্ষে তাই স্বাভাবিক। আমি ক্ষুধার্ত লোককে নর্দমা থেকে ভাত তুলে তুলে খেতে দেখেছি। কোনও নৈতিক বক্তৃতা দিয়ে এদের সংশোধন করা যাবে না। আসল কারণটা সম্ভবতঃ অর্থনৈতিক। জীবনকে ভোগ করবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু লোভ আছে প্রচুর।

কাল রাত্রে আমার জীবনে একটি মহা লাভ হয়েছে। পরম প্রাপ্তি। একটি অকৃত্রিম ভক্তের দেখা পেয়েছি। কৃত্রিম ভক্ত জীবনে অনেক জুটেছে। বস্তুতঃ

তাদের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে আছি। তাঁরা যখন আমার প্রশংসার তোড়ে আমাকে বিপর্যস্ত করে' ফেলেন, তখন মনে হয় যেন মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা-ধোওয়া হোজ পাইপের সামনে পড়ে' নাকানি-চোবানি খাচ্ছি।

কারো মুখের সামনে তার অজস্র প্রশংসা করা যে নিন্দা করার চেয়েও বেশী অশোভন এবং গর্হিত, এ জ্ঞান অনেকের থাকে না। থাকে না, কারণ তাঁরা প্রশংসা করেন কোনও মতলবের তাগিদে। মতলবের তাড়ায় মানুষের শোভন-অশোভন জ্ঞান লোপ পায়। তাঁরা তখন বানরকে কন্দর্পকান্তি এবং ভীরু দুর্বলকে বীরেন্দ্র বলতেও ইতস্ততঃ করেন না। আমার জীবনে এরকম মতলববাজ লোকের দেখা অনেক পেয়েছি।

কিন্তু কাল রাত্রে যে লোকটি বৃষ্টিতে ভিজে রাত বারোটায় স্টেশনে আমার জন্যে দাঁড়িয়েছিল সে অন্য জাতের। আমি কাল রাত্রে সপরিবারে প্রচুর মাল-পত্র নিয়ে ক'লকাতা থেকে ফিরছি। আমার ড্রাইভারকে এবং চাপরাসীকে খবর দেওয়া ছিল, কিন্তু তারা কেউ স্টেশনে আসেনি। এসেছিল ওই লোকটি। জিতু জেলে। বাজারে মাছ বিক্রি করে। হাসপাতালে অনেকদিন আগে তার এক যক্ষ্মাগ্রস্ত আত্মীয়কে নিয়ে এসেছিল, আমি তাকে স্যানাটোরিয়মে পাঠাবার ব্যবস্থা করে' দিই। কর্তব্য হিসাবেই করেছিলাম, কোনও প্রতিদান প্রত্যাশা করিনি। কথাটা মনেও ছিল না আমার। স্টেশনে গাড়ি থামতেই জিতু এগিয়ে এল, আমি প্রথমটা চিনতেই পারিনি তাকে। তার মাথায় পাগড়ি বাঁধা ছিল। আমাকে প্রণাম করে' বললে সে তার সেই আত্মীয়টির খবর দিতে আমার বাসায় আজ গিয়েছিল। গিয়ে দেখল ড্রাইভার আলি মদ খেয়ে বেহোঁশ হ'য়ে পড়ে আছে, আমার চাপরাসী শিউরামের জ্বর হ'য়েছে খুব। সে-ও প্রায় বেহোঁস। জিতু ঝড় জল মাথায় করে' নিজে তাই স্টেশনে এসেছে যাতে আমার কোনও কষ্ট না হয়। কুলি ডেকে আনলে, নিজেও কয়েকটা জিনিস নাবালে, একটা গাড়ি আগে থাকতেই ঠিক করে' রেখেছিল। জিতুর মুখভাবে একটা অসাধারণ ভাব ফুটে উঠেছে দেখলাম। অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধার আলোকে তার চোখমুখ প্রদীপ্ত। মুগ্ধ হলাম।

মুগ্ধ হলাম বললেও সবটা ঠিক বলা হয় না, বলতে হয় কৃতার্থ হলাম তারপরেই বিস্মিত হলাম মনে মনে। আমার মধ্যে কি এমন আছে যা দেখে ও এমন ভক্তি-গদগদ হ'য়ে পড়েছে। আমি তো অতি সামান্য লোক। ওর ভক্তিভাজন হবার যোগ্যতা কি আছে আমার? পুরাণের সেই গল্পটা মনে

পড়ল। এক ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে বাড়ি ফিরছে। গুরু তাকে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করবার অনুমতি দিয়েছেন। ছেলেটি বাড়িতে এসে কপাটে ধাক্কা দিতেই তার মা কপাট খুলে দিলেন। ছেলে মাকে প্রণাম করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—বাবা কোথায়? মা বললেন, ভিতরে আছেন, এস। ভিতরে এসে কিন্তু তার বাবাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু দেখা গেল খিড়কির দুয়ারটি খোলা রয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর পাওয়া গেল না তাঁকে। তিনি ফিরলেন এক বছর পরে।

ছেলে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, তুমি কোথায় চলে' গিয়েছিলে?"

বাবা উত্তর দিলেন, "বনে। তপস্যা করবার জন্যে।"

বিস্মিত হ'য়ে গেল ছেলে। প্রশ্ন করল—"হঠাৎ এ ইচ্ছা হ'ল কেন?"

বাবা উত্তর দিলেন—"তুমি যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে ফিরে এসে তোমার মাকে প্রণাম করছিলে তখন আমি তোমাকে উঠোন থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম তোমার ললাটে তপস্যা-লব্ধ জ্যোতি জ্বলজ্বল করছে। দেখে আমার মনে হ'ল—আমি কি ওর প্রণাম নেবার যোগ্য? সংসারের সংঘর্ষে আমার চরিত্র যে মলিন হ'য়ে গেছে! তাই আমি খিড়কির দরজা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বনে চলে' গিয়েছিলাম তপস্যা করতে, মলিন চরিত্রকে উজ্জ্বল করতে। এক বৎসর অধ্যবসায়ের ফলে আমার সে সাধনা সিদ্ধ হয়েছে। এখন তুমি আমাকে প্রণাম করতে পার।"

আমার মনে হচ্ছে আমি কি জিতু জেলের ভক্তিভাজন হবার উপযুক্ত? আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, ও যদি জেলে না হ'য়ে কালচার্ড ভদ্রলোক হ'ত তাহ'লে কি রাতদুপুরে বৃষ্টিতে ভিজে সামান্য উপকারের ঋণ শোধ করবার জন্য আসত? আমার বিশ্বাস আসত না। আজকাল 'কালচার্ড' মানেই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক।

কানাই মাড়োয়ারির ব্যবহারে সেদিন হৃদয়ঙ্গম করলুম কেন ওরা ব্যবসায়ী হিসাবে এত উন্নত। আমার এক ভাইঝি প্রসব হবার জন্য আমার কাছে এসেছিল। হাসপাতালের নার্স লুইসাকে সেজন্য মেহনত করতে হয়েছিল খুব। উপর্যুপরি দু' দিন রাত জেগেছিল, প্রায় এক মাস রোজ দু' বার করে এসে 'ড্রেস' করে' দিয়ে গিয়েছিল। অন্য কোন জায়গায় হ'লে অন্ততঃ সে দেড়শ' টাকা রোজগার করত। কিন্তু আমার কাছে 'ফী' চাইতে পারে না। তাই

ঠিক করলুম ওকে একখানা ভালো শাড়ি কিনে দেব। কানাই মাড়োয়ারির দোকান থেকে ভালো শাড়ি নিয়ে এলাম একখানা। হালকা হলুদ রঙের শাড়ি। মনু বললে—কাল ষেটেরা পুজো। কালই ওকে দিও শাড়িখানা। সন্ধ্যের সময় লুইসা এলে তাকে দেখানো হ'ল শাড়িটা। রং পছন্দ হয়েছে কিনা। লুইসা দক্ষিণ-বাসিনী। খ্রীষ্টধর্ম বরণ করেছে বটে, কিন্তু তামিল রক্ত ওর ধমনীতে বহমান। লুইসা হেসে বললে—আমার ডগমগে গাঢ় রং পছন্দ। 'I prefer deep colour'!

তার পরদিন ভোরে উঠেই গেলাম কানাইয়ের দোকানে। কানাই বললে—আজ রবিবার, আমার দোকান বন্ধ। আর আমার সেল্‌স্‌ম্যান মহাদেবের কাছে দোকানের চাবি থাকে। তার বাড়ি মাইল দুই দূরে। কাল যদি শাড়িখানা বদলে দি, হবে না? বললাম, কিন্তু আজ যে ষেটেরা পুজো। ওই সঙ্গেই শাড়ি দেওয়ার নিয়ম আমার স্ত্রী বলছে। বেশ, তোমার যদি অসুবিধা হয়, কালই বদলে দিও। শাড়িটা তার কাছে রেখে এলাম।

ঘণ্টা দুই পরে দেখি মহাদেব রিক্‌শা করে' এসে হাজির। রিক্‌শায় প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের বস্তা! মহাদেব বললে—কানাই নিজে সাইকেল করে' আমার বাড়ি গিয়েছিল, তার কথামত আমি ব্যাঙ্গালোর শাড়ি দোকানে যতগুলো ছিল সব আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আপনার যে রংটা পছন্দ বেছে নিন। কানাইয়ের ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

এ কাহিনীর আর একটা চমৎকার ভাষ্য করেছেন আমার বাঙালী বন্ধুরা। হাসপাতালের যুবতী নার্স লুইসার শাড়ির জন্য আমি দোকানে ছুটোছুটি করছি—এর একটি অর্থই তাঁদের চিত্তে প্রতিভাত হয়েছে এবং সেটা তাঁরা ফুসফুস গুজগুজ করে' আলোচনা করছেন!

বাংলার বাইরে এই শহরে কিছুদিন থেকে এসেছি। এখানকার যে বাঙালী সমাজ নিজেদের 'প্রবাসী' বলে' চিহ্নিত করে' রেখেছেন তাঁদের দুরবস্থা দেখলে সত্যিই বড় হতাশ হ'য়ে পড়তে হয়।

এককালে বাংলাদেশের কৃতী-সন্তানরা এখানে এসে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেদের। সকলে তাঁদের খাতির করত, তাঁরা খাতিরের উপযুক্তও ছিলেন। তাঁরা অর্থোপার্জন করেছিলেন প্রচুর, এখানকার

জনহিতকর কাজে ব্যয়ও করেছেন প্রচুর। এখানকার স্কুল, হাসপাতাল, কলেজ তাঁদের নামের সঙ্গে জড়িত। তাঁদের নিজেদেরও প্রত্যেকের প্রাসাদোপম বাড়ি আছে এখানে। জমি-জমাও আছে। জমিদারিও ছিল কারো কারো।

কিন্তু তাঁদের বংশধরদের দেখে হতাশ হ'তে হয়। গরুড়ের বংশে এরকম চামচিকেদের জন্ম হ'ল কি করে'! ছেলেদের মধ্যে অধিকাংশই লেখাপড়ায় খুব খারাপ। সবই প্রায় থার্ড ডিভিসন। গুণ্ডামিও করতে পারে না ভালো করে,' ছোঁচামি করে। প্রতি বাড়িতেই বড় বড় মেয়ে, অনেকেরই বিয়ে হয়নি, অনেকেই ব্যভিচারিণী হ'য়ে পড়েছে, অনেক সময় প্রকাশ্যেও। এদের দুর্গাপূজার তিন চারটে দল, লাইব্রেরীও একাধিক, কোনটাই ভালোভাবে চলে না, প্রত্যেকটাতেই দলাদলি আর ঘোঁট। ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ এদেশে জন্মেছিলেন, তাই তাঁর নামে 'জয়ন্তী' মাঝে মাঝে হয়। পঁচিশে বৈশাখটা তো একটা পর্বের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা নিজেদের বাপ-মায়ের জন্মদিন কবে তা জানে না, তারা কবির জন্ম-উৎসবে নাচতে, গাইতে বা বক্তৃতা করতে আসে। উৎসবের নামে কি যে প্রহসন হয় তা বোঝবার ক্ষমতাও এদের নেই। বিহারীদের নিন্দায় এরা পঞ্চমুখ। কিন্তু আমার মনে হয় মানুষ হিসাবে বিহারীরা এদের চেয়ে অনেক ভালো, অনেক বেশী ভদ্র।

বাঙালীর ছেলেরা চাকরি পায় না তার একটা বড় কারণ এখানকার অধিকাংশ বাঙালী ছেলেই চাকরি পাওয়ার যোগ্য নয়। আমি অমুক বাবুর নাতি বা দৌহিত্র—এ বললে তো আর চাকরি মিলবে না। যোগ্য বাঙালীরা চাকরি পায়নি এরকম দৃষ্টান্তও আছে। এই নিয়ে অনেকে গলাবাজি করে' চীৎকার করেন। তাঁরা ভুলে যান যে চাকরির ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্রই পক্ষপাতিত্ব আছে। নিজেদের লোককে সবাই চাকরি দিতে চায়। এরাও চায়।

এ বিষয়ে কিন্তু বাঙালীরা ব্যতিক্রম, বাঙালী বড় চাকুরেরা সাধারণতঃ বাঙালীদের প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না—এইরূপ জনশ্রুতি। যোগ্য বাঙালী চাকুরী-প্রার্থী বাঙালী অফিসার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। এরকম একাধিক খবর আমি জানি। এত কথা লিখলাম মনের দুঃখে।

একটা খবর পেয়ে দুঃখটা নতুন করে' অনুভব করলাম। জগদীশবাবু

মারা গেছেন। তিনি পোস্টাফিসে কাজ করতেন। অনেকদিন আগে রিটায়ার করেছেন। পাড়ার ছেলেরা আমার কাছে চাঁদা চাইতে এসেছিল শবদাহের ব্যবস্থা করবার জন্যে। তাঁর পরিবার নাকি কপর্দকশূন্য।

অতীতের গর্ব আঁকড়ে ধরে' আমরা বেঁচে আছি ভবিষ্যতের আশায়, এ কথা অনেকে বলেন। কিন্তু সেটা কি সত্যি? একজন বাঙালীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন বাঙালীদের ইতিহাসের খবর সে রাখে কি না। দেখবেন কিচ্ছু রাখে না। নিজের বংশেরই পুরো খবর রাখে না। আস্ফালন করবার বেলায় কেবল বলে, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের বিবেকানন্দ, আমাদের অরবিন্দ। কিন্তু একটু চেপে ধরুন, দেখবেন রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানে না সে। নামগুলো জানে শুধু। আর সেইগুলোকে মূলধন করে' মাঝে মাঝে নাচ-গান-বক্তৃতার মজলিস বসায় নিজেকে জাহির করবার জন্য। হায় ভগবান, কোথায় চলেছি আমরা? সমূলে ধ্বংস হওয়াটাই কি এ জাতির অনিবার্য পরিণাম?

কাল মনের দুঃখে বাঙালীদের সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম আজ নিজেই তার প্রতিবাদ করেছি, কারণ আজ অরুণের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অরুণ বসুকে আগে কখনও দেখিনি। তার মায়ের অসুখের জন্য আমাকে ডাকতে এসেছিল। পিতৃহীন অরুণ নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছে। অর্থাভাবে লেখাপড়া বিশেষ হয়নি, কিন্তু সে মানুষ হয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি সে তিন বিঘে জমি পেয়েছিল। একা নিজের হাতে চাষ করে' সে তিন বিঘে জমিতে শাকসবজি বাগান করেছে। পৈতৃক বাড়ি ছিল একখানা। কিন্তু মেরামতের অভাবে পড়ে' গিয়েছিল সেটা। অরুণ নিজের হাতে মাটির দেওয়াল দিয়ে ছোট বাড়ি করেছে আবার। চমৎকার তকৃতকে ঝকৃঝকে বাড়ি। বাড়িটা তার বাগানের মধ্যেই। কারও সাহায্য না নিয়ে নিজের হাতে করেছে বাড়িখানা। বাড়িতে লোক বেশী নেই, সে আর তার মা। মাকে সুখে রেখেছে দেখলাম। একটি গাই আছে, সেইটি নিয়ে থাকেন তিনি। দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

তার মায়ের ম্যালেরিয়া হয়েছে। একটু খারাপ ধরনের ম্যালেরিয়া, সারতে একটু সময় নেবে। আমি ফী নিতে চাইনি। কিন্তু অরুণ বললে,

আপনি ফী না নিলে স্বস্তি পাব না। মনে হবে গরীব বলে' আপনি আমার উপর দয়া করলেন। কিন্তু আমি গরীব নই, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স প্রায় আড়াইশো টাকা।

অরুণের মতো ছেলে বাঙালী জাতির গৌরব। জানি না এরকম ছেলে বাঙালীদের মধ্যে আরও আছে কিনা, যদি থাকে তাহ'লে বাঙালীরা আবার গৌরবের শিখরে আরোহণ করবে। অরুণ শহর থেকে অনেক দূরে থাকে বলে' তাকে চিনতাম না। শহরের তথাকথিত অভিজাত বাঙালীদের সঙ্গে তার নিজের কোন যোগাযোগ নেই।

এক রিক্‌শাওলার মুখে এক ভদ্রলোকের কথা শুনলাম। যখন ফরসা জামা-কাপড় পরেন, ঘন ঘন সিগারেট খান, পুলিসে চাকরি করেন—তখন তাঁকে 'ভদ্রলোক' বলতেই হবে। কিন্তু মনে মনে ভাবছি—তাঁকে 'মাল' বলব না 'চীজ্' বলব, না 'স্যাম্পল' বলব! কোন্‌টা ঠিক মানাবে ওই পুলিসপুঙ্গবকে? ঘটনাটা এই। পুলিস-অফিসারটি উক্ত রিক্‌শাওলার রিক্‌শায় চড়ে' প্রায় মাইল দুই গেলেন দুপুর রোদে। গলদঘর্ম রিক্‌শাওলা কপালের ঘাম মুছে যখন ভাড়া চাইলে তখন অবাক হ'য়ে গেলেন।

ভাড়া! ভাড়া চাইছে তার কাছে?

বললেন, "আমি কে চেন?"

"না হুজুর—"

"আমি দারোগা। তোমার রিক্‌শার নম্বর কত দেখি। ও, ১৭৫। আচ্ছা। কত ভাড়া চাই তোমার—"

ঘাবড়ে গেল রিক্‌শাওলা। বললে, "মাপ করবেন, আমি চিনতে পারিনি। মেহেরবানি করে' আমার নামে রিপোর্ট করবেন না, হুজুর।"

হুজুর বললেন, "কিন্তু তোমার নম্বরটা যে কাঁটার মতো বিঁধে গেল মনে। সে কি অমনিতে উঠবে?"

ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে রইল রিক্‌শাওলা।

"ও কাঁটা তুলতে হ'লে কিছু সেলামী লাগবে।"

"কত হুজুর—"

"অন্ততঃ এক টাকা—"

টাকাটা দিয়ে সেলাম করলে রিক্‌শাওলা, তার পর ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

রিক্‌শাওয়ালাটা আমার কাছে এসেছিল তার ছেলের ওষুধ নিতে।

"আমি আপনার পুরো ফী দিতে পারব না। কিছু মাপ করুন, পুলিসের জ্বালায় আমরা মারা যেতে বসেছি—"

বলে', ওই কাহিনীটি আমাকে বললে।

আমি বললাম, "তোমাদের তো ইউনিয়ন আছে। তোমরা এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই পার—"

সে বললে, "ইউনিয়ন? ছিল বটে আগে একটা। এখন সেটা উঠে গেছে—"

"কেন—"

"আমরা চাঁদা দিয়ে যে টাকাটা জমিয়েছিলাম আমাদের প্রেসিডেন্ট সেটা মেরে দিয়ে সরে' পড়েছেন। শুনছি নাকি বোম্বাই গেছেন।"

"কে ছিলেন প্রেসিডেন্ট?"

যার নাম করলে সে মোটেই শ্রমিক নয়, এক বড়লোকের বখা ছেলে।

ভাবছি—গরীবগুলোর উপায় কি তাহ'লে?

মন্নুর জ্বরটা কাল থেকে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। অর্থাৎ তাকে বিছানা নিতে হয়েছে। অনেকদিন থেকেই না কি একটু একটু জ্বর রোজই হ'ত, আমার কাছে গোপন করে' ছিল। কেন করেছিল জানি না। মন্নুর স্বভাবের মধ্যে কেমন যেন একটা গোপনতা আছে। তার অন্তরলোকে আমার অবাধ গতি, কিন্তু তবু মনে হয় ওর নিজস্ব আর একটা জগৎ আছে যেখানে ও একাকিনী। অসুখে পড়ে' ও যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছে। অপরাধী ধরা পড়ে' গেলে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি। আজবলাল আমার চেয়েও বেশী ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। চিরঞ্জীব আর মালতীকে টেলিগ্রাম করলুম। ওরা এখানে এসে থাকুক যতদিন না মন্নু সেরে উঠছে। সারতে দেরি হবে, টাইফয়েড বলে' মনে হচ্ছে।

আমার এক ভাগ্‌নে এসেছিল আমার কাছে। তার পরীক্ষা হ'য়ে

www.boiRboi.blogspot.com

গেছে, সে এসেছিল আমার কাছে একখানা চিঠি নিতে। চিঠি নিয়ে সে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে চাকরির জন্য। বন্ধুটি ইচ্ছে করলে নাকি চাকরি জুটিয়ে দিতে পারে একটা। চিঠিখানা নিয়েই সে চলে' গেল, মন্থর অসুখের জন্য তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখলাম না। এসেই চলে' গেল। যেন পোস্টাফিসে চিঠি ফেলতে এসেছিল।···সোহাগকে আজ টেলিগ্রাম করলাম আসবার জন্য! মন্থর টাইফয়েডই হয়েছে। আগেই আন্দাজ করেছিলাম। এখন রক্ত পরীক্ষা করে' নিঃসন্দেহ হয়েছি।

মন্থর অসুখে বাড়িতে যেন একটা সাড়া পড়ে' গেছে। দু'বেলায় অন্ততঃ পঞ্চাশ কাপ চা হচ্ছে, বৈঠকখানায় বারান্দায় লোকের ভিড়। আমার সহকর্মী ডাক্তাররা সবাই আসছেন, তাছাড়া আসছেন এখানকার প্রতিবেশীরা। আমার রোগীর আত্মীয়-স্বজনের ভিড় কম নয়, তারা সবাই রোজ খবর নিতে আসে। এরা গরীব, এরা অনাত্মীয়, কিন্তু এদের উৎকণ্ঠা দেখে মনে হয় এদের চেয়ে বড় আত্মীয় আমার আর কেউ নেই। আমার রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়েরা এখনও কেউ আসেননি। দু'চারজন পোস্টকার্ড-যোগে খবর নিতে চেষ্টা করছেন। আমি বড় ভীত হ'য়ে পড়েছি। সোহাগ দিনরাত কাঁদছে। মন্থর জ্ঞান নাই।

মন্থর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যাচ্ছে। ক'লকাতার একজন বড় ডাক্তারকে আসবার জন্য 'তার' করেছি। এর মধ্যেও 'কলে' বেরুতে হয়েছে আমাকে। রোগীদের বাড়ির বিপদের দিকটাও তুচ্ছ করতে পারি না। তিনটে টাইফয়েড রুগী আমার চিকিৎসায় আছে। আমার উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। সুতরাং আমাকে যেতেই হচ্ছে।

আমার এই সব করুণ রসের মধ্যেও হাস্যরসের খোরাক পেয়ে যাচ্ছি মাঝে মাঝে। মহাকাল যেন জীবন-মরণের একঘেয়েমি নষ্ট করবার জন্যে মাঝে মাঝে চাটনির ব্যবস্থা করছেন।

একটি বাড়ির কর্তা টাইফয়েডে মরণাপন্ন হ'য়ে আছেন। আজ তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখি একটি লোক বাইরের বারান্দায় বসে' হাউ হাউ করে' কাঁদছে। লোকটির এক মুখ কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ভুরুও কাঁচা-পাকা, ভুরু দুটি ঝুলে পড়েছে চোখের উপর। চোখের জলে

নাকের জলে এই মুখ পরিপ্লাবিত। আমি ভাবলুম কোন আত্মীয় বুঝি। পরে জানতে পেরেছি, আত্মীয় নয়—পাওনাদার। যিনি রুগী তিনি অসুখে পড়বার ঠিক আগেই ওর কাছ থেকে চড়া সুদে হাজার তিনেক টাকা ধার নিয়েছিলেন। বলেছিলেন হ্যাণ্ডনোটটা কাল লিখে দেব। কিন্তু সেইদিন রাত্রেই তিনি জ্বরে পড়েন, আর লিখতে পারেননি!

www.boiRboi.blogspot.com

কুলগুরু এসেছেন। তিনি দক্ষিণাকালীর পূজা করছেন। তারস্বরে পাঠ করছেন দক্ষিণাকালীর স্তব। "করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং" যদি দয়া করে' মনুকে ফিরিয়ে দেন। বলিদানের ছাগ-শিশুটা আর্তরব করছে। পূজার হট্টগোল ঘণ্টা-কাঁসরে প্রকম্পিত হচ্ছে বাড়িটা। এত গোলমাল আমি কখনও বরদাস্ত করতে পারি না। কিন্তু এখন করছি। কিছু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। একটি কথাই কেবল মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে—মনুর জীবন-সংশয়—হেমারেজ হচ্ছে। যে কোনও উপায়ে হোক ওকে বাঁচাতেই হবে, তা সে উপায় যতই হাস্যকর, যতই অদ্ভুত হোক না কেন। এই আগ্রহের কাছে সমস্ত যুক্তি মাথা নত করেছে।

ক'লকাতায় যে ডাক্তারকে টেলিগ্রাম করেছিলাম তিনি দুঃখিত হ'য়ে টেলিগ্রাম করেছেন যে সাতদিনের আগে আসতে পারবে না। হেভিলি এন্‌গেজ্‌ড্‌! ওর সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছিলাম আমি। আমার চেয়ে ও সব বিষয়েই খারাপ ছিল। ফেল করেছিল দুবার। কিন্তু তার বাবা ছিলেন ক'লকাতার একজন যশস্বী ডাক্তার। টাকার অভাব ছিল না। ছেলেকে বিলেত পাঠালেন এবং সেখানে সে বারকয়েক ফেল করে' অবশেষে একটা বিলেতী ডিগ্রী নিয়ে এল। এসে বসতে লাগল বাবারই ডিস্‌পেন্সারিতে। বছর দশেক সেখানে টিকে রইল কোনক্রমে। তারপর তার প্র্যাক্‌টিস জমল। দশ বছর পরে ক'লকাতার রুগীরা বুঝতে পারল ও একজন দিগ্‌গজ ডাক্তার। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে আমারও ধারণা হ'ল ও সত্যিই বড় ডাক্তার। মনে হ'ল মনুর চিকিৎসা ও আমার চেয়ে ভালো করে' করতে পারবে! টাকার জোরে বারাঙ্গনারাও আজকাল 'দেবী', তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাও প্রথম শ্রেণীর প্রথম সারে দেদীপ্যমান। টাকার জৌলুস সকলেরই বুদ্ধিভ্রংশ করে' দেয়।

আমি ভাবতাম আমার বুদ্ধি এসব মেকি জিনিসে অভিভূত হয় না। কিন্তু

এখন দেখছি হয়। এখন মনে হচ্ছে কোন্‌টা মেকি কোন্‌টা খাঁটি তা ধরাও শক্ত। হাঁসেদের মধ্যে কোনও বক যদি দীর্ঘকাল বাস করতে পারে, তাহ'লে সবাই তাকেও হাঁসের মর্যাদা দেবে—হাঁসেরা না দিক, মানুষেরা দেবে। অদ্ভুত জীব এই সামাজিক মানুষরা!

www.boiRboi.blogspot.com

আজবলালকে আর সামলানো যাচ্ছে না। সে মাথা খুঁড়ছে, চুল ছিঁড়ছে। পাগলের মতো হ'য়ে গেছে। সোহাগের ফিট হচ্ছে বারবার। একমাত্র মালতীই দৃঢ়হস্তে এই বিপর্যস্ত নৌকোটার হাল ধ'রে বসে' আছে। চিরঞ্জীব নির্বাক হ'য়ে গেছে, আমার অবস্থা অবর্ণনীয়। মনু কাল চলে' গেছে।

দিন কয়েক হ'ল বদলি হ'য়ে এসেছি। বদলি হওয়ার যে কি ঝঞ্ঝাট তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। গভর্নমেণ্টের বাড়ি, গভর্নমেণ্টের চাকর-চাপরাসী, যাওয়ার খরচও গভর্নমেণ্টের, কিন্তু তবু মনে হয় যে কি একটা লোকসান হচ্ছে। অর্থের দিক থেকে লোকসান হয় না, কারণ মাইনে যা পাবার ঠিক পাই, নতুন জায়গায় অনেক কলও আসে। কিন্তু তবু মনে হয় লোকসান হ'ল। মনে হয় পুরনো জায়গায় আমার কিছুটা অংশ যেন ফেলে এলাম, তা আর উদ্ধার করা যাবে না, হারিয়ে যাবে।

এখানে এসে ক'দিন খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমার আগে যিনি ছিলেন তিনি অসুস্থ হ'য়ে আমার বাড়িতেই রইলেন ক'দিন। তাঁর কলগুলো আমাকে সামলাতে হ'ল। অফিসের কাজকর্মও অগোছালো অবস্থায় পেয়েছি, ঠিক করে' নিতে হচ্ছে সেগুলো। হাসপাতালে সার্জিকাল কেসের ভিড় খুব। তিন-চারটে বড় অপারেশন রোজই করতে হয়। তাছাড়া পুলিস কেস আর পোস্টমর্টেম।

কাল, একটা পোস্টমর্টেম করে' মন বিকল হয়ে গেছে। মানুষ এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে? বিশেষ করে' মেয়েমানুষ? সতীনের ছেলের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে তাকে মেরে ফেলেছে একটা উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে। ছেলেটার বয়স মাত্র দশ বছর। মেয়ের আত্মীয়স্বজনেরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে যে মেয়েটা পাগল। তাই ওকে under observation রেখেছি। আমার পাগল বলে' মনে হয় না। খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। দেখে মনে হয় খুব নিশ্চিন্ত ঘুম। যেন এ জীবনের একটিমাত্র কর্তব্য শেষ করে' এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। এর পর যাই হোক ও তার তোয়াক্কা করে না।

হঠাৎ মনে হ'ল প্রায় সাত দিন মনুর কথা একবারও মনে পড়েনি। কাজের তোড়ে এই স্মৃতি রঙীন পালকটা ভেসে চলে' গেল না কি! লজ্জিত হলাম!

www.amarboi.blogspot.com

জিতু জেলে ক'দিন আগে এসেছে একটি রোগী নিয়ে। অতদূর থেকে ট্রেনভাড়া খরচ করে' এসেছে। বিনা পয়সার রোগী নয়, আমাকে রীতিমত ফী দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে। এখানে একটা ঘর ভাড়া করেছে।

জিতুকে বললাম—"ওর চিকিৎসা তো ওখানেই হ'তে পারত। এখানে ওকে এত খরচ করিয়ে নিয়ে এলে কেন?"

জিতু বললে—"আপনার উপর আমাদের বিশ্বাস বেশী। অন্য কোথাও চিকিৎসা করিয়ে ভরসা হয় না।"

মালতী বলছিল জিতু প্রায়ই বাড়ির ভিতরে এসে কাঁদে। মনুর জন্য। আমার সামনে কিন্তু সে শোক প্রকাশ করেনি একদিনও। মালতীর কাছে প্রকাশ করেছে লুকিয়ে। মালতীকে বলেওছে আমাকে একথা যেন না জানানো হয়। আমার মনে তাহ'লে দুঃখ হবে। মালতী কিন্তু কথাটা আমাকে বলে' দিয়েছে।

ডায়াবিটস্ সম্বন্ধে একজন ডাক্তার গড়গড় করে' অনেক নূতন কথা বলে' আমাকে সেদিন তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এত কথা আমি জানতাম না। নবতম সংস্করণের যে বইটা কিছুদিন আগে কিনেছি, তাতেও এসব কথা নেই। শ্রদ্ধা হল ডাক্তারটির উপর। দিন দুই পরে শ্রদ্ধা কিন্তু আর রইল না। আমার নামেও বিদেশী এক কোম্পানির বিজ্ঞাপনের প্যামফ্লেটটা এল। তাতে দেখলাম ওই সব কথাই লেখা আছে। গান্ধিজীর সেই কথাটা মনে পড়ল—এখানকার ডাক্তাররা বিদেশী ঔষধ ব্যবসায়ীদের দালাল মাত্র।

এসব অবশ্য সত্য যে বিদেশীরাই চিকিৎসাশাস্ত্রে বহুরকম গবেষণা করেছেন, তাঁদের গবেষণা ডাক্তারি শাস্ত্রে সত্য বলে' স্বীকৃতও হচ্ছে, কিন্তু একথা সমান সত্য যে আমরা মাছি-মারা কেরানীর দল, বিদেশী প্যামফ্লেটে যা কিছু লেখা থাকে তা নির্বিচারে সত্য বলে' বিশ্বাস করি এবং রোগীদের তা কিনতে বাধ্য করি। অনেক সময় রোগীরা এতে সর্বস্বান্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু আমাদের সেদিকে লক্ষ্য থাকে না। আমরা আপ-টু-ডেট চিকিৎসা করে' গর্ব অনুভব করি।

একটা আশ্চর্য লোক দেখলাম আজ। 'কল' থেকে ফিরছিলাম। এমন সময় টক্‌ করে' একটা পাথর এসে আমার গাড়িতে লাগল। আর একটু হ'লে জানালার কাঁচ ভেঙে যেত। গাড়ি থামালাম। দেখি কালো লম্বা শুঁটকো একটা লোক প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গোঁফ দাড়ি মাথার চুল লম্বা লম্বা, অনেকদিন তেল পড়েনি বলে' কটা হ'য়ে গেছে। কোমরে একটা ন্যাকড়া জড়ানো। উরুর অর্ধেকও ঢাকা পড়েনি তাতে। আমার ড্রাইভার আলী নেমে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে কেন সে ঢিল ছুঁড়েছিল।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কেবল তার গোঁফের জঙ্গলে একটা শিহরণ বয়ে' গেল দেখলুম। তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হ'ল ক্ষমতা থাকলে আমার মোটরটাকে সে ভস্মীভূত করে' দিত। কিন্তু কোন কথা বললে না সে।

পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় মোটর দাঁড়ালেই ছেলের দল এসে দাঁড়ায় আশে-পাশে। তাদের একজন বললে—ও লোকটা চিড়ি-মার। চিড়িয়া অর্থাৎ পাখী মারে। তীর দিয়ে বা বন্দুক দিয়ে নয়। ঢিল ছুঁড়ে। গুলতি দিয়ে ঢিল ছোঁড়ে না, হাত দিয়ে ছোঁড়ে। হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ। চড়ুই, শালিক, কাক, বক—যা সামনে পায় তাই মারে। মেরে পুড়িয়ে খায়। এক জায়গায় দেখলাম কতকগুলো ইঁট স্তূপীকৃত করা হয়েছে। আর তার কাছেই পোড়াবার সরঞ্জাম। দু'খান দাঁড়-করানো ইঁটের মাঝখানে কয়লা। কয়লা সে কেনেনি, শুকনো ডালপালা পুড়িয়ে করেছে।

সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতে প্রাগৈতিহাসিক বন্যযুগের নমুনা দেখে বিস্মিত হলাম।

কাল মনুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল। আত্মীয়স্বজনরা কেউ আসেনি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল এদেশের লোকেরা, যাদের আমরা মূর্খ ছোটলোক বলি, তারা আত্মীয়ের আত্মীয়েরও মৃত্যু হ'লে সবাই মাথা কামায়। গ্রামসম্পর্কের মৃত আত্মীয়দের সম্মান জানায় এই ভাবে। আমরা সভ্য কিনা, ওদের কাণ্ড দেখে হাসি। এমন বাঙালী বাবুরও খবর জানি যিনি মায়ের মৃত্যুতেও মাথা কামাননি। পুরোহিতকে মূল্য ধরে' দিয়েছেন। স্যুটের সঙ্গে ন্যাড়া মাথা নাকি নিতান্ত বেমানান। সুরুচিতে বাধে।

মনুর শ্রাদ্ধে একটি পেশাদার লোভী পুরোহিতকে ডেকে কাজ

www.boiRboi.blogspot.com

করালাম এবং দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ নামধেয় অব্রাহ্মণকে ভোজন করালাম এবং তথাকথিত বন্ধুবান্ধব, যাদের পোলাও মাংস খাইয়ে শতাধিক টাকা ব্যয় করলাম তাঁরা আমার কেহই বন্ধু নন। মনে পড়ল মনু একটা পা-কাটা খোঁড়াকে খাওয়াতে ভালবাসত। কিন্তু সে তো থাকে একশ' মাইল দূরে!

চাপরাসীকে বললাম—শহরে যত খোঁড়া ভিখারী আছে ডেকে নিয়ে এস। তাদের খাওয়াব।

চাপরাসী ফিরে এসে বললে খোড়া ভিখারী একটাও নেই। কানা আর নুলো আছে।

কম্পাউণ্ডার শোভনলাল বললে শিবমন্দিরে এক খোঁড়া সাধু থাকে। বলেন তো তাকে ডেকে আনি।

বললাম, আনো। একটু পরেই আবক্ষদাড়ি এক লাল সন্ন্যাসী ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এসে হাজির। মনে হ'ল সোবিয়েত রাশিয়া থেকে এল নাকি! কারণ তার সব লাল। দাড়ি লাল, মাথার পাগড়ি লাল, জামা জুতো এমন কি ছাতা পর্যন্ত লাল। সে বললে সে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাবে না, তার গুরুজীর বারণ আছে। তবে আমি যদি তাকে কিছু টাকা দি তাহ'লে সে শিউজির ভোগ চড়িয়ে প্রসাদ পেতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কত টাকা চাই?

সে আমার পিছন দিকে চেয়ে বললে, দশ টাকা। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম শোভনলাল দু'হাতে দশটা আঙুল তাকে দেখাচ্ছে। দূর করে' দিলাম লোকটাকে। জিতু জেলেকে আজ দশ টাকা পাঠিয়ে দেব মনুর সেই খোঁড়াকে ভাল করে' খাইয়ে দেবার জন্য।

তৃপ্তি-অতৃপ্তির রহস্য ভেদ করা শক্ত। কাল মালতী সামান্য বেগুন বাড়ি আর উচ্ছে দিয়ে শুক্তো রেঁধেছিল। এত ভাল লেগেছিল। আজ সেই মালতীই অনেক রকম মসলা দিয়ে মাংসের কোর্মা রেঁধেছে, রান্না ভালোই হয়েছে; চিরঞ্জীব তো বললে চমৎকার, কিন্তু খেয়ে আমার তেমন তৃপ্তি হ'ল না। কালকের শুক্তোটাই বেশী ভালো লেগেছিল। অথচ আগে এই মালতীরই রান্না কোর্মা কত তারিফ করে' খেয়েছি।

মালতীর রান্না ঠিক আছে। আমিই বদলাচ্ছি। ওস্তাদী গানের চেয়ে সাদাসিধে রামপ্রসাদী গানই বেশী ভালো লাগে আজকাল।

কম্পাউণ্ডার শোভনলাল আজ চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। এক পাউণ্ড কুইনিন সরিয়েছিল। যে বাড়ি থেকে কুইনিন উদ্ধার হয়েছে, সকলের ধারণা ছিল সেটা ওরই বাড়ি এবং বাড়ির কর্ত্রী ওর বউ। এখন শুনছি অন্যরকম। বাড়িটি বেশ্যাবাড়ি এবং ওই মেয়েটি ওর রক্ষিতা। আরও শুনছি হাসপাতালের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনটি—যিনি চন্দনফোঁটায় চিতেবাঘটি সেজে রোজ হাসপাতালে আসেন তিনি নাকি ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনিই পুলিসে খবর দিয়ে শোভনলালকে এই খপ্পরে ফেলেছেন।

আমি পক্ষপাতহীন থাকবার চেষ্টা করছি কিন্তু আমার মনে মনে ইচ্ছেটা শোভনলাল ছাড়া পাক আর ওই চিতেবাঘটা ফাঁদে পড়ুক। এরকম অবৈধ ইচ্ছে মনে জাগা উচিত নয়, কিন্তু জাগছে। বাইরে কিন্তু একটা ন্যায়পরতার মুখোশ পরে' আছি। আশ্চর্য!

দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় গাড়ির টায়ার ফাটল। আলী বললে, "কুছ্ ফিকির নেই হুজুর, আভি হাম সব ঠিক কর দেঁতে হেঁ। স্টেপ্‌নি ঠিক হ্যায়।"

কিন্তু দেখা গেল স্টেপ্‌নিও ঠিক নেই। এতেও দমল না আলী। বলল—"কুছ্ ফিকির নেই হুজুর, আভি বানা লেঙ্গে। আপ পেড়কা ঠাণ্ডে মে মজেসে বৈঠ যাইয়ে—"

কাছেই একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়া ছিল। আলী সেখানে আমার বিছানা করে' দিলে একটা। আমি ছায়ায় বসে' বসে' তার চাকা-বদলানো দেখতে লাগলাম।

চাকা-বদলানো কাজটা নিতান্ত সহজ নয়। প্রথমে সে স্টেপ্‌নির ভিতর থেকে টিউবটা বার করলে। তারপর যেখানে-যেখানে ছ্যাঁদা হয়েছে সেগুলো সলিউশন দিয়ে জুড়ে আবার টিউবটাকে তার ভিতরে পুরে পাম্প্ করতে লাগল। পাম্প্ হ'য়ে গেলে সে বেরুলো ইট খুঁজতে। কাছে-পিঠে কোথাও ইট ছিল না। সে জঙ্গলের মধ্যে চলে' গেল। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। তপ্ত 'লু' বইছে। আলী নির্বিকার। জঙ্গল থেকে খুঁজে ইট নিয়ে এল। তারপর 'জক' ফিট্ করে' ফাটা টায়ারটা বার করলে। সেটাকে সরিয়ে দিয়ে স্টেপ্‌নিটা ফিট্ করতে লাগল।

আমি আলীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। রোগা লোকটা, বয়স

হয়েছে, মুখে জরার চিহ্ন স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। ওর জীবনচরিতও কিছু কিছু জানি। ও সব রকম কাজ করেছে। রিক্সা চালিয়েছে, টমটম চালিয়েছে, একটা ঘোড়া-গাড়ির কোচোয়ানও ছিল কিছুদিন, মুটেগিরি পর্যন্ত করেছে। বহু জায়গায় ঘুরেছে। বহু মনিবের কাছে মোটরের ড্রাইভারি করেছে। মিলিটারিতে ছিল, দেশ-বিদেশেও ঘুরেছে অনেক। হঠাৎ মনে হ'ল আব্রাহাম্ লিংকনের মতোই ওর জীবন। কিন্তু ও আব্রাহাম্ লিংকন হয়নি কেন? ওর দুটো সাংঘাতিক দোষের কথা জানি। প্রথমতঃ, ভয়ানক মিথ্যে কথা বলে। দ্বিতীয়তঃ, সুযোগ পেলেই মদ খায়। চাকা ফিট্ করে' আলী বললে—"আইয়ে হুজুর, গাড়ি তৈয়ার হ্যায়।" গাড়িতে বসে' আলীকে জিজ্ঞেস করলাম—"আলী, তুম্ ঝুট্ বাত বোলা হ্যায়—"

"কভি নেহি হুজুর—"

"কভি নেহি বোলো"

"বহুত খু"—

"দারু পিতে হো?"

"কভি নেহি হুজুর"

"কভি নেহি পিও"

"বহুত খু—"

হঠাৎ এই মিথ্যেবাদী মাতালটাকে ভালো লেগে গেল। আব্রাহাম্ লিংকনের চেয়েও!

এই পৃথিবীতেই কি স্বর্গ নরক আছে? মহাপ্রভু সিং এই জীবনেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে দেখতে পাচ্ছি। কিছুদিন আগে যখন জরিপ হয়েছিল তখন মহাপ্রভু সিং আমিনকে মোটা ঘুষ খাইয়ে গঙ্গার ধারের প্রায় তিন মাইল-ব্যাপী জমি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল। তার মধ্যে অনেক বিধবার, অনেক নাবালকের, অনেক গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জমিও ছিল। জমির দখল নিয়ে মকদ্দমা করবার সামর্থ্য ছিল না বেচারীদের। তাদের নীরবে অশ্রুপাত করে' নিরস্ত হ'তে হয়েছিল। মহাপ্রভু সিং সাড়ম্বরে জমিগুলো ভোগ করছিল। গঙ্গার ধারে বিরাট বাড়ি করিয়েছিল, বাড়ির চারদিকে চমৎকার বাগান। শোনা যায় বাগান আর বাড়ি করতে তার হাজার পঁচিশেক টাকা

www.boiRboi.blogspot.com

খরচ হয়েছিল। বাড়ি যেই শেষ হ'ল অমনি কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হ'তে হ'ল তাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী না বলে' অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী বলাই উচিত। স্বয়ং মা গঙ্গা এসে হাজির হলেন তার বাড়ির সামনে এবং দিন সাতেকের মধ্যে বাড়ি-বাগান সব গ্রাস করলেন।

মহাপ্রভু সিংয়ের টাকা ছিল, সুতরাং রোখ চড়ে' গেল। আর একটা বাড়ি করলো, সেটাও কেটে গেল। উপর্যুপরি পাঁচটি বাড়ি কেটে গেছে তার। শেষ বাড়িটি করিয়েছিল গঙ্গার ধার থেকে তিন মাইল দূরে। কিন্তু মা গঙ্গা তাকেও রেহাই দেননি; সেখানেও গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। আমিনকে ঘুষ দিয়ে যে-সব জমি সে দখল করেছিল, সব গঙ্গাগর্ভে গেছে। মহাপ্রভু সিং এখন একটা খোড়ো ভাড়াটে ঘরে বাস করে। পাঁচ ছেলে ছিল, সব মারা গেছে একে একে। চোখে দেখতে পায় না। একটা পুরনো চাকর তাকে হাত ধরে' ধরে' নিয়ে বেড়ায়। কাল আমার কাছে এসেছিল চিকিৎসা করবার জন্যে। তার সর্বাঙ্গে কি যেন বেরিয়েছে। দেখলাম, কুষ্ঠ হয়েছে। কথাটা শুনে থর্ থর্ করে' কাঁপতে লাগলো। তারপর অজ্ঞান হ'য়ে গেল। নরক কি এর চেয়েও বেশী ভয়ংকর?

আমার এখানে প্রাক্‌টিস বেড়েছে বলে' অনেকের রাত্রে ঘুম নেই, অনেকের টনক নড়েছে, অনেকের চোখ টাটিয়েছে। শুনছি আমার বিরুদ্ধে একটা দরখাস্ত গেছে উপরওয়ালার কাছে। আমি নাকি হাসপাতালের কাজ ফাঁকি দিয়ে কেবল প্রাক্‌টিস ক'রে বেড়াই। আমি নাকি নিজে বাড়িতে ওষুধ রেখে তা বিক্রি করি।

যে ওষুধ হাসপাতালে নেই বা বাজারে সহজে পাওয়া যায় না, কিংবা যে-সব ওষুধ ইমার্জেন্সীর জন্য হঠাৎ দরকার হয় তা নিজের কাছে রাখবার অনুমতি আমি অনেক আগেই নিয়ে রেখেছি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। আমি হাসপাতালের কাজ ফাঁকি দিয়ে প্রাক্‌টিস করছি এ অপবাদও টিকবে না, কারণ আমি এখানে এসে যতগুলো অপারেশন করেছি এবং রোজ করি, তত আমার আগে আর কেউ করেননি। সুতরাং ওই দরখাস্ত আমার কেশস্পর্শ করতে পারবে না। হৃদয় স্পর্শ করেছে কিন্তু। দরখাস্তকারীদের নাম জানতে পেরে প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি। সবাই প্রায় বাঙালী এবং অনেকেই আমার কাছে উপকৃত।

ব্যাঙ্কের খাতাটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই আজ আলমারির ড্রয়ারগুলো খুঁজছিলাম।

অনেক চিঠি আর পুরনো কাগজপত্রের ভিড়ে যেন দিশেহারা হ'য়ে পড়লাম। অতীতের পুরনো বন্ধুরা যেন ঘিরে দাঁড়াল আমাকে একসঙ্গে। যারা একদিন কত আত্মীয় ছিল আজ তারা কে কোথায় আছে জানি না। কয়েকজনের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি। অন্যদের কোন খবরই জানি না। যখন ভাগলপুরে ছিলাম তখন আমার ধোপার নাম ছিল কারু। ছোট একখানা খাতার উপর মনুর হাতের লেখা আছে দেখছি—কারুর হিসাবের খাতা।

মনুর একটা চিঠিও পেলাম। মনু লিখেছে, "তোমার জন্যে আমার বড় ভাবনা হয়। তুমি শরীরের যত্ন কোরো। আজবলালকে বোলো যেন তোমার মোটরের টিফিন কেরিয়ারে রোজ লুচি, তরকারি আর ডিমের ওমলেট করে' দেয়। থারমসে ঠাণ্ডা জলও ভরিয়ে নিও। ঠাকুরপো চিঠি লিখেছে তুমি নাকি সকালে খালি পেটে চা খেয়ে বেরিয়ে যাও আর ফেরো বেলা দেড়টা দুটোর সময়। অতক্ষণ খালি পেটে থাকলে পিত্তি পড়বে না? আজবলালকে দিয়ে খাবার করিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেও। বাবা আমাকে যেতে দিচ্ছেন না এখন, তাই আটকে পড়েছি। কিন্তু তুমি যদি শরীরের উপর অত অত্যাচার কর তাহ'লে আমাকে বাধ্য হ'য়ে চলে' যেতে হবে। আমার জন্যে ভেবো না। আমার শরীর বেশ ভালো আছে। আমি মরব না। এদেশে মেয়েরা অমর। আমার আশেপাশে রোজ যতগুলি মেয়ে দেখি তাদের অধিকাংশই বিধবা। আমার কিছু হবে না, তুমি ভেবো না। নিজের শরীরের যত্ন কোরো তুমি। আমি বোধ হয় দিন পনেরো পরে যাব। এই সপ্তাহেই যেতাম, কিন্তু বাবা ছাড়ছেন না...।"

মানুষ যখন ভবিষ্যদ্বাণী করে তখন তার আত্মপ্রত্যয়ের সীমা থাকে না। কিন্তু মহাকালের বিচারে সব ভবিষ্যদ্বাণী বুদ্বুদের মতো ফেটে যায়। মনু আজ কোথায়? শুধু সে যে সশরীরে বেঁচে নেই তা নয়, আমার মনের ভিতরও নেই। তার স্মৃতি ক্রমশঃ ঝাপসা হ'য়ে আসছে। আজকাল ক্বচিৎ তাকে মনে পড়ে।

রেভারেণ্ড টমসনের সঙ্গে আজ দেখা হ'ল। দেখা হ'য়ে কৃতার্থ হ'য়ে

গেলাম। অত বড় বিদ্বান, অমন শান্ত, অমন নিরহংকার পরোপকারী লোক আমি আর দেখিনি। এক অখ্যাত পল্লীর একপ্রান্তে বাস করেন তিনি একটা মাটির খোড়ো ঘরে। সামনে সামান্য একটু জমি আছে। তারই একাংশ কঞ্চি দিয়ে ঘিরে সামনে একটু শাকসব্‌জির বাগান তাঁর। নিজেই তার দেখা-শোনা করেন। স্বপাক খান। অতি সাধারণ খাওয়া। ওই শাকসব্‌জি. ভাত আর একটু দুধ। একটু কথা কয়ে' বুঝলাম জ্ঞানের সমুদ্র। ডাক্তারি শাস্ত্রেও আমার চেয়ে বেশী পণ্ডিত বলে' মনে হল'। ক্যানসার সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায়-লেখা একটা বই দেখালেন আমাকে।

আমি তাঁকে বললুম—ফরাসী ভাষা আমি জানি না।

তখন তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করে' করে' কিছু পড়ে' শোনালেন। অত বড় পণ্ডিত লোক, কিন্তু কথায় ব্যবহারে বিনয় যেন বিকীর্ণ হচ্ছে আলোর মতো। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা কইলেন যেন আমি তাঁর গুরু। তাঁর শোবার ঘরে দেখলাম একটি বড় ক্রুশ রয়েছে। তার সামনে বসেই তিনি সকাল-বিকেল প্রার্থনা করেন। কাউকে কখনও ক্রিশ্চান হ'তে বলেন না, বলেন, ভালো হও। তাঁর কাজ হচ্ছে সেবা। অনেকগুলি ছোট ছেলেকে বিনাপয়সায় পড়ান রোজ। কারো অসুখ হ'লে শুশ্রূষা করেন। সাধারণ ওষুধ বিতরণ করেন বিনামূল্যে। কাছে একটা জঙ্গল আছে সেখানে রোজ যান সকালে। নিজের রান্নার জন্যে সংগ্রহ করে' আনেন শুকনো ডালপালা আর সংগ্রহ করেন বট্যানিক্যাল গবেষণার জন্য নানারকম নমুনা। একটি ছোটখাটো ল্যাবরেটরি আর মাইক্রোস্‌কোপও আছে তাঁর। আর আছে অসংখ্য ভক্ত যারা তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে ব্যগ্র, কিন্তু তাদের সাহায্য তিনি কদাচিৎ নেন। তাঁর প্যাণ্টে আর জুতোয় দেখলাম নানারঙের তালি। আসবাবের মধ্যে দুটি কেরোসিন কাঠের টেবিল, গুটি চারেক মোড়া, একটি তক্তাপোশ।

এই সামান্য উপকরণেই তাঁর জীবন সমৃদ্ধ, পরম আনন্দে বাস করছেন মহর্ষির মতো। শুনেছি কোনো এক বিলিতী মিশনারি ফাণ্ড থেকে তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা পান। তা দিয়ে প্রতিমাসে ওষুধ কেনেন প্রায় কুড়ি টাকার। কুইনিন, অ্যাস্‌পিরিন, সালফা ড্রাগস্‌, আইওডিন, স্পিরিট আর ওইজাতীয় সস্তা সাধারণ ওষুধ।

আমাকে ডেকেছিলেন নিজের দাঁত তোলাবার জন্য। আমি ফী নিতে চাইলাম না। তখন তিনি বললেন—তাহ'লে আপনার নামে ৫'০০ টাকা আমি ডোনেশনস্বরূপ নিচ্ছি। ডোনেশনের রসিদ একটা দিলেন আমাকে। একাধারে এত গুণের শোভন সমন্বয় আমি আর দেখিনি।

প্রত্যেক লোকই একটা-না-একটা কিছু অবলম্বন করে' টিকে থাকেন। বাইরের অবলম্বন নয়, মনের অবলম্বন। এই অবলম্বন না থাকলে মানুষ নোঙ্গরহীন নৌকার মতো সংসার-সাগরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। এই অবলম্বনই তাঁর শক্তির উৎস, ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র। এই অবলম্বনেরই বোধ হয় অপর নাম অহংবোধ বা অহংকার। কারও জ্ঞানের অহংকার কারও ধর্মের অহংকার, কারও যশের অহংকার, কারও বা টাকার অহংকার। এই সব নোঙ্গরের সহায়তায় আমরা নিজেদের জীবনকে স্থির রাখবার চেষ্টা করি। যিনি ধার্মিক তিনি ধর্মকে আঁকড়ে থাকেন, যিনি জ্ঞানী তিনি জ্ঞানকে। যিনি ধনী তিনি মনে করেন টাকার জোরেই তিনি টিকে থাকবেন। আজ কিন্তু নেকিচাঁদকে দেখে মনে হ'ল ধনের নোঙ্গরটাই বোধহয় সবচেয়ে বেশী অপলকা। একটা বড় ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে, নেকিরাম ভিখারীর মতো হাহাকার করে' বেড়াচ্ছে। টাকাই তার সর্বস্ব ছিল, এখন সে নিঃস্ব।

আর মাস দুই পরেই আমাকে রিটায়ার করতে হবে। রিটায়ার করে' কোথায় যাব? কি করব? আমাদের সাময়িক অনেকেই রিটায়ার করে' প্রাক্‌টিস করতে বসেছেন। এঁদের অনেকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল। আলাপ করে' হতাশ হয়েছি। প্রত্যেকেই দেখলাম আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ, অনেকে আবার বিষকুম্ভ পয়োমুখ। কেউ সুখী নয়। অনেকের ধারণা শহরের লোকেরা তাঁদের যথোচিত মর্যাদা দেয়নি, অনেকের বিশ্বাস তাঁরা জ্ঞানে বুদ্ধিতে এতো অধিক উচ্চস্তরের যে সাধারণ লোক তাঁদের নাগাল পায় না। সুতরাং যতটা প্রাক্‌টিস হবে তাঁরা আশা করেছিলেন ততটা হয়নি এবং সেজন্য তাঁরা মনে মনে ক্ষুব্ধ, যদিও বাইরে একটা 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাব ফুটিয়ে রেখেছেন। শহরের অন্য ডাক্তারদের প্রতি অসীম অবজ্ঞা তাঁদের।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এরকম একটা ভণ্ডামির মুখোশ পরবার

ইচ্ছে নেই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টাকার জন্যে হায়হায় করবারও প্রবৃত্তি নেই আমার। দরকারও নেই। যা রোজগার করেছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু করব কি? চুপ করে' তো বসে' থাকা যাবে না। কিছু একটা করতেই হবে। অনেকের বুড়ো বয়সে ধর্মে মতি হয়। আমার কিন্তু সে মতি এখনও হয়নি। জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি। ডাক্তারি ছাড়া আর কিছুতে প্রবৃত্তি নেই। আর কিছু জানিও না। কিন্তু কোথায় ডাক্তারি করব! যারা মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখে, অ্যাবর্শন করিয়ে, দালালকে কমিশন দিয়ে প্রাক্‌টিস জমায়, তাদের দলে ভিড়ে গিয়ে গুঁতোগুঁতি করতে হবে শেষে? ওদের চেয়েও respectable তথাকথিত অনেস্ট ডাক্তারও যে নেই তা নয়, কিন্তু তাদের সবজান্তা ভাব, তাদের আত্মম্ভরিতা, তাদের আন্তরিকতার অভাব, তাদের মেকি হাসি এবং লেফাপাদুরস্ত ভদ্রতা আরও অসহ্য হয় আমার কাছে।

মনে আর একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। জীবনের শেষে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে গিয়ে বাস করব, তাদের নিয়েই থাকব। কিন্তু এখন অনুভব করছি আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ আমার আত্মীয় নয়। অধিকাংশই শত্রু। হয় প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে, না হয় মনে মনে বিরুদ্ধভাব পোষণ করে। কাউকে আমি আপন করতে পারিনি। হয়তো এটা আমার নিজেরই দোষ, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বুঝেছি যে ওদের সঙ্গে বাস করা যাবে না। কি করব তাহ'লে? কোন্ তীর্থে গিয়ে থাকব? দু'একটা তীর্থস্থানে ইতিপূর্বে বেড়াতে গেছি। ভালো লাগেনি। সমস্যায় পড়েছি কি করব।

এইখানেই একটা বাড়ি কিনে ফেললাম। বাড়িটার অসুবিধা অনেক। শহর থেকে দূরে। পাড়াটাও ভালো নয়। কিন্তু প্রকাণ্ড হাতা আছে বাড়িটার চারধারে। হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারব। শহরের মাঝখানে ঘেঁষাঘেঁষি করে' থাকতে পারি না আমি। ক'লকাতায় ওই জন্যেই গেলাম না। সেখানে গিয়ে কিই বা করতুম? তাস খেলা, আড্ডা দেওয়া বা পার্কে চক্কোর দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করার বাতিক আমার নেই। ক'লকাতা একটা সমুদ্র বিশেষ। তার মধ্যে সাপ-হাঙরও আছে, আবার মণি-মাণিক্যও আছে।

অনেকদিন ক'লকাতায় বাস করলে মনের মতো সঙ্গী হয়তো পেতে পারতুম। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ গিয়ে তা পাব না! কিছুদিন আগে ক'লকাতায় গিয়েছিলাম! দেখলাম সব অচেনা। চেনা লোকেরাও অচেনা হ'য়ে গেছে। সবাই নিজের নিজের ঘানিতে বাঁধা' অপরের দিকে তাকাবার কারও অবসর নেই। দেখা হ'লেই মুচকি হাসিটা আর নমস্কারটাও যেন বাঁধা ফরমুলার মতো যন্ত্রচালিতবৎ। প্রাণ নেই, আন্তরিকতার অভাব। এরকম মরুভূমিতে টেকা যাবে না। তাই এখানে থাকাই স্থির করলাম। এখানে অনেককেই চিনি, অনেকে আমাকেও চেনে। এদের মধ্যে থেকেই বাকি জীবনটা কাটাব। পুরাতন উপকরণ দিয়েই নূতন জীবনের রাস্তা একটা তৈরী করতে হবে ভেবে-চিন্তে। দেখা যাক কি করতে পারি।

এখানকার স্বরূপ পাণ্ডের ছেলে পাগল হ'য়ে গিয়েছিল। তাকে কাঁকে নিয়ে যেতে বলেছিলুম, কিন্তু নিয়ে যায়নি। নিয়ে গিয়েছিল এক দেহাতী কবিরাজ বজ্‌রংগী মিশিরের কাছে। বজ্‌রংগী মিশির বেশ কৃতবিদ্য কবিরাজ। কাশীতে অনেকদিন পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু তিনি কবিরাজী প্রাক্‌টিস করেন না, করেন চাষবাস। স্বরূপ পাণ্ডের সঙ্গে তাঁর নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হয়েছিল। স্বরূপ পাণ্ডেকে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন—"কে আপনি, কি চান?"

"আমার ছেলে পাগল হ'য়ে গেছে"

"তা আমি কি করব—"

"আপনার কাছে চিকিৎসার জন্যে এনেছি—"

"আমি চিকিৎসা করি না। তাছাড়া এখন আমার ফুরসত নেই, আমার গম দৌনি হচ্ছে—"

"যদি দয়া করে' একবার দেখেন ওকে—"

"আমি দয়া করলে কিচ্ছু হবে না। মহাপাপ না করলে লোকে পাগল হয় না। ভগবান দয়া করলে কিছু হ'তে পারে। আমি দয়া করলে কিছু হবে না।"

"না, তবু কিছু ওষুধ বলে' দিন—"

"পাপের ওষুধ প্রায়শ্চিত্ত। তাই কর গিয়ে—"

স্বরূপ পাণ্ডে বিব্রত হ'য়ে পড়লেন।

তারপর বললেন—"আপনার উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস। আপনার নাম শুনে এসেছি। এমন করে' তাড়িয়ে দেবেন না।"

"ও, আমার উপর বিশ্বাস আছে নাকি? আচ্ছা, তাহ'লে এক কাজ কর। ওই যে কুয়োটা দেখছ ওর জল তুলে ওকে খাওয়াও আর ওই জলে ওকে চান করাও—"

"আর কোন ওষুধ দেবেন না?

"ওই ওষুধ।"

এই বলে' মিশিরজী তাঁর ছাতা আর লাঠি নিয়ে মাঠের দিকে চলে' গেলেন। মিশিরজীর বাড়ীর চাকর দীনু বললে—"উনি যা বললেন তাই এখন করুন কয়েকদিন। যদি ওই করে' কয়েকদিন টিকে থাকতে পারেন তাহ'লে উনি ভালো করে দেখে ওষুধ দেবেন।"

সাত দিন পরে মিশিরজী বললেন—"আচ্ছা, এবার ওকে আন দেখি।"

প্রায় আধঘণ্টা নাড়ী ধরে' বসে' রইলেন। তারপর ওষুধ দিলেন। স্বরূপ পাণ্ডের ছেলে ভালো হ'য়ে ফিরে এসেছে।

আমার প্ল্যান ঠিক করে' ফেলেছি। খুব বড় একটা 'স্টেশন ওয়াগন' কিনলাম। তাতে শোবার জায়গা, রাঁধবার জায়গা, এমন কি ছোটখাটো একটা ড্রইংরুমের মতোও আছে। শতকরা আশীটা অসুখ যে-সব সাধারণ ওষুধ দিয়ে সারে সেগুলোও অনায়াসে রাখা যাবে ওতে। প্রচুর জায়গা আছে গাড়িটাতে। ভ্রাম্যমান ডাক্তার হব ঠিক করেছি। গ্রামে গ্রামে হাটে বাজারে ঘুরব। চিকিৎসা করব সাধারণ লোকেদের! চিকিৎসা করব পয়সা রোজকার করবার জন্য নয়, নিজের তাগিদে। কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা না করলে হতাশার কবলে পড়তে হবে না।

চার

মৎস্যব্যবসায়ী আবদুলের বাড়ি শহর থেকে প্রায় মাইল চারেক্ দূরে। সেখানে একটা খোলার ঘরে সে সপরিবারে বাস করে। ডাক্তার

সদাশিবের মোটর তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল। আর মোটরটা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল একপাল উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে।

সদাশিব রমজুকে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে বেরিয়ে এলেন খোলার ঘর থেকে। আর তাঁর পিছু-পিছু বেরিয়ে এল এক পলিতকেশা বৃদ্ধা। আবদুলের নানী, অর্থাৎ ঠাকুমা। অনেক শোক পেয়েছে সে। স্বামী পুত্র নাতি নাতনী সবই প্রায় মারা গেছে। বেঁচে আছে কেবল আবদুল আর তার ছেলে রমজু। বুড়ীর পরনের কাপড় ছেঁড়া ময়লা। মুখের ভাবে কোন স্নিগ্ধতা নেই। আছে একটা 'মরিয়া' ভাব। সদাশিব মোটরের ভিতর থেকে কয়েকটি গুলি বার ক'রে তার হাতে দিয়ে বললেন—"চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবি। দেখি, তোর চোখের খবর কি—"

চোখের পাতা তুলে দেখলেন।

"পাকতে দেরি আছে এখনও। আগামী শীতে কেটে দেব তোর ছানি।"

বুড়ী ঝাঁজিয়ে উত্তর দিলে—"দরকার নেই আমার চোখ কাটিয়ে। পারো তো আমার কান দুটোও কালা করে দাও। আমি কিছু দেখতেও চাই না, শুনতেও চাই না—"

ডাক্তার সদাশিব বুড়ীর থুতনিটি নেড়ে হেসে বললেন—"এত রাগ কেন নানী? ভগবানকে ভুলে গেছিস্?"

এই কথায় ঝরঝর করে' কেঁদে ফেলল্ নানী। ময়লা কাপড় দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললে—"আমি ভগবানকে ভুলিনি ডাক্তারবাবু, ভগবানই আমাকে ভুলেছেন।"

সদাশিব করুণ দৃশ্য এড়িয়ে চলতে চান।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে বললেন—"আলী, হাজিপুর হাটে চল।" "বহুত খু"—

পাঁচ

হাজিপুরের হাট প্রকাণ্ড হাট। রাস্তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা গাছ আছে। প্রচুর ছায়া। সেই ছায়াতে টেবিল আর চেয়ার পেতে রোগী দেখছিলেন সদাশিব। একটি ফোল্‌ডিং টেবিল আর ফোল্‌ডিং চেয়ারও

থাকে তাঁর মোটরে। রোগী অনেক। অধিকাংশই সাধারণ রোগ। ম্যালেরিয়া, আমাশয়, চোখ-ওঠা, খোস, দাদ। যক্ষ্মাও আছে দু'একটা।

একটা খাতায় নাম, অসুখের লক্ষণ এবং ওষুধের ব্যবস্থা লিখে নিজে হাতেই ওষুধ দেন সদাশিব। ওষুধের প্রকাণ্ড বাক্স একটা পাশেই থাকে। তাতে খোপ-খোপ করা। কুড়িটা শিশি আঁটে। সব ওষুধই ট্যাবলেট-কয়া। পুরিয়া-করাও আছে কিছু কিছু। আর আছে ইনজেক্‌শন। সেগুলো আর প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি আলাদা একটা বড় ব্যাগে থাকে। স্টেথোস্কোপ, ব্লাড-প্রেসার মাপবার যন্ত্র, থার্মোমিটার, ছোট একটা মাইক্রসকোপ, স্লাইড, স্টেন এই সব। দরকার বুঝলে ওই গাছতলায় বসেই রক্ত, প্রস্রাব, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা করে' নেন সদাশিব। আর একটা তালাবন্ধ বাক্সও থাকে তাঁর পিছন দিকে। সেটার ডালার উপরে লম্বাটে গোছের ছিদ্র আছে একটা। তাতে ওষুধের দাম বাবদ যে যা খুশি দিতে পারে। কারো কাছে তিনি দাবি করেন না কিছু, যার যা খুশি দেয়। কেউ যদি না-ও দেয় আপত্তি করেন না সদাশিব।

তিনি এই বাক্সের ব্যবস্থা করেছেন কারণ অনেক লোক বিনা-পয়সায় চিকিৎসা করাতে চায় না। আত্মসম্মানে বাধে। তাদের সম্মান বাঁচাবার জন্যেই এই বাক্সটি। বাক্সে যে পয়সা রোজ পড়ে তাতে ওষুধের দাম তো উঠে যায়ই, পেট্রোলের দামও উঠে যায়।

সদাশিব রোগী-দেখা শেষ করে' উঠতে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটি রোগা আধ-ঘোমটা দেওয়া মেয়ে এগিয়ে এসে হঠাৎ তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হ'য়ে পড়ল।

"এ কে—"

পাশেই একটা ট্যারা লোক দাঁড়িয়েছিল, সে অকারণে একটু হেসে বললে—"ও কেব্‌লী।"

"কি চায়—"

"ওর 'আদমি'কে থানায় ধরে' নিয়ে গেছে। দারোগাবাবু আপনাকে খাতির করেন, আপনি যদি বলে' দেন একটু ছাড়া পেয়ে যাবে।"

"হঠাৎ থানায় ধরে' নিয়ে গেল কেন?"

"ছবিলাল মোড়লের বাড়ি চুরি হয়েছে। তিনি ওর নাম বলে' দিয়েছেন দারোগাবাবুকে—"

"ওর নামই বা বলতে গেলেন কেন শুধু শুধু।"

"কি জানি। কেব্‌লী বলতে পারবে—"

কেব্‌লী থেমে থেমে বললে—"ছবিলালবাবু আমার 'আদমি'কে তাঁর খাপরার ঘর ছেয়ে দিতে বলেছিলেন। গতবার মজুরি দেননি বলে' এবার ও যায়নি। তাই উনি আমার এই সর্বনাশ করেছেন।"

কেব্‌লী কাঁদতে লাগল।

সদাশিবকে বলতে হ'ল—"আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে' দেখব।"

সদাশিব তারপর হাটের ভিতর ঢুকলেন। কিছু কিনতে হবে। প্রতি হাটেই কিছু-না-কিছু কেনেন তিনি। তাঁর সংসারে খাবার লোক কেউ নেই, তবু কেনেন। এর জন্যে মালতীর কাছে বকুনি খেতে হয়। মালতী বলে—"এত সব খাবে কে। ঘরে পড়ে' শুকোবে, না হয় পচবে!" সদাশিব হেসে উত্তর দেন—"খাবার লোকের কি অভাব আছে। দাই, চাকর, তাদের ছেলেমেয়েরা, ভিকিরি—সবাইকে খাওয়াও না।" "অত ঝক্কি আমি পোয়াতে পারব না"—মালতী বলে বটে, কিন্তু পোয়াতে হয়। রোজই বাড়িতে আট-দশটা পাতা পড়ে। আজবলাল এতে মনে মনে খুব খুশি হয়, কিন্তু মুখে গজগজ করে। বলে—"একি বাজে খরচা!"

হাটে ঢুকেই সদাশিবের দেখা হ'ল বিলাতী সাহের সঙ্গে। চালের বড় ব্যবসাদার। চক্‌চকে টাক, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। ফতুয়া একটা পরেছে বটে, কিন্তু ভুঁড়ি ঢাকেনি। ভুঁড়ো নাক, নাকের নীচে কটা রঙের সামান্য গোঁফ। বেশ ভারী মুখ। হাসলে এবড়ো-খেবড়ো হল্‌দে দাঁত বেরিয়ে পড়ে। সদাশিবকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করলে বিলাতী সাহ।

"কেমন আছ বিলাতী?"

"হুজুরকা কিরপা। চলে' যাচ্ছে।"

"আমার জন্যে চাল রেখেছ?"

"ভালো চাল এলে নিজেই পাঠিয়ে দেব।"

"আচ্ছা।"

এগিয়ে গেলেন সদাশিব তরকারির বাজারের দিকে।

কয়েকটি বড় কুমড়ো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কুমড়ো তিনি খান না। কিন্তু কুমড়োগুলোর নধর চেহারা দেখে কিনতে প্রবৃত্ত হলেন। যে বুড়ী কুমড়ো বিক্রি করছিল সে যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেল। বেশ বড়

দেখে ভালো একটা কুমড়ো বেছে দিয়ে বললে—

"এইঠো লে যা বেটা—"

"দাম কত ?—"

বুড়ী দেহাতী হিন্দী ভাষায় বললে—"তোর যা খুশি তাই দে—"

সদাশিব তাকে দুটো টাকা দিলেন।

"ওত্‌না দাম নেই হোতে, আট আনা দে—"

সদাশিব হেসে বললেন তিনি কুমড়োর দাম দিচ্ছেন না, তিনি টাকাটা দিচ্ছেন তার মেয়ে রৌশনকে। বছরখানেক আগে বিধবা হয়েছিল সে।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন, "রৌশনকে দেখছি না, সে কোথা ?"

"তার আবার বিয়ে দিয়েছি ডাক্তারবাবু। জোয়ান মেয়েকে কতদিন আর ঘরে রাখব।"

"বেশ করেছিস।"

সদাশিবের সম্মতি পেয়ে নিশ্চিত হ'ল বুড়ী।

তারপর সদাশিব অগ্রসর হলেন মাছের বাজারের দিকে। ভালো মৌরলা মাছ ছিল। তাই কিনলেন কিছু। মাছের বাজারে দেখা হ'ল বাবুলাল মেথরের সঙ্গে।

"তোর এ বউ কেমন হ'ল ?"

একটু সলজ্জ হাসি হেসে বাবুলাল বলল—"ভালোই তো মনে হচ্ছে—"

"রাধিয়ার সঙ্গে মারপিট করছে না তো।"

"না। দুজনে খুব ভাব।"

প্রথম বউ রাধিয়ার ছেলে হয়নি বলে' বাবুলাল আর একটি বিয়ে করেছে। বাবুলালই মৌরলা মাছগুলি তার গামছায় বেঁধে দিয়ে মোটরে পৌঁছে দিয়ে এল।

একটা ফেরিওলা লাল-নীল কাগজের তৈরী পাখী বিক্রি করছিল। পাখীর পিঠে লম্বা রবারের সরু ফিতে আটকানো। ফিতে ধ'রে নাড়ালে পাখী নাচে। কয়েকটা কিনলেন সদাশিব। 'কেঁদ্' বলে' একরকম ফল বিক্রি হয় এদেশে। কালচে-কমলা রং। খেতে মিষ্টি। একটি লোক এককোণে কয়েকটি 'কেঁদ্' নিয়ে বসেছিল। সদাশিব সেগুলিও কিনে নিলেন। কিছু তরি-তরকারিও কিনলেন। দোকানদাররাই সে-সব পৌঁছে দিয়ে এল তাঁর গাড়িতে।

www.boiRboi.blogspot.com

হাট থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন থানায় সিংহেশ্বর সিং দারোগার কাছে। নাম যদিও সিংহেশ্বর কিন্তু দেখতে জিরাফের মতো। ছিপছিপে রোগা, ঘাড়টা খুব লম্বা। গালে মুখে চোখের কোলে ধবল হয়েছে। সদাশিবই চিকিৎসা করছেন তাঁর। কথা বলার ধরনটা একটু বেশী রকম উচ্ছ্বসিত।

"আইয়ে আইয়ে ডাক্‌টার সাব্‌। কেয়া সৌভাগ্য, কেয়া সৌভাগ্য—"

চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন এবং একটু ঝুঁকে সদাশিবের হাত দুটি ধরে' বললেন,—"আইয়ে, আইয়ে, আইয়ে—"

"কি খবর! ওষুধ খেয়ে কিছু উপকার হ'ল?"

"দো একঠো সাদা দাগকা বিচ্‌মে তো রং লগা হ্যায়।"

"তাহ'লে আস্তে আস্তে সারবে। সময় নেবে কিছু। আমি একটা অন্য দরকারে এসেছি। এখানকার নারাণ বলে' একটা লোককে আপনি ধরে' এনেছেন—"

"হ্যাঁ।"

তারপর তিনি যা বললেন কেব্‌লী তা আগেই তাঁকে বলেছিল। ছবিলাল মোড়লের নির্দেশ অনুসারেই নারাণকে ধরতে হয়েছে।

"নারাণের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আছে?"

"না। এন্‌কোয়ারি চল রহা হ্যা—"

"ওকে ছেড়ে দিন। ও নির্দোষ।"

গম্ভীর হ'য়ে গেলেন সিংহেশ্বর। সরু গোঁফের উপর আঙুল বুলোতে লাগলেন। হাঁটু নাচালেন বার কয়েক। তারপর বললেন—"আপ্‌ যব্‌ কহ্‌তে হেঁ, তব্‌ জরুর দেঙ্গে—"

তারপর তাঁর লম্বা গলাটা বেঁকিয়ে সদাশিবের কানে কানে বললেন, ছবিলালবাবুকেও যদি সদাশিব অনুরোধ করতেন তাহ'লে তাঁর পক্ষে সুবিধা হ'ত। সদাশিব বললেন—"ছবিলাল লোকটা সুদখোর মহাজন। ওর সঙ্গে আমার তেমন আলাপও নেই।"

সিংহেশ্বর এর উত্তরে হিন্দিতে যা বললেন তার বাংলা মর্মার্থ—"আলাপ করে' রাখুন, আখেরে কাজ দেবে। উনি কংগ্রেসীদের পাণ্ডা, তারপর হরিজন, ওঁর একটা বাজেমার্কা ছেলে কেবল শিডিউল্‌ড্‌ কাস্ট বলে' ভালো চাকরি পেয়েছে। ওই চাকরি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ভালো ভালো ছেলেরা পায়নি। ওদেরই এখন প্রতাপ খুব—আলাপ করুন ওর সঙ্গে।"

সদাশিব চুপ করে' রইলেন।

তারপর বললেন—"আপনি নারাণের বিরুদ্ধে যদি প্রমাণ না পান, ছেড়ে দিন। দেবেন তো ?"

"আপনি যখন বলছেন তখন দেব। কিন্তু ছবিলালজী ওর উপর চটেছেন কিনা, তাই একটু 'খতরা' আছে,—দেখি।"

তারপর সিংহেশ্বর তাঁর ছোট ছেলে 'মুন্না'কে এনে দেখালেন। সর্বাঙ্গে খোস হয়েছে। তাকে ওষুধ দিয়ে চলে' গেলেন সদাশিব।

সেদিন সদাশিব তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন—

"ইংরেজদের হাত থেকে শাসনভার আজকাল যাঁদের হাতে গেছে তাঁরা শুধু যে অকর্মণ্য তাই নন, তাঁরা অসাধুও। এঁদের শাসনকালে দেশের সত্যিকার উন্নতি কিছু হয়নি। স্কুল-কলেজে ছেলেদের শিক্ষা হয় না। তারা গুণ্ডা হচ্ছে। শিক্ষকদের মারে, ভদ্রলোকদের হুমকি দেয়, মেয়েদের প্রকাশ্যে রাস্তায় অপমান করে, বিনা টিকিটে ট্রেনে বাসে চড়ে। পুলিস এদের কিছু বলে না। যদি কোন পুলিস বলে তাহ'লে তারই সাজা হয়, এদের হয় না। কর্তৃপক্ষ এদের তোয়াজ করেন, কারণ ইলেকশনের সময় এদের উপরই ভরসা তাঁদের। বাজারে খাদ্যদ্রব্য এত দুর্মূল্য যে সাধারণ লোক তা কিনতে পারে না। দুধ মাছ মাংস ডিম খুব কম লোকে খায়। চাল ডাল তরি-তরকারিও এত দুর্মূল্য যে লোকে পেট ভরে' খেতে পায় না। অথচ শোনা যায় নাকি সদাশয় গভর্নমেণ্ট চাষের উন্নতির জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। টাকা খরচ হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে টাকা ঢুকছে তাঁদের পেটোয়া লোকেদের পেটে।

"এখানে একটা পোলট্রি ফার্ম আছে। সেখান থেকে সাধারণ লোকে মুরগী বা ডিম পায় না। সেখানকার একজন কর্মচারী বলেছিলেন—'অফিসার আর মিনিস্টাররা সব মুরগী আর ডিম নিজেরা খেয়ে ফেলেন। পাব্লিককে দেবার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকলে তো দেবে!' বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ধার করে' এনে যে-সব বড় বড় কাণ্ড-কারখানা হচ্ছে এদেশে সে-সবের মধ্যেও চুরি-জোচ্চুরি এবং পেটোয়া-পোষণের ধুম পড়ে' গেছে নাকি। আসল কাজ যতটা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি।

"সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিজন আর শিডিউল্ড্ কাস্টের লোকেদের পোয়া বারো হয়েছে, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা নিষ্পিষ্ট হ'য়ে মারা

যাচ্ছে। তাদের মুখের ভাষা পর্যন্ত কেড়ে নেবার চেষ্টা করছেন ওঁরা। মুসলমান আমলে ফারসী আদালতের ভাষা ছিল, ইংরেজদের আমলে ছিল ইংরেজী—এঁদের আমলে এঁরা করেছেন হিন্দী। অন্যান্য ভাষাকে পিষে হিন্দীর জগদ্দল রোলার চালিয়েছেন এঁরা। সাধারণ স্কুলে ইংরেজী অবহেলিত হচ্ছে। কিন্তু মিনিস্টারদের ছেলেরা বিলাতী স্কুলে, কনভেণ্টে, কিণ্ডারগার্টেনে ইংরেজী ঠিক শিখছে। কারণ তারা জানে যে ইংরেজী না জানলে আধুনিক জগতে এক পা-ও চলা যাবে না। তারা চলবে, কিন্তু পিছনে পড়ে' থাকবে হতভাগ্য তারা যারা হিন্দী ছাড়া আর কিছু শেখেনি।

"আমাদের স্বাধীন ভারতে আর একটা ব্যাপারও হচ্ছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে লোপ করে' দেবার চেষ্টা করছেন কর্তৃপক্ষরা। তারা শিক্ষা পাচ্ছে না, চাকরি পাচ্ছে না। নানা অজুহাতে—কখনও জমিদারপ্রথা লোপ করে', কখনও বা জমির সিলিং করে'—তাদের বিষয়-সম্পত্তিও সরকার বাজেয়াপ্ত করছেন। মজুরদের মাইনে বা মজুরি সাতগুণ আটগুণ বেড়েছে—কিন্তু শিক্ষকদের, ডাক্তারের, কেরানীর, এমন কি গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী-দের বেতনও সে অনুপাতে বাড়েনি। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেরাই এই সব কর্মে নিযুক্ত। এদের কারও চিত্তে সুখ নেই। সবাই মনে মনে গোমরাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ভুলে গেছেন যে স্বাধীনতা-সুখ আজ তাঁরা রাজার মতন ভোগ করছেন সে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই ছেলেরা। তাদের ত্যাগ, তাদের আত্মবলিদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু দেশের কর্তৃপক্ষেরা সে ঋণ সম্বন্ধে উদাসীন।

"প্রাদেশিকতা উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রতি প্রদেশে। প্রতিটি প্রদেশই ছোট ছোট পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। সবাই সবাইকে হিংসা ও ঘৃণা করে।

"আমাদের কর্তৃপক্ষদের আজকাল প্রধান কাজ হচ্ছে বিদেশী তোষণ। রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ঈজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের নেতারা প্রায়ই এদেশে আসছেন, মালা পরে' খানা খেয়ে রাস্তার দু'পাশে হুজুকে বেকার লোকদের ভিড় দেখে চলে' যাচ্ছেন এবং এই মহৎ কর্মের জন্য আমাদের কোটি কোটি টাকা খরচ হ'য়ে যাচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতাকে নিরাপদ করবার জন্যে শক্তিশালী বিদেশী রাজ্যের সঙ্গে দহরম-মহরম রাখা হয়তো প্রয়োজন, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা মূলতঃ নির্ভর করে দেশের লোকের সদিচ্ছা এবং চরিত্রবলের উপর। এই কথাটা কর্তৃপক্ষেরা ভুলে গেছেন।

"আমি নানা স্থানে ঘুরি, নানা স্তরের লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়, বর্তমান গভর্নমেণ্টের উপর কাউকে সন্তুষ্ট দেখি না। ধনী দরিদ্র সবাই এই শাসনব্যবস্থার উপর চটা। সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে—এবং অনেক স্থলেই তা অমূলক নয়—আমাদের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে যাঁরা অবস্থান করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অপদার্থ, স্বার্থপর এবং অসাধু। তাঁরা অসাধু বলেই তাঁরা দেশের অসাধুতা নিবারণ করতে পারছেন না, তাঁদের কথা মানছে না কেউ। সুতরাং চোর ডাকাত জুয়াচোর কালো-বাজারীতে দেশ ভরে' যাচ্ছে।

"ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতারও প্রধান কারণ তাদের সামনে নির্মল-আদর্শনিষ্ঠ কোন নেতা নেই। নেতারা তোতাপাখীর মতো যে-সব বুলি আওড়ান কার্যকালে ঠিক তার উল্টো কাজটি করেন। সুতরাং তাঁদের কথায় কারও আস্থা নেই। আমার বিশ্বাস সামনে ভালো আদর্শ থাকলে এই ছেলেরাই অন্যরকম হ'ত।

"ইতিহাসের পাতা ওল্টালে জানা যায় অসাধুতা-অপটুতা-আত্মম্ভরিতার রাজত্ব বেশীকাল টেকে না। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা ভাবলে ভয় হয়। দুঃখও হয়। কোন্ অতলস্পর্শী গহ্বরের দিকে এগুচ্ছি আমরা!"

ছয়

সকাল নটা নাগাদ সদাশিবের মোটর যথারীতি বাজারের সামনে দাঁড়াল। সারি সারি মুরগীওয়ালারা বসেছিল তাদের ঝাঁকা নিয়ে। তারা সাধারণতঃ পথের ধারেই বসে। সদাশিবকে দেখে দু'একজন সেলাম করে' দাঁড়াল।

সদাশিব আলীকে বললেন—"আলী, কয়েকটা ভালো মুরগী বেছে নাও তো।"

"বহুত খু"—

সদাশিব বাজারের ভিতর ঢুকলেন।

আবদুলের মুখ উদ্ভাসিত, তার ছেলের জ্বর ছেড়ে গেছে। সে বললে, কিছু বড় বড় মাগুর মাছ সে তাঁর জন্যে কিনে রেখেছে। চারটে মাগুর মাছের ওজন হয়েছে সওয়া সের।

কোথা আছে সেগুলো?"

www.boiRboi.blogspot.com

"আলাদা হাঁড়িতে করে' গুদামে রেখে দিয়েছি—"

"আমার গাড়িতে দিয়ে আয়।"

ঘাড় ফিরিয়েই সদাশিবের দৃষ্টি পড়ল একটি নবাগত ভদ্রলোকের দিকে। অত্যন্ত মোটা। একটা হিপোপটেমাস যেন মনুষ্যমূর্তি ধারণ করেছে। তাঁর মাছ কেনবার ধরন দেখে বিস্মিত হলেন সদাশিব। এক মেছুনী কতকগুলো ছোট মাছ বিক্রি করছিল। তিনি মাছের স্তূপের ভিতর থেকে একটি ছোট মাছ লেজ ধরে' তুললেন।

"এটার কত দাম নিবি? এক পয়সা?"

"ওই একটা মাছই নেবেন আপনি!"

মুচকি হেসে জিগ্যেস করলে মেছুনী। নাম ছিপ্‌লী। সন্থ যৌবনোদ্গম হয়েছে তার। কথায় কথায় হাসে।

হিপো বললেন—"হাঁ। একটাই নেব—"

"নিয়ে যান। ওর আর দাম দিতে হবে না।"

অম্লানবদনে তিনি মাছটি মাছের থলিতে পুরে ফেললেন। হেসে লুটিয়ে পড়ল মেছুনীটা। হিপো আর একটা মেছুনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সে-ও ছোট মাছ বেচছিল। সেখান থেকেও একটি ছোট মাছ বেছে তুললেন তিনি।

"এটার কত দাম নিবি? এক পয়সা?"

এ মেছুনীটা বুড়ী। হিপোর কাণ্ড দেখে চটে' গেল সে। বললে— "একটা মাছ আমি বেচব না। আধ পোয়া নিতে হবে অন্ততঃ—"

"কিন্তু তোর সব মাছ তো টাটকা নয়। বাসী মাছও মিশিয়ে দিয়েছিস অনেক—"

বুড়ী চুপ করে' রইল, কোন জবাব দিল না।

"আচ্ছা, দু'পয়সা দিচ্ছি, দিয়ে দে মাছটা।"

বুড়ীর চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুন জ্বলে' উঠল। মাছটা ছুঁড়ে দিলে হিপোর দিকে। হিপো দুটো পয়সা দিয়ে গম্ভীরভাবে এগিয়ে গেলেন আর একটা মাছের দোকানে। এ দোকানদারও একটা মাছ বেচতে রাজী হ'ল না। ঝাঁকড়া-গোঁফ ভগলু মহলদার রসিক লোক। সে হাসিমুখে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত হিপোর দিকে, তারপর দু'হাত তুলে নমস্কার করল।

"দিবি না মাছটা?"

"একটা মাছ বিক্রি করি না। আপনার মতো লোককে ভিক্ষে দিতেও সাহস পাচ্ছি না। কি করব ভাবছি।"

সদাশিব এগিয়ে গিয়ে চোখের ইঙ্গিত করতেই ভগলু মাছটা দিয়ে দিলে হিপোকে। ডাক্তারবাবুকে অমান্য করবার সাহস হ'ল না তার। হিপো আর একটা দোকানে গিয়ে আর একটা ছোট মাছ চার পয়সা দিয়ে কিনলেন। এই মেছোটা মোচড় দিয়ে বেশী একটু দাম নিয়ে নিলে।

সদাশিব এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে।

"নমস্কার। আপনাকে তো এর আগে দেখেছি বলে' মনে পড়ছে না—"

"নমস্কার। আমি এখানে থাকি না। চেঞ্জে এসেছি—"

"ও! কোথায় আছেন?"

"ঘোষ-নিবাসে।"

"ও, তাহ'লে তো আমার বাড়ির কাছেই!"

"আপনার পরিচয়টা দিন—"

"আমি একজন রিটায়ার্ড ডাক্তার। এখানেই একটা বাড়ি কিনে বাস করছি—"

"ও, তাহ'লে আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে তো সুবিধেই হ'ল। আমি ডায়াবিটিস্ রুগী মশাই। তার উপর বাত। ডাক্তার বলছে ছানা খেতে আর ছোট মাছ। ভাত রুটি বন্ধ—"

"কিন্তু আপনি তো মাত্র চারটি ছোট মাছ কিনলেন—"

"বেশী নিয়ে কি করব? নিজে হাতে কুটতে হবে, নিজে হাতে রাঁধতে হবে। তাছাড়া একটু পচা বা দো-রসা হ'লে আর খেতে পারি না। তাই খুব বেছে বেছে কিনতে হয়—"

"আপনি একাই এসেছেন?"

"দোকা আর পাব কোথা! আমাকে ফেলে সবাই যমের বাড়ি চলে' গেছে। বউ ছেলে মেয়ে সব—"

হিপোর চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত তিনি নিষ্পলক হ'য়ে চেয়ে রইলেন সদাশিবের মুখের দিকে। অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলেন তিনি। তারপর সদাশিব বললেন, "আচ্ছা, আমি আপনার টাটকা মাছের ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি। এই ভগলু—"

ঝাঁকড়া-গোঁফ ভগলু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—"জি হুজুর—"

"এই বাবুর জন্যে রোজ চার-পাঁচটা টাটকা মাছ আলাদা করে' রেখে দিও।"

"চেষ্টা করব হুজুর। তবে আমি তো মাছ পাইকারদের কাছ থেকে কিনি, সব সময় টাটকা মাছ পাই না—"

সেই হাসিমুখী তরুণী মেছুনীটি এগিয়ে এল। বললে—"আমি গঙ্গার ঘাট থেকে মাছ আনি। আমি রেখে দেব রোজ—"

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নমস্কার।"

কোনক্রমে দেহভার বহন করে' ভিড় ঠেলে ঠেলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

"এই যে ডাক্তারবাবু! গুড্ মর্নিং। বাজারের সব মাছ কিনে ফেললেন নাকি! আমাদের জন্যে কিছু অবশিষ্ট আছে তো—"

পি. ডব্লিউ. ডি. আফিসের কেরানী খগেন সরখেল। হিংসুকে লোক। সদাশিব যে রোজ এত মাছমাংস কেনেন এটা বরদাস্ত করতে পারেন না। দেখা হ'লে প্রায়ই যে-সব মন্তব্য করেন তাতে একটু খোঁচা থাকে। সদাশিব গ্রাহ্য করেন না এসব। প্রায়ই মুচকি হেসে তাঁর কথার জবাব দেন।

"কি মাছ কিনলেন আজ?"

"মাগুর।"

"মাগুর? কই, মাগুর তো কোথাও দেখলাম না। পেলে নিতাম কিছু।"

"নিন না। আমি যেগুলো নিয়েছি সেগুলো আপনিই নিয়ে যান। আমি অন্য মাছ নিচ্ছি। আবদুল, বাবুকে মাগুর মাছগুলো দিয়ে দাও।"

আবদুল বললে—"আচ্ছা। তিন টাকা করে' সের। সওয়া সের আছে। আপনি কিসে করে' নেবেন?"

অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লেন খগেন সরখেল।

"না না, আপনার মুখের গ্রাস আমি কাড়ব কেন। আপনিই নিয়ে যান। আমি আর একদিন কিনব।"

তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিলেন তিনি।

সদাশিব বেরিয়ে আসছিলেন এমন সময় সেই হাসিমুখী তরুণীটি অপাঙ্গে সলজ্জভাবে চাইলে তাঁর দিকে এবং মৃদুকণ্ঠে বললে—"বাবু—"

মনে পড়ে' গেল সদাশিবের।

"হাঁ, তোর জন্যে ওষুধ এনেছি। গাড়িতে আছে। চল দিয়ে দিচ্ছি—রোজ তিনটে করে' খাবি।"

প্রতি মাসে 'মাসিক'-এর সময় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে সে। লজ্জায় অনেকদিন গোপন করে' ছিল। কিন্তু শেষে আর পারেনি। অনেকদিন চোখ নিচু করে' অনেকবার ঘাড় ফিরিয়ে ব্যক্ত করেছে সদাশিবের কাছে।

মাছের বাজার থেকে বেরোবার মুখেই আবার থমকে দাঁড়াতে হ'ল সদাশিবকে। তিনি দেখলেন, জগদম্বা জেলে চায়ের দোকান করেছে। চেহারাই বদলে গেছে তার। মাথায় টেড়ি, কানে বিড়ি গোঁজা। পরনে হাওয়াই শার্ট। চায়ের দোকানে সিনেমা অভিনেত্রীদের ছবি। একটা বড় কাচের 'জারে' রঙিন মাছ রেখেছে।

"কিরে জগদম্বা, মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিলি ?"

"ওতে পোষায় না হুজুর। তাছাড়া বড় গন্‌দা (নোংরা) কাজ। রোজগার হয় না। সব লাভ পাইকার আর গুদামওয়ালা টেনে নেয়।"

আবদুল মাছের হাঁড়ি নিয়ে সঙ্গে আসছিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলল—"জগদম্বা চিরকালই একটু শৌখিন। বেশী পয়সা থাকলে ও আতরের দোকান খুলত।"

জগদম্বা এতে চটল না। আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে চেয়ে রইল আবদুলের দিকে। জগদম্বার বয়স বেশী নয়, ত্রিশের মধ্যেই। সদাশিবের মনে পড়ল কিছুদিন আগে তার বউ বাপের বাড়ি চলে' গিয়েছিল আর ফেরেনি। সদাশিবের একবার ইচ্ছে হ'ল তার বউয়ের কথাটা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এত লোকের সামনে সেটা অশোভন হবে ভেবে আর করলেন না।

মোটরের কাছে কয়েকজন রোগী দাঁড়িয়ে ছিল। সদাশিব তাদের বললেন—"আজ বিকেলে হাটে যাব। সেইখানেই তোমরা যেও। এই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভালো করে' দেখতে পারব না তোমাদের। এই ছিপলী, তোর ওষুধ নিয়ে যা—"

সেই তরুণী মেয়েটি এসে ওষুধ নিয়ে গেল। মোটরের কাছে আরও চার-পাঁচটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে। বাজারে

www.boiRboi.blogspot.com

ঝাঁকা-মুটের কাজ করে। তাদের গায়ের জামা কাপড় ফরসা, মাথায় চুল আঁচড়ানো। ঝাঁকা-মুটেদের সাধারণতঃ এরকম হয় না। তারা হাসিমুখে সবাই সদাশিবকে সেলাম করে' ঘিরে দাঁড়াল।

"ও তোরা এসেছিস? বাঃ, কাপড় জামা তো বেশ পরিষ্কার হয়েছে! দেখ্‌ তো, সাজিমাটিতে কেমন সুন্দর পরিষ্কার হয়! দেখি তোর দাঁত?

সবাই তাদের দাঁত দেখাল। সদাশিব তাদের চোখও দেখলেন।

"ঠিক আছে—"

চারটি করে' পয়সা দিলেন প্রত্যেককে। তাছাড়া হাট থেকে যে কেঁদ্‌ আর কাগজের পাখী কিনেছিলেন তা-ও উপহার দিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শেখাবার জন্য সদাশিব এই ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করেন মাঝে মাঝে। অতি সামান্যই খরচ হয় এতে; কিন্তু এর পরিবর্তে যে আনন্দ পান তা অসামান্য।

আলী এসে মৃদুকণ্ঠে বললে—"চারঠো মুরগি লিয়া হুজুর।"

"ভালো দেখে নিয়েছ তো?"

"জী হুজুর, সব তৈয়ারী পাট্‌ঠা হ্যায়।"

মুরগিওলা রহমান বললে—"পছ্‌ছিম মু হোকে বোলতে হেঁ হুজুর, সব মুরগি আচ্ছা হ্যায়। খারাব হোনে সে জুতা মারিয়ে গা।"

সদাশিব হেসে বললেন—"যদি ঠকাও তোমার খোদাই তোমাকে জুতো মারবে। আমি কেন জুতো মারতে যাব তোমাকে শুধু শুধু—"

আলী বললে—"বেশক্‌।"

সদাশিব জিজ্ঞাসা করলেন—"মুরগির দাম কত?"

রহমান বললে সে পশ্চিমমুখে দাঁড়িয়ে 'কসম্‌' খেয়ে সত্যি কথা বলছে, সওয়া দু'টাকা করে' খরিদ, এখন হুজুরের যা মরজি।

আবদুল মাছের হাঁড়ি গাড়িতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক পাশে। সে আলীকে বললে, "ঘুরা দিজিয়ে মুরগি। দেড় দেড় রুপিয়া মে ইস্‌সে আচ্ছা মুরগি হাম লান্‌ দেঙ্গে।"

সদাশিব বললেন, "না না, গরীব মানুষের আমি লোকসান করাতে চাই না। ওই বলুক না কি হ'লে ওর পোষায়।"

রহমান মাথা চুলকে বললে—"হুজুরকা যেইসে মেহেরবানী। আপকা বাত সে বাহার হাম নেহি যাঙ্গে—"

শেষকালে এক টাকা দশ আনায় রফা হ'ল। রহমান দাম নিয়ে টাকা-পয়সাগুলি তার কোমরে-বাঁধা গেঁজেতে পুরে শেষে বললে, "মাস দুই থেকে তার ছোট ছেলের নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, ডাক্তারবাবু, যদি কোন দাবাই দেন গরীবের উপকার হয়।"

"কোথা বাড়ি তোমার ?"

"হবিগঞ্জ।"

"আমি তো হবিগঞ্জের হাটে যাই। সেইখানেই নিয়ে এস তোমার ছেলেকে। নাকটা দেখে ওষুধ দেব।"

মুরগিওলা রহমান সেলাম করে' বললে—"হুজুরকা মেহেরবানী। মুলাকাৎ করেঙ্গে হাটিয়ামে।"

সদাশিব বললেন—"আলী, চল এবার কমলবাবুর কারখানায়। কমলকে আজ খেতে বলব। আর গাড়ির কারবুরেটারটাও একবার দেখিয়ে নেব।"

"বহুত খু—"

কমলের কারখানায় ঢুকতেই কমলের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল। "পাগল করে' দেবে আমাকে। এই মুন, আমার ড্রয়ার থেকে প্যাচকস্ কে নিয়েছে ? কতবার মানা করেছি তোমাদের যে আমার ড্রয়ার থেকে প্যাচকস্ নিও না কেউ—"

সদাশিবকে দেখেই শান্ত হ'য়ে গেল কমল।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন—"প্যাচকস্ হারালে নাকি—"

"কেউ টপিয়ে দিয়েছে। আসল পাকা স্টীলের জিনিস—"

কমলরা বিহারে চার পুরুষ ধরে' আছে। বিহারেই তার জন্ম। সুতরাং ভাষার মধ্যে অনেক হিন্দী কথা ঢুকে গেছে। তাই 'হাতিয়েছে' না বলে' 'টপিয়ে দিয়েছে' বলল।

"গাড়ি ঠিক চলছে তো ?"

"মাঝে মাঝে হাঁচছে। তাই মনে হচ্ছে 'কারবুরেটারে' ময়লা জমেছে বোধ হয়। তোমার কি সময় আছে এখন ? খুলে দেখবে কি ?"

"হ্যাঁ। এখনি করে' দিচ্ছি। এই ফালতু, ডাক্তারবাবুর গাড়ির "কারবুরেটার'টা খোল্—"

ফালতুর আসল নাম তমিজুদ্দিন। কমল ওর নামকরণ করেছে

'ফালতু', কারণ যখন ও অ্যাপ্রেন্টিস্ হয়ে কারখানায় ঢুকেছিল তখন বাড়তি (extra) লোক হিসেবে নিয়েছিল ওকে কমল। ফালতুর বয়স ষোল-সতেরো। খুব রোগা আর লম্বা। যদিও সর্বাঙ্গ কালি-ঝুলি মাখা, তবু বেশ বোঝা যায় যে ওর রং খুব ফরসা। মুখের মধ্যে একটা শিশু-সুলভ সারল্য, চোখ দুটিতে চাপা হাসি চিক্‌মিক্ করছে সর্বদা। সে সোৎসাহে কারবুরেটার খুলতে লাগল। সে জানে এর জন্যে ডাক্তারবাবু কোন-না-কোন সময়ে তাকে কিছু দেবেন। মাস দুই আগে একটা হাফপ্যাণ্ট কিনে দিয়েছেন। ...মুরগিগুলো ক্যাঁক্-ক্যাক্ করে' ডেকে উঠল কেরিয়ারের মধ্যে।

কমল হেসে জিগ্যেস করল—"কত করে' কিনলেন মুরগি—"

"ওহো, বলতেই ভুলে গেছি। তুমি আজ রাত্রে খেও আমার ওখানে।"

"আচ্ছা। আমার কিন্তু আজ যেতে রাত হবে একটু। সাড়ে ন'টা—"

"বেশ—"

"বসুন—"

চেয়ার এগিয়ে দিলে কমল।

"কাজকর্ম কেমন চলছে—"

"ভালোই চলছে আপনার আশীর্বাদে—"

"হরেক রকমের গাড়ী তো অনেক জমিয়েছ দেখছি—"

"হ্যাঁ, তা জমেছে। কতকগুলো গাড়ী জমেই আছে। আর নড়ছে না—"

"কেন বল তো—"

কমল মুচকি হেসে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তত্ত্বকথা বলে' ফেলল।

"গাড়ীর পেছনে যে মানুষ আছে তারই উপর নির্ভর করে সেটা। তারা গাড়ী না নিয়ে গেলে গাড়ী যাবে কি করে'!"

"নিচ্ছে না কেন—"

"ওই যে বড় বুইক্‌টা দেখছেন, ওই যে কোণে রয়েছে, মাডগার্ডটা টোল খাওয়া। ওর মালিকটি মাতাল চরিত্রহীন। তিনবার দেউলিয়া হয়েছে। গাড়ী চালিয়ে দুমকা থেকে আসছিল, একটা সাঁওতালকে ধাক্কা মেরে পালাচ্ছিল সেখান থেকে। পালাতে পালাতে আবার ধাক্কা খায় একটা গাছের সঙ্গে। তারপর রাত্তিরে আমার কাছে গাড়িটি রেখে সেই যে সরেছে আর পাত্তা নেই। কেউ বলছে বম্বে গেছে, কেউ বলছে দিল্লী। ওই যে ছোট্ট বেবি অস্টিনটা

দেখছেন ওটা মিস্ মরিসের। নিজেই ড্রাইভ করে আর সঙ্গে থাকে রোজ একজন করে' নূতন বন্ধু। একদিন রাত্রে মদ খেয়ে এক মাঠে পড়ে' ছিল সমস্ত রাত। সকালে উঠে দেখে গাড়ীর চাকাসুদ্ধ জুটো। টায়ার চুরি হ'য়ে গেছে। গাড়ীটা গরুর গাড়ীতে চড়িয়ে আমার এখানে দিয়ে গেছে মাস তিনেক আগে। আর তার পাত্তা নেই, শুনছি বেবি অষ্টিনের চাকা এখন এখানে পাওয়া যাবে না। বিলেত থেকে আনাতে হবে। ততদিন ও গাড়ি এখানেই পড়ে' থাকবে—"

"আর ওই যে রং-ওঠা ঝরঝরে গাড়ীটা রয়েছে, ওটা কে সারতে দিয়েছে ? ওর তো কিছুই নেই দেখছি—"

"ওটার ইনজিন ঠিক আছে। আমি আড়াইশ' টাকায় কিনেছি। ভালো ক'রে সারিয়ে রং ক'রে আড়াই হাজার টাকায় বিক্রি করব। তখন ওর চেহারা দেখলে চিনতেই পারবেন না। বেশভূষার চটকে বুড়ো মানুষকে ছোকরা বানিয়ে দেব—"

মুচকি হেসে চেয়ে রইল কমল। সে হা-হা করে' হাসে না। মুচকি হাসে কিন্তু বেশ বড় 'মুচকি', হাসিটা প্রায় কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ ছুটোও হাসতে থাকে।

ফালতু কারবুরেটার খুলে নিয়ে এল।

কমল কারবুরেটার নিয়ে পড়ল।

কারখানাতেও সদাশিবের রোগী জুটে গেল কয়েকটা। ইদ্রিস্ মিস্ত্রীর পায়ের নীচে একটা কড়া হয়েছে, বসতে গেলে লাগে। একটা অ্যাপ্রেন্টিস্ ছোঁড়ার হাঁপানি হচ্ছে। ফালতুর কসের দাঁতে ব্যথা হয়। সদাশিব হাঁ করিয়ে দেখলেন, কেরিজ হয়েছে। বুড়ো জগন মিস্ত্রীর বাত হয়েছে। হাঁটতে ব্যথা। সদাশিব ওষুধের বাক্স বার করে' ওষুধ দিতে লাগলেন সকলকে।

...চতুর্দিক প্রকম্পিত করে' একটা মোটর বাইক ঢুকল এসে। তার থেকে নামলেন একজন 'খাকি' হাফপ্যাণ্ট-পরা বেঁটে মোটা লোক। বুলডগের মতো মুখ, হিট্‌লারি গোঁফ। মুখে সিগার। মিস্টার পরসাদ। বড় গভর্নমেণ্ট অফিসার একজন। নিরঙ্কুশ ব্যক্তি। প্রকাশ্যে ঘুষ নেন, প্রকাশ্যে অন্যায় কাজ করেন। এঁকে দেখে শশব্যস্ত হ'য়ে পড়ল কমল।

বলল—"কল্ আপকা গাড়ি দে দেংগে। থোড়া কাম্ বাকী হ্যায়—"

আদেশের কণ্ঠে মিস্টার পরসাদ বললেন—"জল্‌দি কিজিয়ে। বড়া মুশ্‌কিল মে হ্যাঁয়—"

"কল্‌ জরুর হো যায়গা—"

এমন সময় মিস্টার পরসাদের দৃষ্টি পড়ল ডাক্তারবাবুর উপর।

"নমস্তে নমস্তে। ডাক্‌টর সাহেব, আপ য়ঁহা কৈসে পৌঁছ গয়ে—"

সদাশিব বাংলাতেই উত্তর দিলেন—"রিটায়ার করে' এইখানেই আছি। আপনি কবে এলেন এখানে ?"

"এক মাহিনা—"

ওঁদের নিম্নলিখিতরূপ আলাপ হ'ল। মিস্টার পরসাদের হিন্দীটা বাংলায় অনুবাদ করে' দিচ্ছি।

"আপনি এখানেই প্রাক্‌টিস্‌ করছেন ?"

"কি আর করি, কিছু তো একটা করতে হবে—"

"আপনার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না। ভাগ্যে আপনি ছিলেন তাই বেঁচে গিয়েছিলাম—"

"কি হয়েছিল আপনার বলুন তো, ঠিক মনে নেই—"

"স্ট্র্যাংগুলেটেড্‌ হার্নিয়া। আপনি তখন ছাপরায়, আমিও ছাপরায়। আপনি না থাকলে আমি খতম হ'য়ে যেতাম। আপনি চলে' আসবার পর ডক্‌টর ঘোষ এলেন। তিনি চৌবেজির হাইড্রোসিল অপারেশন করলেন। সেপ্‌টিক হ'য়ে মারা গেলেন ভদ্রলোক—"

"দেখুন বাঁচাবার বা মারবার মালিক আমরা নই। আমরা সকলকেই ভালো করবার চেষ্টা করি, কেউ হয়, কেউ হয় না। ওপরওলার মর্জিতে সব হয়—"

"সে কথা আমি মানব না। সব ডাক্তারের বিদ্যেও সমান নয়, সবাই সমান যত্নও নেয় না। আপনি এখানে আছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। কোথায় বাসা আপনার ?"

"কমল আমার বাড়ি চেনে—"

"আচ্ছা, এখন চলি। এই রোদে মোটর বাইকে করে' ঘুরতে হচ্ছে। চলি, নমস্কার—"

চলে' গেলেন মিস্টার পরসাদ।

উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এল কমল।

"আপনার সঙ্গে খুব খাতির আছে দেখছি। আমার একটু উপকার করবেন?"

"কি বল—"

"গভর্নমেন্টের কাছে আমার পনরো হাজার টাকার বিল বাকি আছে। দু'বছর হ'য়ে গেল, কিছুতেই আদায় করতে পারছি না। চিঠি লিখে লিখে হয়রান হ'য়ে গেছি, উত্তর পাই না। আপিসে গিয়ে তদ্বির করলুম, দু'-একটা ক্লার্ককে ঘুষও দিলুম, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। কানাঘুষো শুনছি ওপরওলাকেও নাকি কিছু সেলামী দিতে হবে। মিস্টার পরসাদের খুব ইনফ্লুয়েন্স, উনি যদি চেষ্টা করেন এখনই পেয়ে যাব টাকাটা। এর আগে ওঁর গাড়ি একবার সারিয়ে দিয়েছি, একটি পয়সা চার্জ করিনি। এবারও করব না। এইবার ওঁকে বলব ভেবেছিলাম কথাটা। আপনি যদি বলে' দেন তাহ'লে আরও ভালো হয়—"

"আচ্ছা বলব—"

কমল যত্ন করে' কারবুরেটারটা পরিষ্কার করে' ফিট করে' দিলে।

"আজ রাত্রে যেও মনে করে'—"

"যাব—"

সদাশিব নিজের হাতঘড়িটা দেখলেন। দেড়টা বেজে গেছে। বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন তিনি।

সাত

সদাশিব ডাক্তারের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল একটা প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে, প্রকাণ্ড একটা গাছের ছায়ায়। এখান থেকে মাইল-খানেক দূরে হাজিপুর হাট। বেলা দুটো বেজেছে। হাট তিনটের আগে বসে না। সদাশিব নির্জনে একটু বিশ্রাম করে' নিচ্ছেন। নির্জন প্রকৃতির কোলে মাঝে মাঝে একা বসে' থাকতে ভালবাসেন তিনি।

আলীকে পাঠিয়েছেন গ্রামের ভিতর একটু টাটকা দুধ সংগ্রহ করবার জন্য। সঙ্গে কনডেন্সড্ মিল্ক্ ছিল, তবু পাঠিয়েছেন। আসল উদ্দেশ্য আলীকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। কাছে কোন লোক থাকলে তাঁর চিন্তা বিঘ্নিত হয়। স্রোতে লোকে যেমন নৌকো ছেড়ে দেয়, তাঁর মনকেও

তেমনি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নানা জায়গায় ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে সে। সামনে কয়েকটা খঞ্জন ল্যাজ তুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা নীলকণ্ঠ ছোট্ট একটা গাছের ডালে বসে' 'টক্' 'টক্' শব্দ করছে মাঝে মাঝে। একটু দূরে গরু ভেড়া ছাগল চরছে। একটা গরুর পিঠে ফিঙে পাখী বসে' আছে। লঘু সাদা মেঘ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। এলোমেলো হাওয়া বইছে। দোয়েল পাখীর তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। সদাশিব উঠে নিজের ডায়েরীটা বার করে' আনলেন। তারপর ফোলডিং টেবিল চেয়ারটাও বার করে' পাতলেন। একটু ভেবে লিখতে শুরু করলেন তিনি।

"দেখতে দেখতে এখানে অনেকদিন কেটে গেল। দিন কত শীঘ্র কেটে যায়। মনে হচ্ছে এই সেদিন এসেছি। সকালের পর সন্ধ্যা, তারপর আবার সকাল। কালের প্রবাহ ব'য়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল।

"প্রথমে যখন এখানে জীবন আরম্ভ করেছিলাম তখন আশঙ্কা হয়েছিল সময় কাটবে কি না, মনের অবলম্বন পাব কি না, মনের মধ্যে যে স্নেহের কাঙাল ক্ষুধিত হ'য়ে বসে' আছে সে তার আকাঙ্ক্ষিত সুধা পাবে কি না। আজ নিঃসংশয়ে বলতে পারি আমার সে আশঙ্কা অপনোদিত হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার অবসর নেই। মনের যে অবলম্বন পেয়েছি তার চেয়ে বড় অবলম্বন আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি প্রচলিত-অর্থে 'ধার্মিক' হইনি, রাজনীতি বা সমাজনীতি আলোচনার ছুতোয় পরনিন্দা করিনি, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট কুড়িয়ে 'নেতা' হইনি, আমি যা ছিলাম তাই আছি, যে পথে এতদিন চলে' এসেছি সেই পথই ধরে' আছি। তার থেকে বিচ্যুত হইনি। বরাবর ডাক্তারি করেছি; এখনও তাই করছি। অন্য কিছু হবার শখ হয়নি আমার। সাধ্যও নেই। এক হিসাবে গীতার নির্দেশই পালন করেছি, 'স্বধর্ম'কেই আঁকড়ে আছি। স্নেহের কাঙাল আমার মনও পরিতৃপ্ত হয়েছে। যে অপরিমেয় সুধা সে পেয়েছে তা তার কল্পনার অতীত ছিল। আমি মহাপুরুষ নই, অত্যন্ত সাধারণ লোক আমি। আমি কি করে' লোকের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ আর্কষণ করতে পেরেছি? ভাবলেও অবাক লাগে।

"অনেকে হয়তো মনে করবেন আমি অসুখে বিসুখে ওদের চিকিৎসা

করি বলেই ওরা আমাকে ভালবাসে। বাইরে থেকে বিচার করলে তাই মনে হয়, কিন্তু আসল কারণ বোধ হয় তা নয়। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়, জমিদারবাবু নওলকিশোর প্রতি রবিবারে ভিখারীদের চাল দেন, বেঙ্কট শর্মার ঠাকুরবাড়িতে প্রত্যহ তৃষিতদের জল আর ছোলা-গুড় দেওয়া হয়। জনসাধারণ কি এদের ভালবাসে? কেউ কেউ হয়তো শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ভালবাসে না। ঘনিষ্ঠ না হ'লে ভালবাসা যায় না। আমরা পোষা কুকুর বিড়ালকে যত ভালবাসি, দূরবর্তী মহৎ লোককেও ততটা বাসি না। আমি ওদের উপকার করেছি বলেই যে ওরা আমাকে ভালবাসে তা নয়, আমি ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি বলেই ভালবাসে। আমার যারা রক্তসম্পর্কিত, সমাজের খাতায় যারা আমার আত্মীয় বলে' চিহ্নিত, তাদের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক নেই, কারণ তারা দূরে থাকে, ক্বচিৎ তাদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা পর হ'য়ে গেছে। আবদুল, আলী, ভগলু, কেব্‌লী, ফালতু, রহমান, কমল, জগদম্বা, সুখিয়া, বিলাতী সাহ এবং আরও অনেক নগণ্য লোক আজ আত্মীয় হয়েছে আমার। সুখদুঃখের সঙ্গে আমি জড়িত, তাই আমাকে ওরা আপন লোক মনে করে। আমি পরম সুখে আছি।

"কেবল একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়েছি একটু। মালতীর হিস্টিরিয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে ফিট্ হচ্ছে। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি কাঁদছে। কেন কাঁদছে তা বললে না। আমাকে দেখে চোখ মুছে অন্য ঘরে চলে' গেল। আজবলাল বলছিল প্রায় নাকি অকারণে কাঁদে। অকারণে চটেও যায়। আজবলাল ওর নাম দিয়েছে পাগলী। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি কি হয়েছে। বাঁজা মেয়েদের এরকম হয়। সন্তান-পালনের অন্তর্নিহিত কামনা স্বাভাবিক পথে চরিতার্থ না হ'লে নানা অস্বাভাবিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ওকে একটা কাবুলী বিড়াল, একটা টিয়াপাখী, একজোড়া খরগোশ কিনে দিয়েছি। কিন্তু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? ওর যদি একটা ছেলে হ'ত!"

এই পর্যন্ত লিখেই লেখা বন্ধ করতে হ'ল সদাশিবকে। কারণ তিনি দেখতে পেলেন আলী একটা বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে আনছে। আর তার পিছনে আসছে একটা গাই আর তার পিছনে হলদে-শাড়ি-পরা একটা মেয়ে। কাছে আসতেই গীতাকে চিনতে পারলেন তিনি। গোয়ালার মেয়ে।

বাপ-মা নাম রেখেছিল গিতিয়া। কিন্তু কাছেই যে মিশনারী স্কুলটা আছে তাতে গিতিয়া পড়েছিল ছেলেবেলায়। সেই স্কুলের মেমসাহেব তার নাম গিতিয়া বদলে গীতা ক'রে দিয়েছেন। গীতা স্কুলে আর পড়ে না। অনেকদিন হ'ল বিয়ে হ'য়ে গেছে তার। যখন তার দশ বছর বয়স তখনই। সম্প্রতি দ্বিরাগমন হয়েছে। চমৎকার বাংলা নাম বলতে পারে গীতা।

"গীতা, কবে শ্বশুরবাড়ি থেকে এলি ?"

"পরশু—"

"আমার জন্যে সামান্য দুধ দিলেই তো হ'ত। একটু চায়ের জন্যে দরকার খালি। তুই একেবারে গাই নিয়ে হাজির হলি কেন ?

'আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে—"

চমৎকার চকচকে একটি কাঁসার ঘটিও এনেছিল সে। তাইতে নিজেই দুধ দুয়ে আলীর হাতে দিতেই আলী হাতের তর্জনী উত্তোলন করে' বললে—"ঠহর যাও এক মিনিট—" কেরিয়ার থেকে বার করলে সে অ্যালুমিনিয়মের একটা মুখ-ঢাকা হাঁড়ি। তাইতেই দুধটা ঢেলে নিয়ে সদাশিবের দিকে একটু ঝুঁকে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—"চায় কা পানি চঢ়া দেঁ হুজুর ?"

"দাও। গীতা চা খাবি ?"

গীতা লজ্জিত হ'ল।

"আলী, গাড়িতে বেশী গ্লাস আছে ?"

"জী হুজুর, হ্যায়। মগর থোড়া সা চন্‌কা হুয়া—"

আলী তর্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের একটি ছোট মুদ্রা করে' জানিয়ে দিলে গ্লাসটা সামান্য ফাটা।

"ওতেই গীতাকে চা দাও। তুমি এক কাপ চা বানাও নিজের জন্যে।"

"বহুত খু—"

মাঠের মধ্যে স্টোভ জ্বালা সহজসাধ্য নয়। এলোমেলো হাওয়ার জন্যে সহজে ধরতে চায় না। কিন্তু সদাশিবের মোটরে সব ব্যবস্থা আছে। বড় বড় টিনের পাত দিয়ে ছোট্ট একটা টিনের ঘর মতো করে নিলে আলী। তার ভিতর স্টোভটা ঢুকিয়ে জ্বালতে লাগল।

গীতা সদাশিবের কাছে সরে' এসে মৃদুকণ্ঠে তার দুঃখের কাহিনী বলতে লাগল। গীতা শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। তার স্বামী দুশ্চরিত্র, মাতাল। শাশুড়ী দজ্জাল। তিনটি ননদ আছে, তিনটিই হাড়-জ্বালানী।

কেউ শ্বশুরঘর করে না। সব মায়ের কাছে আছে। শুধু তারা নয়, তাদের স্বামীরা এবং ছেলেপিলেরাও। গীতাকেই সকলের সেবা করতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই মার-ধোর করে। একদিন এমন ইট ছুঁড়েছিল যে মাথা কেটে গিয়েছিল তার। তাছাড়া তাকে তার স্বামীর মালিকের বাড়িতেও কাজ করতে হয়।

"তোর স্বামী কি করে ?"

"একজন বাভনের জমি চষে। এক পয়সা মাইনে পায় না। কবে নাকি দু'শো টাকা ধার নিয়েছিল তারই সুদের সুদ জমেছে। খেটে শোধ করতে হবে।"

"তোদের চলে কি করে' ?"

"ওই জমি থেকে যা ফসল হয় তাই দেয় আমাদের খাবার মতো। তার দামও হিসেব করে' ধারে জমা করে। ও ধার জীবনে কখনও শোধ হবে না—"

এই একই কাহিনী সদাশিব অনেকের মুখ থেকে শুনেছেন। বার বার অনুভব করছেন যে দাসত্ব-প্রথা এখনও লোপ পায়নি। কেবল তার বাইরের রূপটা বদলেছে মাত্র। দাস-দাসী বিক্রয়ের আলাদা হাট-বাজার নেই আজকাল। সমাজের বুকের উপরই ঘরে ঘরে সে হাট বসেছে। ধূর্ত ধনীর কাছে অসহায় দুর্বলরা স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় করছে। না করে' উপায় নেই তাদের।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন—"আমি কি করতে পারি—"

গীতা বললে—"দু'-একদিন পরে আমার স্বামী আমাকে নিতে আসবে। আমি যদি যেতে না চাই আমাকে সেই বাভন লোকজন পাঠিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। এখন ছোলা উঠেছে, আমাকে দিয়ে সেই ছোলা মণ মণ পেষাবে আর ছাতু করাবে। আমি তা পারব না। আমার স্বামী এলেই আমি আপনার কাছে পালিয়ে যাব। আপনি বলবেন আমি ওকে চাকরানী রেখেছি, ওকে যেতে দেব না।"

একটু ইতস্ততঃ করে' সদাশিব বললেন, "সেটা কি ঠিক হবে ? কারও স্ত্রীকে কি তার স্বামীর কাছ থেকে কেউ জোর করে' সরিয়ে আনতে পারে ? সেটা বে-আইনী হবে। তুমি যদি তোমার স্বামীর কাছে না থাকতে চাও, তাহ'লে আদালতের সাহায্যে বিয়ে ভেঙে দিতে হবে। সে অনেক ঝঞ্ঝাট। তার চেয়ে এক কাজ কর, তোমার স্বামীকেও এই শহরে এনে কোন রোজগারের কাজে লাগিয়ে দাও, তুমিও কাজ কর।"

"কিন্তু সেই বাভন তার টাকা ছাড়বে কেন? নালিশ করবে—"

"তার টাকা শোধ করে' দাও। সে নালিশ করুক, আদালতের বিচারে তার যে টাকা পাওনা হবে তা আমরা দিয়ে দেব।"

"কিন্তু কি করে' দেব অত টাকা? আপনি তো জানেন আমরা কত গরীব। বাবা অন্ধ, মা শুষছে, ভাইটা তাড়িখোর, সপ্তাহের মধ্যে তিনদিন কাজ করে না। আমরা কি করে' অত টাকা শোধ করব?"

"আচ্ছা সে একটা ব্যবস্থা হবে'খন।"

"হবে?"

উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল গীতা সদাশিবের মুখের দিকে। সে জানে সদাশিব যদি ভরসা দেন তাহ'লে হবেই একটা কিছু।

"হবে, তোর স্বামী এলে নিয়ে আসিস তাকে আমার কাছে—"

গীতা হঠাৎ হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলে সদাশিবকে। তারপর মোটরের পিছনে বসে' চা খেয়ে গরু নিয়ে চলে' গেল। মনের ভার হাল্‌কা হ'য়ে গেল তার।

হাজিপুর হাটের কাছে সেই গাছের ছায়ায় বসে' সদাশিব যথারীতি রোগী দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ভিড়ের মধ্যে কেব্‌লী দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি শঙ্কিত।

"কি হ'ল কেব্‌লী? নারাণ ছাড়া পেয়েছে?"

"না বাবু। তাকে জেলে আটকে রেখেছে। আমি কাল দেখতে গিয়েছিলাম, অমন জোয়ান মরদ, মেয়েমানুষের মতো হাউ হাউ করে' কাঁদছে। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন ডাক্তারবাবু। আপনিই তো আমাদের মা-বাপ!"

কেব্‌লীর ছেকা-ছেনি হিন্দীতে উক্ত উক্তিটি শুনে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন সদাশিব।

"আচ্ছা তুই যা, দেখি কি করতে পারি।"

কেব্‌লী ময়লা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে চলে' গেল। সদাশিব রোগী দেখতে লাগলেন। ভিড়ের পিছনদিকে একটা কলরব উঠল। সদাশিব দেখলেন শুকুর কশাই তার ছেলে সিদ্দিককে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

"আদাব। বংগট্ট কো পকড়কে ল্যায়ে হ্যাঁয়, ডাক্‌টার সাব।"

বংগট্ট মানে পাজি।

সদাশিব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন এবং সিদ্দিকের গালে ঠাস্ ঠাস্ করে' দুটো চড় মারলেন জোরে।

শুকুর চীৎকার করে' উঠল—"আউর মারিয়ে, আউর মারিয়ে—"

সদাশিব কিন্তু আর মারলেন না, চেয়ারে এসে বসলেন। তারপর বললেন—"উস্‌কো বৈঠাকে রাখ্‌খো, সুই দেঙ্গে—"

সিদ্দিকের বয়স সতেরো-আঠারো বছর। গনোরিয়া হয়েছে। শুকুর তাকে সদাশিবের কাছে নিয়ে আসতে চেয়েছিল কিন্তু সিদ্দিক রাজী হয়নি। সে বলেছিল উনি তো 'ভিক্-মাংগা'-দের (ভিখারীদের) ডাক্তার। উনি আবার চিকিৎসার জানেন কি ? শুকুরের কিন্তু সদাশিবের উপর অগাধ বিশ্বাস। তার সিফিলিস সদাশিবই সারিয়েছেন। শুকুর এসে সদাশিবকে জানিয়েছিল তার কুপুত্র সিদ্দিক সদাশিবের সম্বন্ধে কি অভদ্র উক্তি করেছে। সদাশিব প্রথমে কোন উত্তরই দেননি। কিন্তু শুকুর না-ছোড়।

"অব্ কুছ্ রাস্তা বাত্‌লাইয়ে হুজুর। ক্যা কিয়া যায় ?"

"ওকে এখানে ধরে' নিয়ে এস। আমি ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি।"

দুটি প্রচণ্ড চড় খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছিল সিদ্দিক। সদাশিব যখন তাকে ইন্‌জেক্‌শন দিলেন তখন আর আপত্তি করল না সে। সদাশিব বললেন—"এ ইন্‌জেক্‌শন রোজ নিতে হবে। দশ দিন। আর এ ওষুধ খাও। রোজ তিনটে করে' ট্যাবলেট—"

শুকুর বললে—"কাল বাজারেই কি ইন্‌জেক্‌শন দেবেন ?"

"তা দিতে পারি। ভোর ৭টার আগে যদি আমার বাড়িতে আসে তাহ'লে বাড়িতেও দিতে পারি।"

শুকুর আদাব করে' সিদ্দিককে নিয়ে চলে' গেল।

সদাশিব অন্যান্য রোগীদের ব্যবস্থা করে' দিয়ে হাটে ঢুকলেন। কিছু কিনলেন। সেই কুমড়ো-উলী বুড়ী বসে ছিল। তার পাশে বসে ছিল তার নাতনী রৌশন।. বিয়ে হ'য়ে তার চেহারাই বদলে গেছে। সে উঠে এসে সদাশিবকে প্রণাম করল। সদাশিব তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন একটু। তারপর এগিয়ে গেলেন বিলাতী সাহের দোকানের দিকে।

"দু' মণ কাতারনী চাল আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। খুব ভালো চাল—"

"দাম কত—"

"আমি বিয়াল্লিশ টাকা মণ খরিদ করেছি। এখন আপনি যা দেন—"

এবড়োখেবড়ো হলদে দাঁত বার করে' হাসলে বিলাতী সাহ।

"বেশী ভণিতা কোরো না। কত দেবো বল—"

"এক টাকা মণে লাভ দিন।"

"আমার গাড়ির কাছে চল, চেক্ দিয়ে দিচ্ছি।"

"চেক্ ভাঙানো বড় হাঙ্গামা ডাক্তারবাবু। আমি পরে গিয়ে আপনার বাড়ি থেকে দাম নিয়ে আসব।"

"বেশ।"

গাড়ির কাছে এসে দেখলেন একটা জেলে একটা রুই মাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমার ছেলে ভালো হ'য়ে গেছে বাবু। আপনাকে তো কিছু দিতে পারিনি, তাই এই মাছটা—"

"ভালো হ'য়ে গেছে? বাঃ! আমাকে কিছু দিতে হবে না। এই মাছটা বেচে তোর ছেলেকে একটা তাগদের ওষুধ খাওয়া। আমি লিখে দিচ্ছি—"

একটা কাগজে ওষুধের নাম লিখে দিলেন তিনি। জেলেটা তবু কুণ্ঠিত মনে দাঁড়িয়ে রইল।

"কি রে, দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন—"

"এ মাছটা আপনি নিয়ে যান। আপনার নাম করে' এনেছি। এ আমি বেচব না। আমার ছেলেকে তাগদের দাবাই আমি কিনে দেব—"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন সদাশিব।

"এই নবাবী আর লৌকিকতা করেই উচ্ছন্নে গেছ তোমরা। দাও, তোমাকে আর ওষুধ কিনতে হবে না। আমিই এনে দেব।"

তার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে মোটরে উঠে পড়লেন সদাশিব। আলী গোপনে মাছটি 'কেরিয়ারে' রেখে দিলে। জেলেটা সদাশিবকে কি বলতে যাচ্ছিল। আলী ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইশারায় জানিয়ে দিলে—একটি কথা বোলো না এখন।

হাজিপুরের হাট থেকে সদাশিব সোজা চলে' গেলেন ডি. আই. জি. অব পুলিসের বাড়িতে। যিনি এখন এই পদে অধিষ্ঠিত তাঁর সঙ্গে সদাশিবের আলাপ ছিল চাকরিজীবনে। তখন তিনি এস. পি. ছিলেন। সদাশিব এখন

পারতপক্ষে অফিসারদের এড়িয়ে চলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল ইনি তাঁকে চিনতে পারবেন কি না। প্রায় দশ বছর পরে দেখা হচ্ছে। যদি চিনতে না পারেন, যদি তাঁর কথা না রাখেন, তাহ'লে বড়ই মর্মান্তিক ব্যাপার হবে। তবু গেলেন তিনি। কেবলীর অশ্রুপ্লাবিত মুখটা বড়ই পীড়া দিচ্ছিল তাঁকে।...

ডি. আই. জি. প্রথমে তাঁকে সত্যিই চিনতে পারেননি। কিন্তু পরিচয় দিতেই চিনতে পারলেন এবং সাদর অভ্যর্থনা করে' বসালেন।

"বসুন, বসুন। আপনার চেহারাটা একটু বদলে গেছে। তাই চিনতে দেরি হ'ল! রিটায়ার করে' এখানে প্র্যাক্‌টিস্ করছেন?"

"হ্যাঁ—"

"কই আপনার কথা শুনিনি তো—"

"আমি যাদের মধ্যে প্র্যাক্‌টিস্ করি তারা আপনার কাছে আসতে পারে না। ইতর লোকেদের ডাক্তার আমি—"

"ওরাই তো এখন দেশের মালিক সার। ওদের এখন আর অবজ্ঞা করবার জো নেই।"

"কিন্তু তবু ওদের সম্বন্ধে এখনও আপনারা সুবিচার করছেন না। ওদেরই একজনের জন্য আজ আপনার কাছে দরবার করতে এসেছি।"

"কি ব্যাপার!"

সদাশিব খুলে বললেন সব।

"ও, এই! আচ্ছা, আজই ছাড়া পেয়ে যাবে। আমি এখনই ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি।"

ফোন তুলে তিনি এস. পি-কে বললেন ব্যাপারটা। এস. পি. কি বলছিলেন তা শুনতে পেলেন না সদাশিব। ডি. আই. জি. বললেন, "যেমন করে' হোক ওকে ছেড়ে দিতে হবে। ছবিলালবাবুর চক্রান্তে নির্দোষ বেচারা কষ্ট পাচ্ছে। ওকে আজই ছেড়ে দিন। আচ্ছা, আচ্ছা—"

ডি. আই. জি. সদাশিবের দিকে চেয়ে বললেন—"আজই ছাড়া পাবে। আজ না পায়, কাল পাবেই। বয়—"

লিভেরি-পরা 'বয়' দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন—"হুইস্কি-সোডা।"

তারপর সদাশিবের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

"আপনার চলবে কি?"

www.boiRboi.blogspot.com

"না, আমি ও-রসে বঞ্চিত।"

ডি. আই. জি. আর একবার হাসলেন।

"আপনার খদ্দর দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল। যদিও আজকাল অনেক খদ্দরধারীরাও এ-রসের রসিক হয়েছেন—"

"তা জানি। খদ্দর আজকাল অনেক পাজি লোকদের ইউনিফর্ম হয়েছে।"

"তবে পরেন কেন?"

"ওর পিছনে একটা বড় আদর্শ আছে বলে'। পাজিরা ভাত খায়, জুতো পরে বলে' তো আর ভাত খাওয়া, জুতো পরা ছাড়তে পারি না—"

হা হা করে' হেসে উঠলেন ডি. আই. জি.।

"ওয়েল সেড্। আসবেন মাঝে মাঝে। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

সদাশিব বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ফিরে এলেন আবার।

"একটা যদি প্রস্তাব করি, রাগ করবেন?"

"কি বলুন—"

"একটু আগেই আমার এক জেলে রুগী বড় একটা রুই মাছ উপহার দিয়েছে। মাছটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আমি বিপত্নীক। বাড়িতে খাবার লোক বেশী নেই। ঠাকুরটা অসুখে পড়েছে। এই অসময়ে যদি মাছ নিয়ে যাই আমার ভাইপো-বউ মালতী চ'টে যাবে। মাছটা যদি আপনাকে দিয়ে যাই, কেমন হয়?"

"এককালে ঘুষ নিতাম, এখন আর নিই না। তবে এতে যদি আপনার সমস্যার সমাধান হয় দিয়ে যেতে পারেন।"

আবার উচ্চকণ্ঠে হাসলেন তিনি।

তাঁকে মাছটা দিয়ে চলে' গেলেন সদাশিব।

আট

সেদিন বাজারে ঢুকেই সদাশিব দেখলেন বাঁড়ুয্যে মশাই একগাদা ছোট মাছের সামনে বসে' সেই গাদার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কুঁচো-চিংড়ি বাছছেন। বাঁড়ুয্যে মশায়ের বয়স কত তা বলা শক্ত। জরাজীর্ণ চেহারা। মাথায় চুল প্রায় নেই, যে ক'গাছি আছে তা পাকা। ঝোলা গোঁফ, তাও পাকা। রোগা

সরু মুখ। চক্ষু কোটরাগত, দৃষ্টি নিষ্প্রভ। ডান দিকের পাকা ভুরুর মাঝখানে একটা কালো আঁচিল তাঁর জরালাঞ্ছিত মুখের মধ্যে নির্জর হ'য়ে আছে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। নিকেলের, একধারে সুতো দিয়ে বাঁধা। বাঁড়ুয্যে মশাই কারো দিকে তাকান না, তন্ময় হ'য়ে মাছ ঘাঁটেন। চারদিকে জল, কাদা প্যাচপ্যাচ করছে, লোকের ভিড় গিজ্‌গিজ্‌ করছে, কিন্তু সেদিকে বাঁড়ুয্যে মশায়ের লক্ষ্য নেই। তিনি ওই জলকাদার উপর উবু হ'য়ে বসে' বহু লোকের পায়ের এবং হাঁটুর গুঁতো সহ্য করে' কুঁচো-চিংড়ি সংগ্রহ করছেন। আধ-পোয়ার বেশী কিনবেন না, কিন্তু মাছ ঘাঁটবেন অনেকক্ষণ ধরে'। ওতেই আনন্দ।

"নমস্কার বাঁড়ুয্যে মশাই। কি মাছ কিনছেন—"

বাঁড়ুয্যে মশাই ঘাড় তুললেন না। স্বর শুনেই সদাশিবকে চিনতে পারলেন।

"কে, ডাক্তারবাবু, নমস্কার। কুঁচো-চিংড়ি কিনছি। বেগুনও কিনেছি কিছু। নাতনী বলেছে বেগুন দিয়ে কুঁচো-চিংড়ি রেঁধে দেবে। বেশ রাঁধে।"

"কত করে' দর—"

"এক টাকা। এই পোকার মতো মাছ বলে কিনা এক টাকা! বাজারে কোন জিনিসে হাত দেবার জো আছে! সব আগুন!"

ঘাড় না তুলেই কথাগুলি বলে' গেলেন।

বাঁড়ুয্যে মশাই রোজ বাজারে আসেন। রোজ ওই ছোট ছোট মাছের স্তূপের ভিতর হাত চালিয়ে চালিয়ে নিজের পছন্দমত মাছ বার করেন। কোনদিন কুঁচো-চিংড়ি, কোনদিন মৌরলা, কোনদিন খয়রা, কোনদিন ছোট পুঁটি। আধপোর বেশী কেনেন না কোনদিন। কোন্ মাছের সঙ্গে কোন্ মসলা দিলে মুখরোচক তরকারি হয় তা তাঁর নখদর্পণে। এঁকে দেখলেই সদাশিবের মনে হয় নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের প্রতীক ইনি। খাদ্য-রসিক, কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত। আত্মসম্মানবোধ খুব প্রবল। কারো কাছে মাথা নত করতে চান না, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার তাড়নায় মাঝে মাঝে করতে হয় বলে' মরমে মরে' থাকেন।

জেলেরা ওঁকে খুব খাতির করে। উনি এখানকার স্কুলে অনেকদিন শিক্ষকতা করে' এখন রিটায়ার করেছেন। একমাত্র পুত্রটি অকালে মারা গেছে। তারই মেয়ে ওঁর দেখাশুনা করে। পুত্রবধূও নেই।

"আপনার নাতনীর রান্নার সুখ্যাতি আমিও শুনেছি। একদিন গিয়ে তার হাতের বেগুন-চিংড়ি খেয়ে আসব—"

"যাবেন, যাবেন। সে তো আমার পরম সৌভাগ্য—"

সদাশিব মাংসের দোকানের দিকে গেলেন। আগের দিন রহমন কশাই খবর দিয়ে গিয়েছিল যে সে ভালো ভেড়া কাটবে একটা। ভেড়ার মাংস এ অঞ্চলে দুর্লভ। ছাগলই বেশী পছন্দ করে এদেশের লোক। কশাইরা সবাই জানে ডাক্তারবাবু ভেড়ার মাংস ভালোবাসেন, তাই ভেড়া কাটলেই খবর দিয়ে আসে তাঁকে।

রহমনের কাছে যেতেই রহমন তাঁকে বলল—"হুজুরের জন্য একটা 'লেগ' আলাদা করে' রেখেছি—"

"ওজন কর—"

ওজনে আড়াই সের হ'ল। বেশ চর্বিদার 'মাটন', দেখে খুশী হলেন সদাশিব। ভালো রোস্ট হবে। তিনি দামটা মিটিয়ে দিয়ে ফিরেই দেখতে পেলেন খগেন সরখেলকে। লুব্ধদৃষ্টিতে 'মাটন-লেগ'-টার দিকে চেয়ে আছেন।

"আপনি কিনলেন বুঝি ওটা? বড্ড বেশী চর্বি। তা না হ'লে আমি নিতুম সের দুই। আপনি পুরো 'লেগ'-টাই নিলেন? আপনার এ বয়সে অত চর্বি খাওয়া কি ভালো?" পরমুহূর্তেই অপ্রস্তুত মুখে বললেন—"ও, আপনি তো নিজেই ডাক্তার।" বলেই স্যুট করে' চলে' গেলেন তিনি মাছের বাজারের দিকে।

"সেলাম হুজুর—"

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন সিতাবী মেথর। তিনি যখন হাসপাতালে চাকরি করতেন তখন এ-ও ছিল সেখানে। এখনও আছে। সিতাবী এক সের 'মাটন' কিনলে। সদাশিব আন্দাজ করলেন আজ সন্ধ্যায় ওদের তাড়ির আসর ভালো করে' জমবে। আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল তাঁর। এই মেথররা খায় ভালো। কারণ মেথরদের প্রত্যেকেই কাজ করে। সিতাবীর পরিবারে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে পাঁচ-ছ'জন লোক। সকলেই রোজগার করে। ওদের সকলের আয় যোগ করলে মাসে আড়াইশ'-তিনশ' টাকা হবে। সদাশিব ভাবলেন, তাই সিতাবী স্বচ্ছন্দে তিন টাকা খরচ করে' মাটন কিনতে পারল। কিন্তু খগেন সরখেল পারলেন না। তাঁর মাইনে মাত্র একশ' টাকা। একঘর ছেলে-মেয়ে। দু'টি মেয়ে বিবাহযোগ্যা। মেয়েরা কলেজে পড়ে। ছেলেরা স্কুলে। খগেনের একশ' টাকাতে কুলোয় না। সকাল-বিকেল টিউশনিও করতে হয়।

হঠাৎ সদাশিবের মনে হ'ল খগেন যদি সিতাবী হ'ত তাহ'লে কি ঠিক হ'ত? কথাটা মনে হ'তেই শিউরে উঠলেন তিনি। সিতাবী অশিক্ষিত মাতাল, তার বউও তাই। দুজনেই সিফিলিসগ্রস্ত। ওর ছেলেমেয়েগুলোও কেউ সুস্থ নয়। মাঝে মাঝে ডগমগে রঙিন কাপড় পরে বটে, কিন্তু খুব নোংরা। সিতাবীর জোয়ান মেয়ে-দুটোও পাজি, নানারকম বদনাম ওদের সম্বন্ধে। আর খগেন সরখেল শিক্ষিত ভদ্রলোক। সাহিত্য-প্রীতি আছে, সংগীতানুরাগ আছে। ভালো বেহালা বাজাতে পারেন, যথাসাধ্য সামাজিক শালীনতা বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করেন—উনি সিতাবীর স্তরে নেমে যাবেন এটা ভাবাও যায় না। খগেন সরখেলদের জীবনের ট্রাজেডি এঁরা আশানুরূপ উপার্জন করতে পারেন না। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কি?

স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকে এদের সমস্যা তো উত্তরোত্তর জটিল হচ্ছে। দম-বন্ধ হ'য়ে আসছে এদের, চারদিকে নানা বিধিনিষেধের প্রাচীর তুলে এদের নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা করছেন সরকার। এদের বাঁচবার উপায় কি? বিদ্রোহ? এরা কি বিদ্রোহ করতে পারবে? গান্ধীজীর একটা উক্তি তাঁর মনে পড়ল —'In satyagraha, it is never the number that counts···Indeed one perfect civil resister is enough to win the battle of Right against Wrong'—অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজনও বিশুদ্ধ-চরিত্র যোদ্ধা যদি মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহ'লেই যুদ্ধজয় হবে। এ যুদ্ধে সৈনিকের সংখ্যা বেশী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোথায় সেই একজন বিশুদ্ধ-চরিত্র 'perfect' সৈনিক? এদের মধ্যে আছে কি একজনও? একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন সদাশিব। ছিপলী যে তাঁর আশেপাশে ঘুরঘুর করছে তা দেখতে পাননি। হঠাৎ দেখতে পেলেন।

"কি ছিপলী? তোর পেটের ব্যথা কেমন আছে?"

"ভালো হ'য়ে গেছে। আপনি ওঁকে একবার দেখুন। দিন দিন কমজোর হ'য়ে যাচ্ছে—"

ছিপলীর স্বামী কাঁচুমাচু মুখে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। ছোঁড়া একটা। ছিপলীর চেয়ে বয়স কম বলে' মনে হয়। পাণ্ডুর রক্তহীন চেহারা। সদাশিব ওই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই তার চোখ দেখলেন, জিভ দেখলেন। তাঁর সন্দেহ হ'ল পেটে 'হুকওয়ার্ম' আছে। বললেন, "মোটরের কাছে গিয়ে দাঁড়া, ওষুধ দিচ্ছি।" চলে' গেল তারা।

তারপর তিনি তাঁর অন্যান্য রোগীদেরও খোঁজ নিলেন। আবদুলের ছেলের আর জ্বর হয়নি। কয়লার চোখ-ওঠা অনেকটা কমেছে। ভগলুর নাতির খোসও প্রায় ভালো হ'য়ে গেছে। সুখনের ছেলের টাইফয়েড হয়েছে। তার জ্বরটা ছাড়েনি এখনও। দামী বিলিতী ওষুধ দিয়েছেন সদাশিব, তবু ছাড়েনি।

হঠাৎ কেব্‌লীর সঙ্গে দেখা হ'ল। দন্ত বিকশিত করে' একটু হেসে আধঘোমটা দিয়ে সরে' দাঁড়াল সে। তার স্বামী নারাণ কয়েক দিন আগে ছাড়া পেয়েছে। কেব্‌লী তার জন্যেই পাঁঠার 'কলিজা' (মেটে) কিনতে এসেছিল। কয়েকদিন জেলে থেকে নাকি কমজোর হ'য়ে গেছে নারাণ।

বাইরে এসে সদাশিব দেখলেন মোটরের কাছেও বেশ ভিড় আর একদল ঝাঁকামুটে ছোঁড়া দাঁড়িয়ে ছিল ফরসা কাপড় পরে'। যথারীতি সদাশিব সকলের চোখ দেখলেন, দাঁত দেখলেন, চারটে করে' পয়সা দিলেন। পাশেই যে দোকানীটা ছিল তাকে বললেন—এদের প্রত্যেককে একটা করে' লজেন্‌স্ দিতে। বারোজন ছিল, বারোটা লজেন্‌সের দাম দিয়ে দিলেন। ওদের মধ্যে একটা ছেলে বলল, "ডাক্তারবাবু, যোগীয়া আপনাকে ঠকিয়েছে। ও নিজে কাপড় পরিষ্কার করেনি, আর একজনের পরিষ্কার কাপড় পরে' এসেছে।" সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল। ঝগড়া মেটাতে দেরি হ'য়ে গেল সদাশিবের। যোগীয়া সত্যিই প্রতারণা করেছিল। ধরা পড়ে' গিয়ে কাঁদতে লাগল খুব। শেষকালে তাকে আর একটা লজেন্‌স্ দিয়ে থামাতে হ'ল। তারপর ছিপলীর স্বামীকে ওষুধ দিলেন তিনি। আরও কয়েকজনকে দিলেন। গাড়িতে উঠতে যাবেন এমন সময়ে বাঁড়ুয্যে মশায়ের গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাঁকে।

""ডাক্তারবাবু, আপনার জন্যেও কিছু কুঁচো-চিংড়ি বাছলুম। বাড়িতে বেগুন আছে তো? না থাকে তো আধসেরটাক কিনে নিয়ে যান। বেগুন-চিংড়ি করে' দিতে বলবেন আপনার রাঁধুনীকে। মসলা কিছুই নয়। পেঁয়াজের ফোড়ন দিতে হবে বেশী করে'। আর মাছগুলো যেন বেশ লাল করে' ভেজে নেয়। বেগুন ও পেঁয়াজের সঙ্গে বেশ করে' ভাজতে হবে। রুটি বা লুচি দিয়ে খেলে সুখ পাবেন—"

"আপনার মাছগুলোই আমাকে দিয়ে দিলেন নাকি—"

"না, অতটা নিঃস্বার্থপর আমি নই। নিজেরটা রেখে তবে আপনাকে দিয়েছি—"

বাঁড়ুয্যে মশাই বেঁটে লোক। সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে থাকেন। মুখে

www.boiRboi.blogspot.com

ভাবের অভিব্যক্তি বড় একটা হয় না। কিন্তু সদাশিব লক্ষ্য করলেন তাঁর মুখে একটা মৃদু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

"অনেক ধন্যবাদ। আপনার নাতনীর হাতের রান্না খেতে একদিন যাব কিন্তু—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। যেদিন খুশী। কমল সেদিন বলছিল আপনি খুব খাইয়েছেন তাকে। আমার তো হজমশক্তি নেই, থাকলে আমিও একদিন আপনার সঙ্গে খেয়ে আসতুম—"

"আসুন না একদিন। আপনার হজমশক্তির মতোই ব্যবস্থা করা যাবে—"

বাঁড়ুয্যে মশাই নমস্কার করলেন।

"না, ও কথা ঠাট্টা করে' বললাম। আমি কোথাও নিমন্ত্রণ খাই না। গুরুদেবের বারণ—"

কমলের কথায় সদাশিবের মনে পড়ল মিস্টার পরসাদের কথা। কমলের কথা তো তাঁকে বলা হয়নি। কমল হয়তো আশা করে' আছে। তখুনি মিস্টার পরসাদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

নয়

সদাশিব ডায়েরি লিখছিলেন।

"মালতীকে নিয়ে বেশ একটু চিন্তায় পড়েছি। আজকাল তার বড় ঘন ঘন 'ফিট' হচ্ছে। 'ফিট'-এর ব্যাপারটা গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাল রাত্রে হঠাৎ যা কানে এল তাতে একটু বিব্রত বোধ করছি। কাল রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম আসছিল না। বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে-ছিলাম। বারান্দার ঠিক পাশেই মালতীর শোবার ঘর। মালতীর সঙ্গে চিরঞ্জীবের কথোপকথন আমার কানে গেল। স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। এ সম্ভাবনাটা আমার মনে একদিনও উদয় হয়নি।

মালতী বলছিল, 'আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে। বেঁচে আমার সুখ কি! তোমার কাকার সংসারে রাঁধুনীবৃত্তি করতে করতে তো হাড় কালি হ'য়ে গেল। বিয়ে হ'য়ে ইস্তক তো ওই কাজই করছি। উনি বাহাদুরি করে' রাজ্যের লোককে নিমন্ত্রণ করবেন, আর আমাকে তাদের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি রাঁধতে হবে। সকাল থেকে রাত্তির এগারোটা পর্যন্ত ওই আজবলালের টিকি ধরে'

দাঁড়িয়ে থাকা অসহ্য হয়েছে আমার পক্ষে। আমি আর পারছি না, পারছি না—'

মালতী কান্নায় ভেঙে পড়ল। চিরঞ্জীব নিম্নকণ্ঠে কি বললে ঠিক শুনতে পেলাম না। সম্ভবতঃ সান্ত্বনা দিতে লাগল।

মালতীর যেটা দুঃখের কারণ—বন্ধ্যাত্ব—তা কেউ ঘোচাতে পারবে না। ওরই দু'চারটে ছেলে-মেয়ে হ'লে ওর অন্যরকম চেহারা হ'ত। কিন্তু আমি ওর দুঃখের নিমিত্ত হ'য়ে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে ওকে আমার গৃহস্থালিতে কর্ত্রীপদে বরণ করে' হয়তো ভুল করেছি।

চিরঞ্জীব এক অজ পাড়াগাঁয়ে একশ' টাকা বেতনে স্কুলমাস্টারি করত। খুব কষ্টে ছিল। প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভুগত। তাই আমি ওকে নিয়ে এসেছিলাম। যে একশ' টাকা ওখানে মাইনে পেত, সে একশ' টাকা আমি ওকে মাসে মাসে হাত-খরচস্বরূপ দিই। ওরা এখানে যে স্টাইলে থাকে, সে স্টাইলে ওরা মাসে পাঁচশ' টাকা রোজগার করলেও থাকতে পারত না। মালতীর শাড়ি-গয়নার অভাব রাখিনি। ওর যে-কোনও শখ বলবামাত্রই মিটিয়ে দিয়েছি। বাড়িতে খরগোশ, কাবুলী বিড়াল, কুকুর, পায়রা, নানারকম পাখী—সব ওর জন্যই। তবু দেখছি ও সুখী নয়। আমার সংসারকে ও নিজের সংসার করে' নিতে পারেনি। ওর সর্বদাই মনে হচ্ছে—এটা কাকার সংসার। কিন্তু আমার সংসারে ওরাই তো সর্বেসর্বা।

সোহাগ তার স্বামীর সঙ্গে বিলেত চলে' গেছে। কন্টিনেন্ট টুর করছে। সোহাগের স্বামী বিলেতেই একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। বাড়িও কিনেছে লণ্ডনের কাছাকাছি একটা জায়গায়। হয়তো ওইখানেই শেষ পর্যন্ত বসবাস করবে। অর্থাৎ ওদের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধ ছিন্ন হ'ল যদি না আমিও ওদের সঙ্গে গিয়ে বাস করি। সোহাগ লিখেওছে যেতে। অনেক শিক্ষিত লোক নাকি এদেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে বিলেতে বা আমেরিকায় গিয়ে বাস করছে। সেখানে নাকি সবরকম সুবিধা। হোক সুবিধা, আমি বিদেশে যেতে পারব না। লক্ষ্য করছি সব সময় সব ব্যাপার নিজের সুবিধার মানদণ্ডে মাপতে গিয়ে অনেক লোক পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছে। স্বদেশের ঠাকুরকে অবহেলা করে' বিদেশের কুকুরদের আদর করার জন্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাদের গাল দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর গালাগাল গায়ে মাখিনি। সাহেবরা এদেশ থেকে চলে' যাওয়ার পর থেকে আমাদের বিদেশ-প্রীতি যেন হু হু করে' বেড়ে

www.boiRboi.blogspot.com

যাচ্ছে। এটা দুর্লক্ষণ। সাহেবদের অনেক সদ্‌গুণ আছে স্বীকার করি, সেই সদ্‌গুণগুলি আমরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি, কারণ সদ্‌গুণ কোনও বিশেষ দেশের বিশেষ মানুষদের সম্পত্তি নয়। সেগুলি আয়ত্ত করবার জন্যে প্যাণ্ট নেকটাই পরবার বা গরু খাবার দরকার নেই, তার জন্যে দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়াও অনাবশ্যক।

এক বিলেত-ফেরত ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন—বিলেতে সাহেবরা সামনাসামনি আমাদের সঙ্গে যত ভদ্রতাই করুক, আড়ালে আমরা তাদের চোখে 'ব্রাউনি', একটা অদৃশ্য সীমারেখা টেনে মনে মনে ওরা আমাদের সর্বদাই তফাত করে' রাখে। নিজেদের মধ্যে হয়তো আমাদের নিয়ে হাসাহাসিও করে। রবীন্দ্রনাথের মতো লোকের সম্বন্ধেও একজন বিখ্যাত লেখকের যে-সব প্রাইভেট চিঠিপত্র বেরিয়েছিল তা পড়বার পর আর ওদেশে যেতে ইচ্ছে করে না। রবীন্দ্রনাথকে তো আমেরিকার লোকেরাও ভারতীয় বলে' অপমান করেছিল। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে চলে' আসেন। আমার মেয়ে-জামাই সেই বিদেশে গিয়ে থাকবে ঠিক করেছে। করুক, আমি যাব না। এই দেশে জন্মেছি, এই দেশেই মরব।"

সদাশিব একটা বড় দীঘির ধারে চেয়ার টেবিল পেতে লিখছিলেন। দীঘির ধারে 'কুঁজড়া' (যারা তরকারি ফলিয়ে বিক্রি করে) জগদীশের ঘর। জগদীশ নবীগঞ্জের হাটে তরকারী বেচে। বুড়ো মানুষ। সে স্ট্র্যাংগুলেটেড্ হার্নিয়া হ'য়ে মর-মর হয়েছিল। খবর পেয়ে সদাশিব এসে সেটা অপারেশন করেছেন। দুঃসাধ্য কাজ। উলফৎ কম্পাউণ্ডার এবং ড্রাইভার আলীর সহায়তায় এটি করেছেন তিনি। সকাল থেকে এইখানেই বসে' আছেন। কম্পাউণ্ডার উলফৎকে বসিয়ে রেখেছেন জগদীশের কাছে। জগদীশের জ্ঞান হয়েছে। তবু বসিয়ে রেখেছেন উলফৎকে। আরও ঘণ্টখানেক পরে ছুটি দেবেন। উলফৎ বুড়ো অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডার। সদাশিব যখন চাকরি করতেন তখন হাসপাতালে ছিল। এখন সেও রিটায়ার করেছে। সদাশিব বাইরে যখন অপারেশন করেন, উলফৎকে ডাকেন।

জগদীশের মেয়ে এসে বললে—"বাবুজি ভালো আছে। হাসছে—"

"আমার জন্যে একগ্লাস শরবত করে' নিয়ে আয়। আমার গাড়ি থেকে গ্লাস নিয়ে যা—"

মেয়েটা দৌড়ে চলে' গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

দশ

ভোর পাঁচটা। সদাশিব বাইরে 'লনে' চুপ করে বসে' আছেন একা একটা ক্যাম্প-চেয়ারে। দুটো কোকিল ডাকাডাকি করছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডাকছে আরও কয়েকটা পাখী। দুটো হাঁড়িচাঁচা মিষ্টিস্বরে কথাবার্তা কইছে পরস্পরের সঙ্গে। মনে হচ্ছে যেন বলছে 'খুকু নেই', 'খুকু নেই'। টংক্ টংক্ টংক্ একঘেয়ে স্বরে ডেকে চলেছে স্যাকরা পাখী। কয়েকটা দুর্গাটুন্‌টুনি উড়ে বেড়াচ্ছে কল্‌কে ফুলের ঝাড়ে। কল্‌কে ফুলের ভিতর ঠোঁট চালিয়ে মধু খাচ্ছে আর কিচ্‌কিচ্‌ কিচ্‌কিচ্‌ চর্‌চর্‌ করে' শব্দ করছে। সদাশিবের স্প্যানিয়েল কুকুর 'লোমেশ' সামনে বসে' আছে থাবার উপর মুখ রেখে। উৎসুকদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সদাশিবের মুখের দিকে। সদাশিব যে আজ বিশেষরকম অন্যমনস্ক তা যেন সে বুঝতে পেরেছে। বাড়ির চাকরটা একটা চৌকো টুল রেখে গেল সামনে। তারপর একটা ট্রের উপরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে রাখল তার উপর।

"চা কি ছেঁকে দেব—"

"থাক্। আর একটু ভিজুক—"

সদাশিব অন্যমনস্কভাবে পাখীদের গান শুনতে লাগলেন পা দোলাতে দোলাতে। চায়ের দিকে তেমন মনোযোগ দিলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল লোমেশ উৎসুকদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর দিকে আর আস্তে আস্তে ল্যাজ নাড়ছে। তিনি ট্রের উপর থেকে একটা বিস্কুট ছুঁড়ে দিলেন তার দিকে। লোমেশ সেটাকে আর মাটিতে পড়বার অবসর দিলে না, শূন্য থেকেই লুফে নিলে সেটাকে মুখ দিয়ে। একটা বিস্কুট খেয়ে উৎসাহভরে উঠে পড়ল এবং একটু এগিয়ে এসে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল। আর একটা বিস্কুট দিলেন তাকে, তারপর আর একটা।

"আরও বিস্কুট এনে দেব—"

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন আজবলাল দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কখন এসেছে তা টের পাননি তিনি। সদাশিব দেখলেন তার চোখে-মুখে একটা কুণ্ঠিত স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে—সদাশিব যেন ক্রীড়ারত শিশু একটা—ক্রীড়াচ্ছলে দামী বিস্কুটগুলো কুকুরকে খাওয়াচ্ছেন। তাঁর উদারতায় সে মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু অপচয়শীলতায় ক্ষুব্ধও কম হয়নি। তার মনে হচ্ছে মালতী থাকলে তাঁকে হয়তো শাসন করত, কিন্তু সে তাঁকে শাসন করতে পারে না। মনিব যে!

"না, আমার আর বিস্কুট চাই না।"

"চা-টা ছেঁকে দেব ? ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।"

"দাও—"

আজবলাল চা ছাঁকতে লাগল।

মালতীকে নিয়ে চিরঞ্জীব কাল চলে' গেল কাশ্মীর। সদাশিব জোর করে' পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের।

তাঁর মনে হয়েছে বাইরে একটু বেড়িয়ে এলে হয়তো মালতীর মনটা ভালো হবে।

প্রস্তাবটা শুনে চিরঞ্জীব আশ্চর্য হয়েছিল প্রথমটা।

"কাশ্মীর ? সেখানে গিয়ে কি হবে !"

"ওর মনটা ভালো হবে। একঘেয়ে জীবন থেকে একটু ছাড়া পেয়ে বাঁচবে। ওকে কিছুদিন নানা জায়গায় নিয়ে ঘুরে বেড়াও। দিল্লী, আগ্রা, কাশী, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন—যেখানে ও যেতে চায় নিয়ে যাও ওকে। এতে একটু উপকার হবে মনে হয়। টাকার জন্যে ভেবো না, সে আমি ব্যবস্থা করব—"

চিরঞ্জীব স্বল্পভাষী, কিছু বলল না। কিন্তু সে মনে মনে বুঝল সদাশিব মালতীর পরিবর্তিত মনোভাবের আভাস পেয়েছেন। এজন্য নিজেই সে মনে মনে কুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে সে-ও যেন বাঁচল। এতে মালতীর উপকার হবে কি না সে জানত না, কিন্তু মালতীকে যে কাকার কাছ থেকে সে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছে, এতেই সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। তার ভয় ছিল মালতী কোনদিন প্রকাশ্যে কোনও কেলেঙ্কারি করে' না বসে।

মালতী কাল চলে' গেছে। যদিও বাড়িতে চাকরবাকরদের অভাব নেই, তবু যেন বাড়িটা খালি খালি মনে হচ্ছে সদাশিবের। মালতী যে বাড়িটার অনেকখানি পূর্ণ করে' থাকত! তার চীৎকার চেঁচামেচি, চাকর-ঠাকুরের উপর তার দোর্দণ্ড প্রতাপ, বাড়ির সমস্ত আবহাওয়াকে সরগরম করে' রাখত। হঠাৎ সব যেন নিঝ্ঝুম হ'য়ে গেছে।

সদাশিব চা খেয়ে চুপ করে' বসে' রইলেন আরও খানিকক্ষণ। খবরের কাগজওলা এসে কাগজ দিয়ে গেল। সদাশিব খবরের কাগজ কেনেন কিন্তু পড়েন না। চিরঞ্জীবই কাগজ পড়ে' দরকারী খবর মাঝে মাঝে শোনাত তাঁকে। কাগজটা দেখে আর একবার চিরঞ্জীবের কথা মনে পড়ল।

একটু পরেই গেটের কাছে মোটর এসে দাঁড়াল একটা। কমল নেমে এল মোটর থেকে।

"কি খবর কমল, এত সকালে হঠাৎ?"

"কাল জগদীশপুর হাটে গিয়েছিলাম। এস. ডি. ও. সাহেবের গাড়ি খারাপ হয়েছিল সেখানে। হাটে দেখলাম, বেশ সস্তায় মুরগি বিক্রি হচ্ছে। কিনে নিয়ে এসেছি গোটা ছয়েক। মালতীদি-কে বলুন ভালো করে' রান্না করতে। রাত্রে এসে খাব। আমার জন্য যেন রুটি করেন।"

"মালতী কাশ্মীর বেড়াতে গেছে। যাক, তার জন্যে আটকাবে না—এই আলী—"

"হুজৌর—"

আলী সেলাম করে' এসে দাঁড়াল।

"বাবুর্চি গোলাম রসুলকে খবর দাও, আজ এখানে এসে রাঁধবে।"

"বহুত খু—"

"আমি তো এখুনি বেরুব। তখনই যাবার পথে বলে' যাব তাকে—"

"বহুত খু—"

"মুরগিগুলো নাবিয়ে রেখে দাও—"

"বহুত খু—"

আলী চলে' গেল। সদাশিব কমলকে জিগ্যেস করলেন, "তোমার বিল আদায় হ'ল?"

"হয়েছে। মিস্টার পরসাদ এমন জোর কলমে লিখলেন যে বাপ বাপ করে' টাকা দিয়ে গেলেন। তাই না মবলগ দশ টাকা খরচ করে' মুরগি কিনলাম কাল!"

সদাশিব হাসলেন। একবার ইচ্ছে হ'ল তাকে মিতব্যয়ী হ'তে উপদেশ দেন। কিন্তু নিজের কথা ভেবে তা আর দিলেন না।

"আচ্ছা চলি এখন। একটা মোটর 'চুর' হ'য়ে এসেছে কারখানায় অ্যাক্‌সিডেণ্ট করে' এসেছে। গাড়ির ভিতর রক্তও রয়েছে। ওরা বলছে রক্ত মানুষের নয়, ওরা কোথায় যেন পূজো দিয়ে পাঁঠা বলি দিয়েছিল, সেই কাটা পাঁঠাটা গাড়িতে ছিল, তারই রক্ত—"

"চেনা গাড়ি?—

"না, বাইরের গাড়ি। মোটরের নম্বর রাঁচির। কি করব বলুন তো?"

www.boiRboi.blogspot.com

"পুলিসে খবর দাও। পুলিস এসে দেখে যাক্, তারপর গাড়িতে হাত দিও। তা না হ'লে ফ্যাসাদে পড়ে' যেতে পার।"

"তাই করি তাহ'লে।"

কমল চলে' গেল।

তারপর সদাশিবের মনে পড়ল বন্থুর ওখানে যেতে হবে। বন্থু কয়লা-গুদামের কুলি। কাল থেকে তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। বন্থু কয়লা-গুদামেরই একধারে থাকে। তার দেশ কোথায় কেউ জানে না, তাকে সবাই চিরকাল কয়লা বইতে দেখেছে। ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা, কুচকুচে কালো। ঘাড়টা একধারে একটু বেঁকা। গলার স্বর ঝাপসা। কাল যখন সদাশিব বাজারে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সামনেই বন্থু কয়লার বোঝাসুদ্ধ রাস্তায় পড়ে' যায়। তারপর তার মুখ থেকে রক্ত উঠতে থাকে। সদাশিব তাকে গাড়ি করে' হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু বন্থু যেতে চাইলো না। বললে, ওখানে গেলেই পয়সা চাইবে। আমার পয়সা নেই! আমাকে ওই গুদামেই নিয়ে চলুন। গুদামের মালিক সৌখী মাড়োয়ারী একটা ঘর খালি করিয়ে দিয়েছেন। ঠিক পাশেই যে কয়লার গুদাম আছে সেখানে একটা ভালো ঘর ছিল; কিন্তু সে গুদামের মালিক বাঙালী সর্বেশ্বরবাবু। তিনি সর্ববিষয়ে গা বাঁচিয়ে হিসাব করে' চলেন, তাই সে ঘরে টি. বি. রোগীকে ঢুকতে দেননি। বন্থুর টি. বি. হয়েছে কি না তা সদাশিব এখন ঠিক করতে পারেননি, কিন্তু সর্বেশ্বর এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

সদাশিব উঠতে যাবেন এমন সময়ে আধঘোমটা দিয়ে কেব্লী এসে দাঁড়াল।

"কি খবর কেব্লী?"

কেব্লী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"কি ব্যাপার, কি হয়েছে—"

কেব্লী কাঁদতেই লাগল। তারপর অশ্রুজড়িত কণ্ঠে থেমে থেমে বলল যে নারাণ তাকে কাল মেরেছে। তার মাথা কেটে গেছে।

"সে কি!"

"দেখো নি" (দেখ না)।

মাথার কাপড় তুলে সে দেখাল। সামনের চুলগুলো শুকনো রক্তের চাপে জড়িয়ে গেছে। সদাশিব তার চেহারা দেখে ভয় পেলেন। চোখে অশ্রু লেগে

আছে বটে কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ, যেন সর্পিণী ফণা তুলেছে। কিছুদিন আগে এইরকম এক স্বামী-লাঞ্ছিতা কাহারনী তার স্বামীকে দা দিয়ে কেটে ফেলেছিল। ঘটনাটা হঠাৎ মনে পড়ল।

"কেন মারলে কেন তোকে—"

তখন কেব্‌লী আসল কারণটি বিবৃত করল। নারাণ আবার একটি বিয়ে করতে চায়। কেব্‌লী বাঁজা। সুতরাং নারাণের দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে চাইছে তার ভাই। তার মায়ের—মানে কেব্‌লীর শাশুড়ীর এতে মত নেই।

"নারাণের মা বেঁচে আছে নাকি এখনও ?"

"হ্যাঁ। দেহাতে সে জমিতে কাজ করে—"

"কোথায় নারাণের বিয়ে ঠিক হয়েছে ?"

"ওই দেহাতেই। একটা কানী বিধবা ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। কে ভালো মেয়ে দেবে ওই বুড়োকে—"

"এ মেয়েটার বয়স কত—"

"তা জোয়ান আছে—"

"তোকে মারতে গেল কেন শুধু শুধু—"

"বাঃ, আমার মত না পেলে তো বিয়েই হবে না। আমাদের সমাজের নিয়ম যে 'পন্‌চ'-এর (সমাজের মোড়লদের) সামনে আমি যতক্ষণ না বলব যে আমার বিয়েতে মত আছে, ততক্ষণ ওকে কেউ মেয়ে দিতে পারবে না। আমার সেই মত নেবার জন্যে আমাকে মারধোর শুরু করেছে—"

কেব্‌লীরা জাতে মুচি। তাদের সমাজে এরকম নিয়ম আছে শুনে সদাশিব বিস্মিত হলেন।

"এ ব্যাপারে আমি কি করব বল—"

"আপনি দারোগা সাহেবকে বলে' আবার ওকে জেলে পুরে দিন। ওরকম মারখুণ্ডা শন্‌কাহা মানুষের জেলে থাকাই উচিত—"

সদাশিব হেসে ফেললেন।

"সে কি হয়। আচ্ছা তুই বাড়ি যা। নারাণের সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে বলব আমি—"

কেব্‌লী চলে' গেল।

সদাশিবের গাড়ি যখন কয়লা-গুদামের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন সেখানে কেউ

ছিল না। গুদামের মালিকরা কেউ আসেননি তখনও, কুলিরাও কেউ আসেনি। বন্ধুকে কাল যে ঘরটায় সদাশিব রেখে গিয়েছিলেন সে ঘরের কপাট দুটো খোলা। সদাশিব মোটর থেকে নেবে দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্ষণকালের জন্য। কয়লার স্তূপগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হ'ল যেন শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছেন। 'কয়লাগুলো তো মৃত অরণ্যের কঙ্কাল, মাটির তলা থেকে খুঁড়ে আবার সেগুলো পোড়াচ্ছি আমরা'—এই দার্শনিক চিন্তা ক্ষণিকের জন্যে অন্যমনস্ক করে' দিল তাঁকে। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন বন্ধুর ঘরটার দিকে। গিয়ে দেখলেন বন্ধু মুখ গুঁজড়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে, আর ঘরের কোণে বসে' আছে একটা লোম-ওঠা রাস্তার কুকুর। বন্ধু যখন দুপুরে ছাতু খেত এই কুকুরটাকে ছাতুর গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। সেই কুকুরটা বসে' আছে চুপ করে'। আর একফালি রোদ বন্ধুর মাথায় পিঠে সোনালী চাদরের মতো বিছানো রয়েছে। সদাশিব পরীক্ষা করে' দেখলেন বন্ধু মারা গেছে। নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

অনেকদিন আগেকার ছবি ফুটে উঠল তাঁর মনে। সেদিন রবিবারে। সব কয়লার দোকান বন্ধ। তার উপর বৃষ্টি পড়ছে। সেদিন বাড়িতে তিনি কয়েকজনকে খেতে বলেছেন। মালতী খেয়াল করেনি যে আগের দিন রাত্রেই কয়লা ফুরিয়ে গেছে। সকালবেলা চাকর বাজার থেকে ফিরে এসে বলল, সব দোকান বন্ধ, কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না। সঙীন পরিস্থিতি। সদাশিব নিজে বেরুলেন শেষকালে। বৃষ্টি পড়ছিল খুব। রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। মাছের দোকানের গলিটার সামনে এসে দেখলেন বন্ধু রাস্তার ধারে মাথায় বোরা-ঢাকা দিয়ে বসে' আছে। নেবে পড়লেন তিনি গাড়ি থেকে। তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াল বন্ধু। মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বাঁকা ঘাড়টা আর একটু বেঁকিয়ে সেলাম করল তাঁকে।

"বন্ধু, মহা মুশকিলে পড়েছি···"

সকল কথা বললেন বন্ধুকে।

বন্ধু ঝাপ্‌সা গলায় ভরসা দিল।

"আপনি বাড়ি যান, কয়লা পৌঁছে দিচ্ছি আমি—"

"সব দোকান তো বন্ধ, কোথায় পাবে তুমি—"

কোথায় পাবে তা সে বলেনি। কেবল বলেছিল, 'পাব'।

"দামটা নাও তাহ'লে—"

একটা পাঁচটাকার নোট বার করে' দিয়েছিলেন সদাশিব।

"ভাঙানি তো নেই। দাম আমি পরে নিয়ে নেব—"

এক ঘণ্টা পরেই বন্থু ভিজতে ভিজতে কয়লা দিয়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে সদাশিব মনে করতে পারলেন না, বন্থু কয়লার দামটা চেয়ে নিয়েছিল কি না। কারণ তারপর বন্থুর সঙ্গে আর তাঁর দেখাই হয়নি অনেকদিন। মালতী হয়তো দিয়ে থাকবে—এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলেন তিনি। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন সদাশিব। ভাবতে লাগলেন এই আত্মীয়-স্বজনহীন লোকটার এখন আর কি করতে পারেন তিনি। এখন তো ও চিকিৎসার বাইরে চলে' গেছে। সেদিনের সেই কথাটা স্মরণ করে' তিনি অনুভব করলেন আজও তিনি বন্থুর কাছে ঋণী আছেন। কি করে' এ ঋণ শোধ করা যায়? কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন আরও, তার পর বুঝতে পারলেন এ ঋণ শোধ করা যাবে না। সব ঋণ শোধ করা যায় না।

"রাম রাম ডাক্টার সাহেব। বন্থু কেমন আসে?"

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, সৌখী মাড়োয়ারী এসে তাঁর আপিসের চাবি খুলছেন।

"বন্থু মারা গেছে—"

"মরিয়ে গেলো? সরবোনাস্ হ'ল তাহ'লে। ও মুরদাকে এখন ফেক্‌বে কে?—"

বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা কথা মনে হ'ল সদাশিবের। বললেন, "সে ব্যবস্থা আমি করছি—"

"আপনে কোরবেন? কম সে কম দশ পন্‌দরহ্ টাকা খরচা হইয়ে যাবে—"

"দেখি—"

তখনি মোটরে করে' বেরিয়ে গেলেন সদাশিব। বন্থুকে বাজারে সবাই চিনত। লোক সংগ্রহ করতে বিলম্ব হ'ল না। সদাশিব খাটিয়া, শালু আর ফুল কিনে দিলেন। বাজারে যত ফুল পাওয়া গেল সব কিনলেন। ছিপলী, আবদুল আর ঝকমুও যোগাড় করে' নিয়ে এল কিছু ফুল। একদল কীর্তনীয়াও জুটে গেল। বেশ বড় শোভাযাত্রা করে' মহাসমারোহে বন্থু চলে' গেল মহাপ্রস্থানের পথে। সদাশিব লক্ষ্য করলেন শোভাযাত্রার পিছন পিছন সেই লোম-ওঠা কুকুরটাও চলেছে। সদাশিবের সবসুদ্ধ খরচ হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ টাকা। এত কম টাকার বিনিময়ে এমন প্রচুর আনন্দ তিনি জীবনে আর

কখনও পাননি। অনেকদিন পরে তাঁর মন অনাবিল তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। একটু দূরে দূরে তিনিও শবানুগমন করতে লাগলেন তাঁর মোটরে।

"রাম রাম ডাক্‌টার সাহেব—"

সৌখী মাড়োয়ারীকে দেখে গাড়ি থামালেন সদাশিব। "হামার বড় তাজ্জব লাগছে। আপনে এক কুলিকে লিয়ে কাহে এত্‌না রুপিয়া খরচ কর ডালা হমরা সমঝ্‌মে নেহি আতা হ্যায়—"

সদাশিব দেখলেন এর আধ্যাত্মিক দিকটা সৌখী মাড়োয়ারীকে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললেন—"বন্ধুর কিছু টাকা আমার কাছে জমা ছিল। সে টাকাই লাগিয়ে দিলাম এতে।

"ও আব্‌ সমঝা। ভালো করিয়েসেন—রাম রাম।"

সৌখী মাড়োয়ারী চলে' গেলেন।

আলী আবার স্টার্ট দিলে মোটরে।

"আস্তে আস্তে চল—"

কিছুদূর যাবার পর একটা খুব রঙচঙে রিক্‌শা সামনে এসে দাঁড়াল। রিক্‌শার পিছনে একটি উন্মুক্ত-বক্ষা অত্যাধুনিকা অভিনেত্রীর ছবি রয়েছে। রিক্‌শার গদি লাল সাটিনের, হুডটা সবুজ রঙের। হুডের চারিধারে চমৎকার ঝালর দেওয়া। সাইকেলের হাতলে একরাশ সোঁদাল ফুল। রিক্‌শাচালক নেমে খুব ঝুঁকে সেলাম করলে সদাশিবকে। শুকুরের ছেলে সিদ্দিক। একেই তিনি কিছুদিন আগে হাটে চড় মেরেছিলেন। গনোরিয়া হয়েছিল ছোকরার।

"কৈসা হ্যায়—"

"ছুট্‌ গিয়া হুজুর। আওর কি সুই লেনা পড়েগা ?"

"কল্‌ পেসাব লে কর্‌ আও, দেখেঙ্গে—"

শোভাযাত্রার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে' সিদ্দিক আলীকে জিগ্যেস করলে, "ইয়ে জুলুস কিস্‌কা হ্যায়—"

আলী তখন তাকে বললে যে বন্ধু মরে' গেছে, তাকেই শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে সবাই।

"ম্যায়্‌ ভি যাউঙ্গা—"

সিদ্দিক্‌ তার রঙীন রিক্‌শা চালিয়ে চলে' গেল ভিড়ের মধ্যে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

শ্মশান থেকে সদাশিব গিয়েছিলেন তিরমোহানীর হাটে। সেখানে অনেকগুলি রোগীর আসার কথা ছিল। সেখানে দেখা হ'ল গীতার সঙ্গে। গীতা সেখানে মহুয়া দই বিক্রি করছিল। সে উদ্ভাসিত মুখে সদাশিবের দিকে চেয়ে মাথার কাপড়টা টেনে দিল একটু। তারপর তার পাশেই যে বলিষ্ঠ গুঁপো লোকটি বসে' ছিল তাকে ফিসফিস করে' কি বললে। নমস্কার করে' উঠে দাঁড়াল লোকটি।

"কে তুমি, চিনতে পারছি না তো—"

"শকলদীপ—"

পাশের একজন পরিচয় করিয়ে দিলে শকলদীপ গীতার স্বামী। শকলদীপ আহীর গোয়ালাদের মিষ্টি ভাষায় মৃদুকণ্ঠে বলল যে সে তাঁরই ভরসায় গ্রাম ছেড়ে চলে' এসেছে। একদিন সে তাঁর কাছে যাবে।

"যেও—"

সদাশিব হাটে ঘুরতে লাগলেন। তিরমোহানীর হাটে ভালো পেঁপে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। সেদিন কিন্তু পেঁপে দেখতে পেলেন না। অন্যান্য তরকারিওলার কাছে খবর পেলেন শিবুর একমাত্র ছেলেটি নাকি মারা গেছে দু'দিন আগে। শিবুই হাটে পেঁপে আনত।

"কি হয়েছিল তার ছেলের?"

"মেয়াদী বোখার—"

ঠাইফয়েড-জাতীয় কোন জ্বর হয়েছিল সদাশিবের মনে হ'ল।

"কে দেখছিল?"

"বিলাতী ডাক্‌টার দৎ সাহেব—"

সদাশিবের আত্মসম্মানে যেন একটু আঘাত লাগল। শিবুর বাড়ির অনেক অসুখ তিনি সারিয়েছেন। আজ শিবু বিলাতী ডাক্তার দৎ সাহেবের কাছে ছেলের চিকিৎসা করিয়েছে শুনে তাঁর খারাপ লাগল।

দৎ সাহেবের বয়স বেশী নয়, বিলেত থেকে সম্প্রতি ডি. টি. এম. পাস করে' এসেছেন। লোকটির চিকিৎসা-নৈপুণ্য আছে কি না তা এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ, কিন্তু ব্যবসায় নৈপুণ্য যে আছে তা ইতিমধ্যেই বেশ বোঝা গেছে। অনেক দালাল লাগিয়েছেন, তারা রোগীপিছু কমিশন পায়। তাদের আরও একটা কাজ হচ্ছে আকারে-ইঙ্গিতে প্রচার করা যে সদাশিবকে দিয়ে চিকিৎসা করানো নিরাপদ নয়। তিনি বুড়ো হয়েছেন, সেকেলে মতে চিকিৎসা করেন, অনেক কিছু ভুলেও গেছেন। এবং এই কারণেই 'ফি' নেন না, ওষুধের দামও দাবি

করেন না। এই প্রচারে সদাশিবের অবশ্য ক্ষতি হয়নি, কারণ তিনি লাভের আশায় প্রাকৃটিস্ করতেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে কষ্ট হয় তাঁর। মানুষের মনের বিচিত্র মতিগতি দেখে কৌতুকও অনুভব করেন।

...হাট থেকে যখন ফিরলেন তখন অনেক বেলা হ'য়ে গেছে। প্রায় দুটো। এসে দেখেন দ্বিজেনবাবু বসে আছেন একটা নীল চশমা পরে'। দ্বিজেনবাবু একজন মোক্তার। সদাশিবের সঙ্গে তাঁর ক্বচিৎ দেখা হয়। প্রোটিন খাদ্যের মহার্ঘতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন—"আজকাল পাকা রুই সাড়ে তিন টাকা সের, মাংসও তাই। ভালো ডিম এক টাকায় সাতটা বা বড়জোর; আটটা। দুধ টাকায় পাঁচপো। তাই কিনে খাই, কি আর করব। যা রোজগার করি খাওয়াতেই যায়। ভিটামিনের জন্য ফলও খেতে হয় কিছু—লেবু, বেদানা এই সব। শসা-টসা আমার রোচে না। খেয়েই সর্বস্বান্ত হলাম মশাই" —বলেই অধরোষ্ঠের সহযোগে আক্ষেপসূচক 'মচ্'-গোছের একটা শব্দ করেন। তাঁর চেহারাটি কিন্তু খাদ্যপুষ্ট নয়। চোখের কোল বসা, গালের হাড় উঁচু, নাকটা খাড়ার মতো। দেখলেই মনে হয় বুভুক্ষা যেন মূর্তিমতী হ'য়ে রয়েছে তাঁর চেহারায়।

"নমস্কার ডাক্তারবাবু, অনেকক্ষণ থেকে বসে' আছি আপনার অপেক্ষায়—"

"নমস্কার। হঠাৎ এ সময়ে কেন?"

"চোখটাতে ভালো দেখতে পাচ্ছি না ক'দিন থেকে। নতুন বিলেতফেরত ডাক্তারটার কাছে গিয়েছিলাম, এক কাঁড়ি টাকা খরচ হ'ল খালি, চোখের তো কোনও উপকার দেখছি না।"

"বসুন দেখছি।"

তখনই ভালো করে' পরীক্ষা করলেন চোখটা। দেখে তাঁর যা মনে হ'ল তা বলতে পারলেন না তিনি দ্বিজেনবাবুকে। যে ব্যক্তি বরাবর বড়াই করে' এসেছেন যে ভালো ভালো খাবার খেয়েই তিনি সর্বসান্ত তাঁকে কি করে' বলা যায় যে ভালো খাদ্যের অভাবেই তাঁর চোখের এই দশা হয়েছে। তাঁর মনে পড়ল তাঁর এক বন্ধু জ্ঞানবাবুর কথা। জ্ঞানবাবু একবার বলেছিলেন—"এটা সার জেনে রেখো পেট না মারলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে পয়সা জমানো অসম্ভব। যারা মুখে বলে হাতী খাচ্ছি ঘোড়া খাচ্ছি তারা জেনো বাহাদুরি করছে। ছেলে পড়িয়ে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে, বাড়িভাড়া গুণে আর লোক লৌকিকতা করে' কটা পয়সা বাঁচে যে খাবে? জান, অনেক বাড়িতেই দাই চাকর নেই, অনেক

বাড়িতেই দু'বেলা রান্না হয় না। সব জানা আছে আমার। সুতরাং পয়সা যদি বাঁচাতে চাও নোলাটি কমাও।"

জ্ঞানবাবুর এ সারগর্ভ উপদেশ সদাশিব পালন করেননি। দ্বিজেনবাবুর চোখ দেখে জ্ঞানবাবুর কথাগুলো অনেকদিন পরে মনে পড়ল। হয়তো এতদিন লোকটা মিথ্যে বাহাদুরি করে' এসেছে।

"কি দেখলেন চোখে ?"

"হ্যাঁ, একটু খারাপ হয়েছে। আপনি ডিম আর দুধ কি ভাবে খান ?"

"দুধের ক্ষীর আর ডিমের ডালনা।"

"এগ্ ফ্লিপ্ করে' খাবেন। আধকাপ দুধে একটা কাঁচা ডিম মিশিয়ে তাই ঢক করে' খেয়ে ফেলবেন রোজ সকালে—"

"আঁশটে গন্ধ ছাড়বে যে—"

"নাক টিপে ওষুধের মতো খেয়ে নেবেন।"

"ওষুধ দেবেন না কিছু ?"

"দিচ্ছি—"

সদাশিবের কাছে ভিটামিনের স্যাম্পল্ ছিল নানারকম। সেইগুলোই দিয়ে দিলেন।

"আপাতত এইগুলো খেয়ে দেখুন। যদি না কমে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে—"

"আপনার ফি—আর ওষুধের দাম—"

"না, ওসব দিতে হবে না। এখন আমি কেবল ডাক্তারি করি, ডাক্তারি ব্যবসা অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি—"

"আচ্ছা, তাহ'লে চলি। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।"

দ্বিজেনবাবু চলে' গেলেন।

আজবলাল আড়ালে এতক্ষণ 'টাইম-বমে'র মতো চুপ করে' ছিল। দ্বিজেনবাবু চলে' যাবার পর বিস্ফোরণ হ'ল।

"মালতী দিদি চলে' যাবার পর থেকে আপনি বাবু শরীরের উপর বড়ই জুলুম লাগিয়েছেন। আমাকে শেষে জবাবদিহিতে পড়তে হবে।"

"দাও, খাবার দাও—"

"চান করবেন না ? গরম জল তৈরি আছে—"

"না থাক।"

এতে অসন্তুষ্ট হ'ল আজবলাল। তার চোখ-দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত হ'ল। এই না-চান-করাটাও সে শরীরের উপর আর একটা জুলুম বলে' গণ্য করলে। কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না আর। হন হন করে' ভিতরের দিকে চলে' গেল।

খেতে বসে' সদাশিব তাই লক্ষ্য করলেন, মালতী চলে' যাওয়ার পর থেকে যা রোজই লক্ষ্য করছেন। আজবলাল অনেকরকম রান্না করেছে,—মাছ, মাংস, লাউ, কুমড়ো, আলুর দম, শুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা, অম্বল কিছু বাদ দেয়নি। তার চেষ্টা মালতীর অভাবে তিনি যেন কষ্ট না পান। আজবলাল রাঁধে ভালো, কেবল তার মসলার হাতটা একটু বেশী। সে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে কোন্ তরিকারিটা কেমন হয়েছে।

"মাংস সিদ্ধ হয়েছে তো বাবু? আজ মাংসটা খুব কচি ছিল না।"

"বেশ হয়েছে মাংস। খুব নরম হ'য়ে গেছে—"

"মাছের ঝালটা দেখুন তো, দিদিমণির মতো পেরেছি কি—"

"চমৎকার হয়েছে···"

প্রতিটি জিনিসের প্রশংসা না করলে আজবলাল মনে মনে দুঃখিত হয়। একবার খুব ঝাল হয়েছিল বলে' মাংসের বাটিটা সদাশিব ঠেলে দিয়েছিলেন, খাননি। আজবলালও খায়নি সেদিন। শুধু তাই নয় তার পরদিন এসে বলেছিল—"আমি বুড়ো হয়েছি বাবু, সত্যিই আর রাঁধতে পারি না। আমাকে এবার ছুটি দিন।"

সদাশিব শুধু একটা কথা বলেছিলেন—"মালতী চলে' গেছে, সোহাগ চলে' গেছে, তুমি যাবে? যেতে চাও যাও। ওদের আটকাইনি, তোমাকেও আটকাব না।"

আজবলাল আর যায়নি। শুধু সে যায় নাই তাই নয়, তারপর থেকে অপ্রত্যাশিত একটা পরিবর্তন ঘটেছে তার চরিত্রে। বহুদিনের কু-সংস্কার সে বর্জন করেছে। আজবলাল মুরগির মাংস ছুঁতো না। মুরগির মাংস মালতী রাঁধত আলাদা উনুনে। মালতী চলে' যাওয়ার পর মাঝে মাঝে বাবুর্চি আনিয়ে সদাশিব মুরগি রান্না করেছেন। হঠাৎ আজবলাল একদিন বললে—"বাবুর্চিকে ডাকবার দরকার নেই। আমিই পাখী রেঁধে দেব। রেঁধে না হয় চান করে' নেব। রোজ রোজ আপনার খাসির মাংস খাওয়ার দরকার নেই। মুরগি খেলে যখন ভালো থাকেন, আমি রেঁধে দেব—"

তারপর থেকে আজবলাল রোজ মুরগি রাঁধছে।

খেতে খেতে সদাশিব জিগ্যেস করলেন, "মহেন্দ্রবাবুর খাবার রোজ পাঠাচ্ছ তো?"

"হ্যাঁ। ছানা পাঠাই রোজ আধসের দুধের। উনি বলে' পাঠিয়েছেন ওঁর জন্যে আলাদা করে' ছোট মাছ মাঠাবার দরকার নেই। বাড়িতে যা রান্না হয় তাই পাঠাইলেই চলবে। ওঁকে মাছ মাংস সবই দিই—"

মহেন্দ্রবাবু মানে সেই 'হিপো' যাঁকে একদিন সদাশিব বেছে বেছে চারটি ছোট মাছ কিনতে দেখেছিলেন। এখন তিনি সদাশিবের চিকিৎসাধীন আছেন। সদাশিব তাঁকে আর বাজার করতে দেন না, আজবলালকে বলে' দিয়েছেন তাঁকে যেন খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সদাশিবের মনে হ'ল অনেকদিন তাঁর খবর নেওয়া হয়নি। কেমন আছেন ভদ্রলোক কে জানে!

এগারো

খুব ভোরে সদাশিব বাড়ির সামনে 'লনে' চুপ করে' বসে' থাকেন। কিছু করেন না, কেবল পা দোলান আর বসে' বসে' চেয়ে দেখেন চারদিকে। পাখী, ফুল, গাছ, আকাশ,—চিরপুরাতন তাঁর এই সঙ্গীরা নিত্য-নূতন আনন্দ দেয় তাঁকে। লনে বসেই চা খান এবং চা খাওয়ার পরও চুপ করে' বসে' থাকেন তাঁর ড্রাইভার আলী যতক্ষণ না আসে। আলী এলেই বেরিয়ে যান তিনি।

সেদিন ভোরে ছিপলী এসেছিল, কিছু মাছ আর তার স্বামীকে নিয়ে। সদাশিব দেখলেন ছিপলীর স্বামীর হুকওয়ার্মের চিকিৎসা করে' স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছে। আগে চোখ মুখ বিবর্ণ ছিল, এখন একটু রক্তের আভাস দেখা দিয়েছে। ছিপলী কিন্তু বললে, ওর 'তাগত' নেই কিছু। হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন সদাশিব। ছিপলীকে বললেন, "তুই মাছগুলো নিয়ে বাড়ির ভেতরে যা। আমি দেখছি একে। আজবলালের কাছ থেকে বঁটি নিয়ে মাছগুলো বেছে দিগে যা।"

ছিপলীর স্বামীকে মৃদুকণ্ঠে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন সদাশিব। ছিপলীর স্বামী অপ্রতিভ মুখে কাঁচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সত্য কথা বলল। লোকটা পারুষ্য-হীন। পূর্ণ যুবতী হাস্যমুখী ছিপলীর ঢলঢলে চেহারাটা ফুটে উঠল সদাশিবের মানসপটে।

www.boiRboi.blogspot.com

"নাম কি তোমার—"

"জিতু—"

"তোমার যে অসুখ হয়েছে তা তো বাপু চট্ করে' সারবে না। এর জন্যে যে-সব ইন্‌জেক্‌শন নিতে হবে তার দামও অনেক। তুমি কি পারবে?"

"ঘটি বাটি বন্ধক দিয়ে টাকা যোগাড় করতে হবে। কত টাকা লাগবে—?"

"আমি ওষুধের নাম লিখে দেব। তুমি দোকানে গিয়ে খোঁজ কর, কত দাম লাগবে—"

"আচ্ছা যদি অসুখ সেরে যায় তাহ'লে আমি যেমন করে' হোক ওষুধের দাম জোটাব—"

"আচ্ছা তুমি বস। আমি ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছি। ছিপলী আসুক—"

জিতু একধারে বিমর্ষ মুখে বসে' রইল। সদাশিবও একটু দ্বিধায় পড়ে' গেলেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় এ অসুখ প্রায় দুরারোগ্য। ওষুধও দুর্মূল্য। এ অবস্থায় এই গরীব লোকটাকে কি এত খরচের মধ্যে ফেলা উচিত হবে?

ছিপলী একটু পরে বেরিয়ে এল।

তাকে স্পষ্ট কথাই বললেন সদাশিব—"তোর স্বামীর যা হয়েছে তা প্রায় সারে না। একরকম ইন্‌জেক্‌শন আছে, তাতে কিছু উপকার হ'তেও পারে, না-ও হ'তে পারে। তোমরা যদি সে ইন্‌জেক্‌শন কিনতে পারো, তাহ'লে উলফৎ সে ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে দেবে, পয়সা নেবে না। ওষুধটা কিন্তু কিনতে হবে। আমার কাছে নেই—"

"বেশ, লিখে দিন কিনে নেব—"

ওষুধের প্রেসক্রপশন নিয়ে ছিপলী আর তার স্বামী চলে' গেল।

ওরা চলে' যাবার পর সদাশিব ভাবতে লাগলেন। জিতুর অসুখ যদি না সারে, তাহ'লে কি হবে? আইনতঃ ছিপলী তার স্বামীকে ত্যাগ করে' অন্য বিবাহ করতে পারে। কিন্তু ছিপলী কি তা করবে? মনে হয় ওর স্বামীকে ও ভালবাসে। দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে বলেই সব ভালবাসা উবে যাবে? কেবল আইন বা শাস্ত্র মেনে চললেই কি মানুষ সুখী হয়? কি জানি ওর কিসে সুখ হবে।

বহুদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ল। ভবদেববাবুর স্ত্রী সাবিত্রীর কথা। ভবদেববাবুরও কোনও পারুষ্য ছিল না। সাবিত্রী দেবী সাবিত্রী নামের মর্যাদা রাখতে পারেননি। অনেক প্রণয়ী ছিল তাঁর। ভবদেববাবুও

জানতেন একথা, কিন্তু কিছু বলতেন না। স্ত্রীকে ভয় করতেন তিনি, সর্বদাই যেন তাঁর কাছে অপরাধী হ'য়ে থাকতেন। আড়ালে সকলেই ভবদেববাবুকে নিয়ে পরিহাস করতেন। নিজে এরকম হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলার চেয়ে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা ঢের ভালো।

আজবলাল চা নিয়ে এল।

চায়ের টেবিল সাজিয়ে দিয়ে সে কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল একধারে।

"তুমি যাও, আমি নিজে ছেঁকে নেব—"

"একটা কথা ছিল বাবু। আমি মাসখানেকের জন্যে বাড়ি যেতে যাই। দেশে আমাদের কিছু জমি আছে, আমার ভাইপোটাই এতদিন সব দেখাশোনা করত। কিন্তু সে পুলিসের চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে' গেছে, বাড়িতে কেউ নেই, আমি একবার বাড়ি না গেলে সব বরবাদ হ'য়ে যাবে। আমি রামলক্ষ্মণ ঠাকুরকে বলেছি, এখানে এসে কাজ করবে।"

"এখান থেকে যদি কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও কোনও ব্যবস্থা হ'তে পারে না?"

"শুধু টাকা পাঠালে কিছু হবে না। আমাকে নিজে যেতে হবে। জমি-গুলো ভাগে বন্দোবস্ত করে' দিয়ে আসব। যাবার সময় আমাকে কিছু টাকাও নিয়ে যেতে হবে।"

সদাশিব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে' রইলেন।

তারপর বললেন, "বেশ—"

চা খেয়ে সদাশিব চুপ করে' বসে' রইলেন। কাগজওলা কাগজ দিয়ে গেল। আলী এসে সেলাম করে' গাড়ির চাবি নিয়ে গাড়ি বার করল। সদাশিব চুপ করে' বসে' রইলেন। সোহাগ গেছে, মালতী গেছে, আজ আজবলালও চলল। ও বলছে বটে ফিরে আসবে, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ফিরবে না। দেশে ওর ভাইপো ছিল বলেই এতদিন ও একটানা এখানে থাকতে পেরেছিল। আর থাকবে না। হঠাৎ যেন তিনি চমকে উঠলেন। মনে হ'ল মনু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। পরমুহূর্তেই কিন্তু আর দেখতে পেলেন না। চোখের ভুল? কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেলেন যেন! অনেকক্ষণ নির্বাক হ'য়ে বসে' রইলেন তিনি। তারপর তাঁর সমস্ত হৃদয় অদ্ভুত একটা সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল। তাঁর বিশ্বাস হ'ল আর কেউ না থাক মনু তাঁর কাছাকাছি আছে এবং চিরকাল থাকবে।

বারো

নবীগঞ্জের হাটের কাছে সেই বড় দীঘিটার ধারে চেয়ার টেবিল পেতে বসেছিলেন সদাশিব। দীঘির ধারে জগদীশ কুঁজড়ার বাড়ি। অপারেশন করবার পর জগদীশ ভালো হ'য়ে গেছে। আজবলাল চলে' যাওয়ার পর থেকে তিনি দুপুরে আর বাড়িতে খেতে যান না। আলীর সহায়তায় বাইরের কোথাও না কোথাও রান্না করে' নেন। আলীও রাঁধে ভালো। তাছাড়া যেখানে রান্না করা হয় সেখানে আশেপাশে তাঁর চেনা রোগী থাকেই। তারাও এসে আলীকে সাহায্য করে। সেদিন জগদীশের বউ ছেলেমেয়েরা আলীর সহকারী হয়েছিল। কেউ মসলা বেটে দিচ্ছে, কেউ জল তুলে আনছে, কেউ তরকারি কুটে দিচ্ছে। নতুন-ধরনের এক যাযাবর জীবন যাপন করছেন সদাশিব। রোজই কোথাও না কোথাও যেন পিক্‌নিক্ হচ্ছে।

সদাশিব ডায়েরি লিখছিলেন।

"আজবলাল আর ফেরেনি। লিখেছে তার জমি নিয়ে বড্ড বেশী জড়িয়ে পড়েছে, তার এক জ্ঞাতি নাকি তার সঙ্গে মকদ্দমা করছে জমির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে। লিখেছে মকদ্দমা শেষ হ'লেই ফিরে আসবে। আমি জানি আসবে না। জমির মকদ্দমা সহজে মেটে না।

"মালতীর খবরও পাই মাঝে মাঝে। উত্তরপ্রদেশের তীর্থগুলি একে একে দেখে বেড়াচ্ছে। কোন কোন জায়গায় থেকেও যাচ্ছে বেশ কিছুদিন। চিরঞ্জীব লিখেছে মালতী অনেক ভালো আছে। 'ফিট্' আর হয়নি। মালতী নাকি প্রত্যেক তীর্থস্থানে গিয়ে মন্দিরেই অধিকাংশ সময় কাটায়। চিরঞ্জীব একটু মুশকিলে পড়েছে। তার ধর্মে তেমন মতি নেই। লিখেছে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলো আবার পড়তে শুরু করেছি। আরও লিখেছে—টাকা যদি বাঁচে কাশ্মীরটা দেখে আসবার ইচ্ছে আছে। আমি তাকে লিখে দিলাম, টাকার জন্যে ভেবো না, কাশ্মীর বেড়িয়ে এস। যারা যেখানে থেকে সুখী থাকে থাক। আমার জন্যে কেউ যেন কষ্ট না পায়।

"সোহাগরাও বোধ হয় শেষ পর্যন্ত বিলেতেই থাকবে। লিখেছে বছরে একবার আমার সঙ্গে এসে দেখা করে' যাবে। প্লেনে আসতে-যেতে বেশী সময় লাগবে না। আসে যদি ভালোই, না-ও যদি আসে তাতেই বা ক্ষতি কি! কারো জন্যে কিছু আটকায় না। ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ছে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে একটা ঝুমকোলতা ছিল। বাঁশের একটা মাচার

www.boiRboi.blogspot.com

উপর ভর করে' অজস্র ফুল ফোটাত সে। একদিন ঝড় হ'য়ে তার মাচাটা পড়ে' গেল। নূতন মাচা আর কেউ দিলে না তাকে। লতাটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে' রইল দু'চারদিন। পাশেই ঝোপঝাড় ছিল কতকগুলো বুনো গাছের। লতাটা ক্রমশঃ সেই দিকে তার ডালপালা বিস্তার করতে লাগল। বছরখানেক পরে কলেজের একটা ছুটিতে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম, দেখি ভাঙা মাচাটা অন্তর্ধান করেছে, কিন্তু ঝুমকোলতাটা সগৌরবে বেঁচে আছে তখনও। পাশের ঝোপটা আশ্রয় করেই অজস্র ফুল ফোটাচ্ছে। ঝোপেঝাড়ে খ্যাতিহীন অন্য ফুলও ফুটেছে অনেক। অনেক বুনো-লতাও জড়িয়ে গেছে ঝুমকোলতাটার সঙ্গে। তাদেরও ফুল ফুটেছে। তাদের দলে ঝুমকোলতাকে কিছু বেমানান মনে হয়নি। মাচার আশ্রয় হারিয়ে ঝুমকোলতা মরে' যায়নি, নূতন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে, সেইখানেই সার্থক করেছে নিজেকে।

"আমার জীবনের মাচাও বার বার বদলেছে। বার বার বদলির চাকরি করেছি, আজ-এখানে-কাল-ওখানে করেই কেটেছে জীবনের বেশীর ভাগ। পুরাতনকে ছেড়ে নূতনের কাছে বার বার গেছি, তার সঙ্গে নূতন বন্ধনে বাঁধা পড়েছি, পুরাতন বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়েছে। সেই নূতনও পুরাতনে বিলীন হয়েছে আবার, তাকে আঁকড়ে বেশী দিন থাকতে পারিনি। এর নামই জীবন। আমার জীবনের মঞ্চে যাদের স্থায়ী সম্পদ বলে' মনে হয়েছিল, আজ দেখছি তারাও একে একে সরে' গেছে। চিরঞ্জীব, মালতী, সোহাগ আজ কোথায়? মনু অনেক আগেই চলে' গেছে। সেদিন সকালে তার যে আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেটা বোধ হয় আমার অবচেতন মনেরই সৃষ্টি। আমার যে কামনা মনের নিগূঢ় লোকে বসে' তাকে চাইছে, সেই কামনাই হয়তো মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল সেদিন। কই, আর তো তাকে কোনদিন দেখিনি। ওদের চিন্তা, ওদের সুখদুঃখ আগে আমাকে বিচলিত করত, এখন তো আর করে না। আমার গাড়ি ওদের স্টেশন ছেড়ে চলে এসেছে। এখন নূতন স্টেশনে নূতন লোকের ভিড়। মন তাদের নিয়েই ব্যাপৃত আছে। আজ কেব্‌লী, ছিপলী, গীতা, জগদীশ এদের সুখদুঃখেই আমি বেশী আন্দোলিত।

"কেব্‌লীর স্বামী নারাণ আমাকে এড়িয়ে চলছে। দেখা হবেই কোথাও-না-কোথাও। আলীকে বলেছি তাকে খবর দিতে। ছিপলীর স্বামী জিতু ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে ভালো আছে বলছে। আমার কিন্তু মনে হয় না ও সেরে যাবে। যদি কিছু উপকার হ'য়ে থাকে সেটা সাময়িক। ছিপলীর হাতে

রুপোর খাড়ু ছিল, এখন সেগুলো নেই দেখছি। সম্ভবতঃ ওষুধ কেনবার জন্য সেগুলো বেচে দিয়েছে। আমি ওকে বলেছিলাম আমি ওষুধ কিনে দিচ্ছি, তুই পরে টাকা দিয়ে দিস। কিন্তু ছিপলী তাতে রাজী হয়নি। বলেছিল, টাকার বন্দোবস্ত আমরা করেছি।

"আশ্চর্য মেয়ে এই ছিপলী। সদা হাস্যমুখী, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। চালচলন দেখে মনে হয় ভ্রষ্টা নয়। ওর সঙ্গে হাসিঠাট্টা অনেকে করে বটে, কিন্তু মনে হয় তার বেশী আর কেউ অগ্রসর হ'তে পারে না। ছবিলাল মোড়লের ছেলে একদিন বাজারে ওকে কি একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল। ছিপলী বঁটি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল তাকে। বলেছিল, তোর নাক কেটে দেব। তা ও পারে।

"গীতার সেই বাভন মহাজন সেদিন এসেছিল তার দলিলপত্র নিয়ে। দেখলুম গীতার স্বামী বহুদিন আগে দু'শ' টাকা নিয়েছিল। দু বছর ধরে' ওরা স্বামী-স্ত্রী ওর বাড়িতে বিনা বেতনে খেটেছে, কিন্তু ধার এখনও শোধ হয়নি। বাভন বলেছে এখনও দেড়শ' টাকা বাকি আছে। আমি আর ও নিয়ে কচলাকচলি না করে' টাকাটা দিয়েছি ওকে।

"গীতা বলেছে দুধ দিয়ে আর ঘুঁটে দিয়ে টাকাটা শোধ করে' দেবে। আমি তাতেই রাজী হয়েছি। আর একটা প্রস্তাব করেছিল গীতা, আমি তাতে রাজী হইনি। সে বলেছিল, মালতী দিদি তো এখন নেই, তিনি যতদিন না আসবেন আমি আপনার বাড়ীতে কাজকর্ম করে' দেব। বাড়ীতে কোনও মেয়েছেলে নেই, আপনার হয়তো কষ্ট হচ্ছে। এ প্রস্তাবে রাজী হইনি আমি। এমনই তো আমার নামে নানারকম নিন্দা রটিয়ে থাকেন আমার তথাকথিত বন্ধুরা। গীতার মতো এক রূপসী যুবতী যদি আমার বাড়ীতে ঘুরঘুর করে তাহ'লে তো খই ফুটবে সকলের মুখে।

"...এদের কেন্দ্র করেই নূতন জীবন গড়ে' উঠেছে আবার। বাঁচবই বা আর ক'দিন? শমনের নোটিশ এসে গেছে। ইউরিনে অ্যালবুমেন দেখা দিয়েছে, ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে। এর চিকিৎসা হচ্ছে সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে হিন্দুবিধবার আহার খেয়ে জড়ভরতের মতো পড়ে' থাকা। তা আমি পারব না। জীবন্মৃত হয়ে থাকার চেয়ে মরে' যাওয়া ঢের ভালো। মরে' না গিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে থাকলে অবশ্য শোচনীয় ব্যাপার হবে সেটা। কিন্তু যারা খুব নিয়মে থেকেছে এরকম লোকেরও তো পক্ষাঘাত হ'তে দেখেছি..."

সদাশিবের লেখায় বাধা পড়ল।

জগদীশের ছোট মেয়ে ফুদিয়া ছুটে এসে জিগ্যেস করলে, "মা ঠেকুয়া বানিয়েছে, খাবেন ?"

"নিশ্চয় খাব। তবে একটার বেশী নয়—"

সুসংবাদ বহন করে' ছুটে চলে' গেল ফুদিয়া।

ডাক্তারবাবু তাদের বাড়ির তৈরি ঠেকুয়া খাবেন এটা যেন একটা আশাতীত ব্যাপার।

আলী এসে চুপি চুপি বললে—"হুজুর, খানা তো পক্ গিয়া। আভি খাইয়ে গা ?"

"একটু পরে খাব—"

"তব্ হম্ নারাণকো পকড়কে লে আবেঁ ?"

"নারণকে কোথা পাবে এখানে ?"

"বহ্ দেখিয়ে, খাপরা ছা রহা হ্যায়—"

আলী একটু ঝুঁকে ডানহাতের তর্জনী-মধ্যমা একত্র করে' দুটো গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখাতে লাগল। সদাশিব দেখতে পেলেন একটা খাপরার ঘর ছাওয়া হচ্ছে।

"ডেকে নিয়ে এস—"

আলী চলে' গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইক করে' এসে হাজির হল ফালতু।

কমলের কারখানার অ্যাপ্রেন্টিস্।

"হুজুর, মুর্গ মসল্লম্ ভেজ্ দিহিন কমলবাবু—"

কমলের একটা চিঠিও ছিল।

"ডাক্তারবাবু, আপনার জন্যে একটা মুর্গ মসল্লম্ পাঠালাম। আপনি খেলে বিশেষ আনন্দিত হব। ফালতুকে বলেছি আপনি যেখানেই থাকুন সে আপনাকে খুঁজে গিয়ে দিয়ে আসবে—"

"তুই কি করে' খোঁজ পেলি যে আমি এখানে আছি ?"

"উলকৎ বললে—"

ফালতুর বুদ্ধি দেখে প্রীত হলেন সদাশিব। তাঁর দৈনন্দিন গতিবিধি যে উলকৎই জানে একথা ফালতু কি করে' জানল ? খুশী হলেন সদাশিব। ফরসা লম্বা কিশোর ছেলেটির মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন। ফালতুরও

চোখের দৃষ্টি হাস্য-প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল। সদাশিব পকেট থেকে একটা টাকা বার করে' দিতে গেলেন তাকে।

"নেহি হুজুর—"

সেলাম করে' সরে' দাঁড়াল সে মুচকি হাসতে হাসতে। তারপর গাড়িটার কাছে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

"পিছে কা চাক্কা মে হাওয়া নেহি হ্যায়!"

"পাম্প করে' দাও—"

"আনী কাঁহা।"

"সে আসছে এখুনি। সে এসে পাম্প বের করে' দেবে। তুই এখানেই খেয়ে যা—

ফালতু হেসে একবার চাইলে তাঁর দিকে, যেন এমনই একটা কিছু প্রত্যাশা করছিল সে। তারপর সে গাড়িটাকেই প্রদক্ষিণ করে' ঘুরতে লাগল; যদি আরও কিছু গলদ চোখে পড়ে। হঠাৎ সদাশিব লক্ষ্য করলেন তার কামিজটা বড্ড ছেঁড়া। পিঠের মাঝামাঝি লম্বালম্বি ছিঁড়ে গেছে। তিনি একটা কাগজে একটা চিঠি লিখে ফালতুকে বললেন—"তুই যখন ফিরে যাবি তখন বাজারে হরিকিষুণবাবুর দোকানে এই চিঠিটা দিয়ে দিস—"

"কাপ্‌ড়াকা দোকান যিন্‌কা হ্যায়?"

"হাঁ—"

সদাশিব হরিকিষুণবাবুকে লিখে দিয়েছিলেন ফালতুকে ফালতুর গায়ের মাপে একটা কামিজ তিনি যেন দিয়ে দেন। তিনি দাম পরে পাঠিয়ে দেবেন। ফালতুকে সে কথা আর বলবেন না। যদি না নেয়! ওদের আত্মসম্মানজ্ঞান খুব বেশী।

একটু পরেই আলীর সঙ্গে নারাণ এসে হাজির হ'ল। নারাণের রং নিকষ-কৃষ্ণ, শরীর বেশ বলিষ্ঠ। মনে হয় কষ্টিপাথর কুঁদে কোনও শিল্পী যেন সৃষ্টি করেছে ওকে। যেন একটা কাফ্রী অসুর। তার চলনে এবং দৃষ্টিতে একটা মার্জার-সুলভ ভাব আছে। এদিক-ওদিক চেয়ে ঈষৎ হেলে-দুলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলাফেরা করে, দেখলেই চোর না ডাকাত বলে' সন্দেহ হয়।

"কি নারাণ, শুনছি তুমি বিয়ে করতে চাইছ আবার—"

"জি হুজুর—"

নারাণ বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর দিলে।

"কেব্‌লী তো আছে, আবার বিয়ে কেন—"

"ভিতর মে বাত্‌ ছে হুজুর—"

ছেকা-ছিনি ভাষায় আলাপ হ'ল। তার মর্মার্থ এই—

"ভিতরে আবার কি কথা আছে?"

"কেব্‌লীর যে ছেলেপিলে হয়নি। আমার বংশ লোপ পেয়ে যাবে যে—"

"কিন্তু এতে কেব্‌লীর মনে কষ্ট হবে না?—"

"দুদিন কষ্ট হবে। তারপর ঠিক হ'য়ে যাবে। আমাদের সমাজে তো এরকম আখছার হচ্ছে। তাছাড়া আর একটা কথা আছে। আমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি সে বিধবা। তার আগেকার স্বামীর জমি ও পেয়েছে। তাই ওর বাবা বলেছে যে কেব্‌লীকে ও দু'বিঘে জমি লেখাপড়া করে' দিয়ে দেবে। এতে কেব্‌লীর আখেরে সুবিধে হবে কত।"

"কিন্তু তোমার বদলে দু'বিঘে জমি পেলে কি কেব্‌লী সুখী হবে? হবে না। ও তোমাকে খুব ভালবাসে। এটা জেনে রেখ ওর জন্যেই তুমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছ। ওর মনে কষ্ট দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? আর ছেলে না-হওয়ার কারণ যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাহ'লে হাজারটা বিয়ে করলেও তোমার ছেলে হবে না—"

চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল নারাণ।

তারপর বলল, "আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব—"

"হ্যাঁ, আর একটা কথা শোন। কেব্‌লীকে তুমি মারধোর করেছ কেন?"

নারাণের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

"না, মারব কেন। মারিনি তো। আমি কিচ্ছু করিনি।"

"কিন্তু ওর মাথায় রক্ত দেখলাম যে—"

"ও মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে নিজেই রক্ত বার করেছে কপাল থেকে। আমি কি করব!"

"তাই নাকি!"

কেব্‌লী-চরিত্রের আর একটা দিক সহসা প্রতিভাত হ'ল সদাশিবের কাছে। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন কেব্‌লী নারাণকে কতটা ভালবাসে। তাঁর ভয় হ'ল নারাণ বিয়ে করলে কেব্‌লী আত্মহত্যা করে' বসবে না তো?

"আমি এবার কাজে যাই হুজুর?"

"যাও। কথাটা ভেবে দেখো—"

"জি হুজুর।"

কিন্তু নারাণের মুখভাব দেখে সদাশিবের মনে হ'ল ও বিয়ে করবেই।

"খানা ঠাণ্ডা হো রহা হুজুর—"

ফিসকিস করে' আলী এসে বললে।

"হ্যাঁ, এবার খেতে দাও—"

আলী প্লেট সাজাতে লাগল।

জগদীশের দুই ছেলে এক মেয়েও খেতে বসল। ফালতুও। একটু পরে জগদীশ এসে বসল একধারে।

"আমাকে আর কতদিন ঘরে বসিয়ে রাখবেন ডাক্তারবাবু, আমি তো ভালো হ'য়ে গেছি। হাটে না গেলে পেট চালাব কি করে'?"

"তোমার বউ হাটে যাক না—"

"ও বড় সরমিলা (লাজুক), কোথাও যেতে চায় না। যাওয়াও মুশকিল। আজকালকার ছোঁড়াগুলো বড় পাজি। রাস্তায় জোয়ান মেয়ে দেখলেই পিছু নেয়—"

"আর সাতটা দিন কোনরকম করে' কাটিয়ে দাও। অতবড় অপারেশন হয়েছে, ভারী ভারী মোট তোলা এখন চলবে না—"

জগদীশ চুপ করে' রইল।

"আর কাউকে বলো না, তোমার তরি-তরিকারিগুলো নিয়ে বেচে দিক—"

"বিরজু নিয়ে যায়। কিন্তু হিসেব ঠিক দেয় না। সেদিন কুড়িটা কদ্দু (লাউ) বিক্রি করে' মাত্র আড়াই টাকা এনেছে। চার আনার কম কি কোন কদ্দু বিক্রি হয়? অথচ ওকে কিছু বলা যায় না, গোতিয়া (জ্ঞাতি)—"

"আর সাতটা দিন কাটিয়ে দাও কোনরকমে।"

সদাশিব যে এখানে এসে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তার একটা কারণ, তিনি এখানে খেলে ওরাও খেতে পাবে। সে কথাটা প্রকাশ্যে ওদের বলেননি। কিন্তু আলীকে গোপনে বলে' দিয়েছেন। আলী বেশী বেশী করে' রান্না করেছে। পাছে ছোঁয়া যায় বলে' ভাত-ডালটা জগদীশের বউই নাবিয়ে দিয়েছে। কিছু নটে' শাক সে সকালবেলাই তুলে রেখেছিল তাই ভেজেছে, আর লাউয়ের তরকারি করেছে একটা। ডাল আর আচার সহযোগে এই এদের কাছে রাজভোগ। ডাল-ভাতই প্রচুর পরিমাণে জোটানো শক্ত, রোজ জোটে না। সদাশিব ক'দিন থেকে এখানে খাচ্ছেন বলে' পেট ভরে' খেতে পাচ্ছে ওরা।

www.banglabooks.blogspot.com

…খাওয়া-দাওয়ার পর গাছতলায় ইজিচেয়ারটা পেতে শুয়ে পড়লেন সদাশিব। বরাবর দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর শোয়া অভ্যাস। এই সেদিন পর্যন্ত পালঙ্কের উপর শুভ্র বিছানায় ইলেকট্রিক পাখার তলায় ঘুমিয়েছেন। ইচ্ছে করলে এখনও ঘুমুতে পারেন। কিন্তু এখন আর ইচ্ছে করে না। গাছ-তলায় খোলা হাওয়ায় ফোল্ডিং ক্যাম্প-চেয়ারে শুয়েই বেশী আনন্দ পান এখন। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন মনু এসেছে। হেসে বলছে, কাশী গিয়েছিলাম, খুব ভালো জর্দা এনেছি। ঘুমটা ভেঙে গেল। মনু যে জর্দা খেত একথা তাঁর মনেই ছিল না।

তেরো

নবীপুর হাটে সদাশিব সেদিন একটা নাটকীয় কাণ্ড করে' বসলেন। ডাক্তারি-বিদ্যার প্রয়োগ হিসাবে তাতে অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না। কিন্তু হাটসুদ্ধ লোক চমৎকৃত হ'য়ে গেল, হাট ভেঙে যাবার উপক্রম হ'ল প্রায়। সবাই রাধাকিষুণ বাবাজিকে ঘিরে দাঁড়াল এসে। লোকটির নাম রাধাকিষুণ নয়, মঙ্গলদাস। কিন্তু সকলেই তাকে রাধাকিষুণ বলে' ডাকে, কারণ রাধাকিষুণ বললে সে ক্ষেপে যায়। প্রকাণ্ড একটা টিকি আছে মঙ্গলদাসের। রাস্তায় বেরুলেই ছেলের দল তার পিছনে লাগে—'টিক্‌কি মে রাধাকিষুণ', 'টিক্‌কি মে রাধাকিষুণ'—বলতে বলতে ছোটে পিছু-পিছু। মঙ্গলদাস দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে যায় তাদের। তারা হৈ হৈ করে' হাসতে হাসতে হুড়দাড় করে' ছুটে পালায়। এ খেলা অনেকদিন থেকে চলছে। অনেকে বলে, ওই তেড়ে যাওয়াটা মঙ্গল-দাসের মেকি রাগ-দেখানো, আসলে ও ছেলেদের মুখে রাধাকিষুণ নামটা শুনতেই চায় বার বার। বাইরে সে কালীসাধক। টিকিতে জবাফুল বাঁধা থাকে। কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। লোকে বলে মঙ্গলদাস খুব চালাক লোক। বাইরে সে কালীপুজা করে, আবার ছেলেদের মুখ থেকে রাধাকৃষ্ণের নামটাও শুনে নেয়। গাছেরও খায় তলারও কুড়োয়।

ইদানীং কিছুদিন থেকে মঙ্গলদাসকে আর পথে-ঘাটে দেখা যাচ্ছিল না। কারণ সে একটি সাধক-সঙ্গিনী জুটিয়ে কামরূপে গিয়ে সাধনা করছিল নাকি। কিন্তু সেখানে আর একটি বেশী শক্তিশালী সাধক ছিলেন। মঙ্গলদাসের সাধন-সঙ্গিনী তাঁর খপ্‌পরে গিয়ে পড়ল। মঙ্গলদাস হতাশ হ'য়ে ফিরে এসেছে দিন-

কয়েক আগে। শুধু যে সাধক-সঙ্গিনীকে হারিয়েছে তা নয়, স্বাস্থ্যটিকেও হারিয়েছে। অতিরিক্ত 'কারণ' পান করার ফলে লিভারটি গেছে। প্রকাণ্ড উদরী হয়েছে এখন। সদাশিবের কাছে মঙ্গলদাস এসেছিল কয়েকদিন আগে। সদাশিব বলেছিলেন, এ রোগ সারবে না। তবে পেটের জলটা বার করে' দিলে কিছুদিন আরামে থাকবে। নবীপুরে মঙ্গলদাসের বাড়ি। সদাশিব হাটে এসে দেখলেন বিরাট পেট নিয়ে মঙ্গলদাস বসে' আছে।

"পানি নিকাল দিজিয়ে হুজুর। জান যা রহা হায়।"

সদাশিব বললেন, "আচ্ছা, একটা বালতি আনাও। কত জল বেরুবে সেটা দেখতে হবে।"

বালতি যোগাড় হ'য়ে গেল একটা। তারপর সদাশিব তার ব্লাডপ্রেসার আর নাড়ী দেখলেন। ধী-বিশাল পাণ্ডের দোকানে বড় চৌকো-গোছের টুল ছিল একটা। সেইটের উপর বসালেন মঙ্গলদাসকে। তারপর পেটের নিচের দিকে একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে অসাড় করে' দিলেন জায়গাটাকে। তারপর পট্ করে' মোটা একটা ট্রোকার দিয়ে ছ্যাঁদা করে দিলেন। পিচকিরির মতো জল বেরুতে লাগল আর পড়তে লাগল বালতিতে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে' গেল চারদিকে। সে এক হৈ হৈ কাণ্ড!

মঙ্গলদাস চোখ বুজে বসে' ছিল।

হঠাৎ সে চোখ খুলে বললে—"নাম শুনাও। বিরিঞ্চিয়াকে খবর দেও।"

একটু পরে বিরিঞ্চিয়ার দলবল খোল মাদল আর খঞ্জন নিয়ে এসে হাজির হ'য়ে নাম শোনাতে লাগল মঙ্গলদাসকে। "জে জে রাধা, জে জে কিষুণ, জে জে রাধা, জে জে কিষুণ"—জে জে মানে জয় জয়। সদাশিব বাধা দিলেন না, উপভোগ করতে লাগলেন।

সদাশিবের একটু পরে চোখে পড়ল ভিড়ের মধ্যে ছিপলীও দাঁড়িয়ে আছে। আর ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে তিনটে বখা গোছের ছোঁড়া। প্রত্যেকেরই মাথায় বাহারে তেড়ি, চোখে রঙীন চশমা, পরনে হওয়াই শার্ট আর ঢিলে পা-জামা। কথায় কথায় ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে' হাসছে।

ওদের মধ্যে দু'জনকে চিনতে পারলেন সদাশিব।

একজন স্থানীয় এক ডাক্তারের ছেলে। জাতে সোনার বেনে। ঠাকুর্দা তেজারতি করে' বড়লোক। জমিদারি কিনেছে। এ ছোক্‌রার কলেজে নাম লেখানো আছে। প্রফেসারদের ঘুষ দিয়ে কিংবা হুমকি দিয়ে পরীক্ষা পাস করে'

www.boiRboi.blogspot.com

হায়। সেদিন দলবল নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে একটা দোকান লুঠ করেছে। পুলিশ এদের কিচ্ছু বলে না। সবাই টাকার বশীভূত।

দ্বিতীয় ছোক্‌রা ছবিলাল মোড়লের ছেলে। ছবিলাল একজন কংগ্রেস-অনুগৃহীত ব্যক্তি। সুতরাং ছেলেটি একটি অকুতোভয় গুণ্ডা। এর প্রধান কাজ হচ্ছে পরের পাঁঠা চুরি করে' খাওয়া। গরীব মানুষেরা প্রায়ই ছাগল পোষে, ছাগলের বাচ্চা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। এ ছোক্‌রা সুবিধে পেলেই গ্রাস করে সেগুলি। ওদের পাড়ার গরীব লোকেরা অস্থির হ'য়ে উঠেছে ওর জ্বালায়। অথচ ভয়ে মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারে না। পুলিশ ওদের সহায়।

তৃতীয় ছোক্‌রাটিকে সদাশিব চিনতে পারলেন না।

ওরা খুব সম্ভবতঃ ছিপলীকে নিয়েই হাসাহাসি করছিল। ছিপলীর কুঞ্চিত ভ্রূ এবং অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি দেখে তাই অনুমান করলেন সদাশিব। ছিপলী ভিড় ঠেলে ঠেলে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল, শেষে তাঁর চেয়ারের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল। হো হো করে' হেসে উঠল ছোক্‌রা তিনটে।

একজন বলে' বসল—"বুড্‌ঢার কাছে গিয়ে কি মজা পাবে সহেলি—!"

ছিপলীর মুখ লাল হ'য়ে উঠল। সদাশিব গম্ভীর হ'য়ে বসে' রইলেন। তারপর উঠে মঙ্গলদাসের কাছে গেলেন। অনেক জল বেরিয়েছিল। ট্রোকারের ক্যানুলাটা বার করে' নিয়ে বেন্‌জোইন্ দিয়ে সিল করে' দিলেন জায়গাটা।

সেই ছোক্‌রা তিনজন এগিয়ে এল এবং ছিপলীর উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে' সদাশিবকে বাংলায় জিগ্যেস করতে লাগল—"শিলাই করে' দিলেন না কি—"

সদাশিব আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না।

"নিকল্ যাও হিয়াঁসে—"

"নিকল্ যায়েঙ্গে! হাটিয়ামে তো সব কোইকো equal right হ্যায়—"

সদাশিব জনতার দিকে চেয়ে বললেন—"নিকল্ দেও এই তিন ছোক্‌রা কো—"

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে উঠল সবাই এবং 'মার' 'মার' শব্দে তেড়ে গেল তাদের। দেখতে দেখতে দাঙ্গা বেধে গেল একটা। প্রচণ্ড মার খেলে ছোক্‌রা তিনটি। চুলের ঝুঁটি ধরে' টানতে টানতে বার করে' দিল তাদের হাট থেকে। ধী-বিশাল পাণ্ডে একটু ভয় পেয়ে গেল। সদাশিবকে বললে, "ও তিনটেই হারামি

ডাক্তারবাবু। ওদের ঘেঁটিয়ে ভালো করলেন না। আমার দোকানেই ব্যাপারটা ঘটল, হয়তো কোনদিন আমাকে এসে বে-ইজ্জৎ করবে। লুটও করতে পারে—"

"কোনও ভই নেই। কি করবে ওরা। আমি এখনই থানায় ডায়েরি করে' দিচ্ছি। মঙ্গলদাস তুমি শুয়ে পড় এবার। কেমন লাগছে—"

অনেক হাল্‌কা লাগছে। বিরিঞ্চি ভাই, আউর থোড়া নাম শুনাও—'

দাঙ্গার গোলমালে কীর্তন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। আবার শুরু হ'য়ে গেল—"জে জে রাধা, জে জে কিষুণ—"

ধী-বিশাল পাণ্ডের 'ধী' কতটা বিশাল তা বলা শক্ত কিন্তু দেহটি যে বিশাল তাতে সন্দেহ নেই। বৃহৎ একটা ষাঁড়ের মতো চেহারা তার। সে নিজেই দোকানের বড় বড় চাল-ভরতি বোরাগুলোকে তুলে তুলে ভিতরের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। দুটো উদ্দেশ্য। প্রথম, এইখানে খাটিয়া বিছিয়ে মঙ্গলদাসের জন্য বিছানা করে' দেওয়া। দ্বিতীয়, চালের বোরাগুলোকে ভিতরে সরিয়ে রাখা। কি জানি যদি ও গুণ্ডার দল এসে পড়ে তাহ'লে চালের বোরা পেলে নয়-ছয় করে' দেবে সব। চালের বোরাগুলি ভিতরের ঘরে পুরে তাতে তালা লাগিয়ে ধী-বিশাল একটা দড়ির খাটিয়া নিয়ে এল পিছন দিক থেকে। একটা ডগমগে রঙের শতরঞ্চি বিছালো তার উপর। তারপর বালিশ আনল একটি। বালিশটির বিশেষত্ব, খুব ছোট এবং টাইট্‌। মনে হয় দম বন্ধ করে' আছে, এখনি বুঝি ফেটে বেরিয়ে পড়বে।

"ডাক্তারবাবু, মঙ্গলদাসজী এখানে কতক্ষণ থাকবে—"

"আজ দিনভোর থাক। সন্ধ্যের পর আস্তে আস্তে বাড়ি চলে' যাবে গাড়ী করে'।"

বিরিঞ্চি আর ধী-বিশাল মঙ্গলদাসকে ধরে' আস্তে আস্তে খাটিয়ায় শুইয়ে দিলে। মঙ্গলদাসের সঙ্গে বিরিঞ্চি বা ধী-বিশালের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যারা একথা জানে না, তাদের মনে হবে ওরাই এর পরমাত্মীয়।

সদাশিব নবীপুরের হাট থেকে সোজা থানায় চলে' গেলেন। যাবার সময় ছিপলীকেও নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে'।

www.boiRboi.blogspot.com

চোদ্দ

জিরাফ-প্রতিম সিংহেশ্বর সিং দারোগা সোচ্ছ্বাসে সংবর্ধনা করলেন সদাশিবকে।

"আইয়ে আইয়ে ডাক্‌টার সাহেব, কেয়া সৌভাগ্য। পধারিয়ে। আপকা কিরপাসে মুন্না তো একদম cured হো গয়া। আরে মুন্না, ডাক্‌টার সাহেবকো প্রণাম কর—"

একটা ফরসা কিশোর এসে লজ্জিতভাবে প্রণাম করল।

"ডাক্‌টার সাহেবকো কুছ্ নাশ্‌তা (জলখাবার) লা দেও—"

সদাশিব বললেন, "না, আমি এখন কিছু খাব না—"

"চায় ?"

"না। আমি যেজন্য এসেছি তা শুনুন।"

নবীপুর হাটের ঘটনা সব খুলে বললেন তাঁকে। তারপর বললেন, "ওই তিন ছোক্‌রার বিরুদ্ধে ডায়েরিতে লিখ নিন। এই ছিপলী মেয়েটাকে ওরা হাটে জ্বালাতন করছিল, হাটের সবাই দেখেছে। ওকে যা জিগ্যেস করতে চান করুন—"

সিংহেশ্বর গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। তারপর হিন্দীতে যা বললেন তার মর্ম হচ্ছে, "ও ছোক্‌রা তিনটে যে পাজি তা তো সুবিদিত। কিন্তু ওরা আঁটঘাট বেঁধে এমনভাবে বদমায়েশী করে যে ওদের ধরা-ছোঁয়া যায় না। আমরা যদি কিছু করতে যাই আমরাই বিপদে পড়ে' যাব। কারণ যাদের অধীনে আমরা চাকরি করি, যাদের হুকুম অনুসারে আমাদের চলতে হয়, তারা ওদের সপক্ষে। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আমি ডায়েরিতে লিখে নিচ্ছি। আপনি ব্যাপারটা এস. পি. এবং ডি. আই. জি.-র কানেও তুলে দিন। ওঁরা বড় অফিসার, ওঁরা ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারেন।" তারপর হেসে বললেন—"যা 'জমানা' (দিনকাল) পড়েছে তাতে ওঁরাও পারেন কিনা সন্দেহ। চাকরির মায়া তো সকলেরই আছে।"

দারোগা সাহেব ছিপলীকে আপিস-ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। তারপর যথারীতি ডায়েরিটা লিখে নিলেন।

...ছিপলীকে রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে সদাশিব গেলেন ডি. আই. জি.-র কাছে। যেতে যেতে তাঁর মনে হ'তে লাগল তিনি ডাক্তার, ডাক্তারি ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছুতে মাথা-গলাতে যাওয়াটা কি তাঁর উচিত হচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর

পেয়ে গেলেন নিজের মনের ভিতর থেকেই। বহুকাল আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটা লেখা পড়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, কেমিস্ট হ'য়েও তিনি কেন দেশের কাজে নেমেছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ্ Henry Moissau-এর একমাত্র পুত্র Louis বিশ্বমহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে মারা যান। তিনিও একজন রসায়নবিদ্ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র Laski-র বিখ্যাত প্রবন্ধ—The Danger of Obedience থেকে কিছু উদ্ধৃত করেছিলেন। সেই কথাগুলো সদাশিবের মনে পড়ল। Men who insist that some particular injustice is not their responsibility sooner or later become unable to resent any injustice. Tyranny depends upon nothing so much as the lethargy of a people. Autocracy is born above all of the experience that it need not expect active resentment against injustice. This is the inner truth of Thoreau's famous sentence that 'under a government which imprisons any unjustly the true place for a just man is also a prison.'

আরও খানিকটা কি ছিল কিন্তু সদাশিবের তা মনে পড়ল না। তবে তাঁর মনের সংশয় কেটে গেল। অন্যায় অসত্য অসুন্দরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। ডাক্তার হয়েছেন বলেই তিনি এ কর্তব্যের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। দেশ এখন স্বাধীন বলেই এ দায়িত্ব আরও প্রবল হয়েছে। বহুকালের পরাধীনতা আর অশিক্ষার ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষই স্বার্থপর পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক সময় লাগবে। বর্তমান সমাজের ও শাসনব্যবস্থার ভয়াবহ চেহারা দেখে ভয় পেলে চলবে না, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামে সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকেরা যদি প্রাণপণে লেগে না থাকেন তাহ'লেই ভয়ের কথা। এই সব ভাবতে ভাবতে সদাশিব ডি. আই. জি.-র বাংলোয় পৌঁছলেন।

ডি. আই. জি. অফিসে কাজ করছিলেন। সেইখানেই সদাশিবকে ডেকে পাঠালেন।

"নমস্কার। আসুন, আমিই আপনার ওখানে যাব ভাবছিলাম।"

"কেন বলুন তো?"

"সিরোসিস্ অব্ লিভার সারে কি ?"

"সেটা নির্ভর করে লিভারটা কতটা খারাপ হয়েছে তার উপর। কেন, কার হয়েছে সিরোসিস্ অব্ লিভার—"

"আমার। পাপী লোক তো! কতটা খারাপ হয়েছে তা কি পেট টিপে বুঝতে পারবেন ?"

"খানিকটা পারব। তবে ভালো করে' জানতে হ'লে কতকগুলো ল্যাবরেটরি টেস্ট্ আছে তা করতে হবে। তা এখানে হবে না, কোলকাতায় যেতে হবে—"

"তাই যাব। তবে, কোলকাতার ব্যাপার কি জানেন, কে ভালো ডাক্তার, কে রিলায়েবল্, কে নয়, তা ঠিক করা বড় শক্ত। অনেক ডিগ্রীধারী জুয়াচোর ফাঁদ পেতে বসে' আছে তো, প্রত্যেকের টাউট্ও ঘুরছে বাজারে। আপনি যদি কোন ভালো লোকের কাছে পাঠিয়ে দেন সেইখানেই যাব—"

"কি কষ্ট হয় আপনার ?"

"ডিস্পেপ্সিয়া। অম্বলে বুক জ্বালা করে বিকেলের দিকে—"

"সেটা সিরোসিস্ অব্ লিভারের জন্য না-ও হ'তে পারে।"

"মদ খাই যে। গিল্টি কন্শেন্স তো। এখন যিনি সিভিল সার্জন আছেন তিনি ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন। ইন্জেকশনও দিয়ে যাচ্ছেন রোজ একটা করে'। কিচ্ছু ফল হচ্ছে না। তাই ভাবছিলাম আপনাকে একবার কন্সাল্ট করব।"

"মদ খেলে যে সিরোসিস্ হবেই এমন কোনও কথা নেই। হিন্দু বিধবাদেরও সিরোসিস্ হ'তে দেখেছি। তারা মদ খায় না, ঝাল খায়, আর প্রোটিন্ নামমাত্র খায়। অনেকের মতে প্রোটিন ফুডের অভাবই সিরোসিসের একটা কারণ।"

"আমি তো রোজ দুটো করে' মুরগি খাই।"

"আপনি এক কাজ করুন, খাবার পর ফোঁটা-কয়েক অ্যাসিড্ খেয়ে দেখুন না, আপনার কষ্ট কমে কিনা।"

"বেশ, লিখে দিন প্রেসক্রপশন্ একটা।"

কাগজ আর কলম এগিয়ে দিলেন। প্রেসক্রপশন্ লিখে বললেন, "আমার মোটরেই ওষুধ আছে। বলেন তো দিয়ে দি।"

"দিন—"

www.boiRboi.blogspot.com

সদাশিব বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এলেন একটা ছোট শিশি আর একটা ড্রপার নিয়ে।

"এটা অ্যাসিড্ হাইড্রোক্লোরিক ডিল। এর দশ ফোঁটা খাবেন একটু জলের সঙ্গে মিশিয়ে, খাবার পরই হু'বেলা। আউন্সখানেক জল দেবেন, বেশ টক।"

"থ্যাঙ্কিয়ু। এর দাম-টাম—"

"দাম অতি সামান্য, তা আর দিতে হবে না। তবে আমি একটা কাজের জন্যে এসেছি, যদি একটু সাহায্য করেন উপকৃত হব।"

"কি বলুন। আপনার সে লোকটা তো ছাড়া পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই—"

"হ্যাঁ। এ একটা অন্য ব্যাপার—"

সব বললেন খুলে।

ডি. আই. জি. একটু চুপ করে' থেকে বললেন, "থানায় ডায়েরি করিয়ে ভালোই করেছেন। আমি দেখব। ওই ছিপলীর সঙ্গে আপনার আলাপ হ'ল কি করে'?"

"ওদের বাড়িতে আমি চিকিৎসা করি। ওরা ঘরের লোকের মতো হ'য়ে গেছে।"

"ও, আচ্ছা আমি দেখব।"

তারপর হেসে বললেন, "আপনি যদি আপত্তি না করেন একটা হুইস্কি সোডা অর্ডার করি—"

"না না, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না যে আপনার সিরোসিস্ হয়েছে।"

টং করে' ঘণ্টা টিপতেই এক আরদালী এল।

"হুইস্কি সোডা—"

হুইস্কি-সোডায় এক চুমুক দিয়ে বললেন, "আপনার রিভলবার আছে?"

"আছে।"

"সঙ্গে থাকে তো?"

"না।"

"সঙ্গে রাখবেন। যে গুণ্ডা তিনটির নাম করলেন তারা সাংঘাতিক লোক। ওদের কথা আমি শুনেছি। ওদের গায়ে হাত দেওয়া শক্ত। ওদের খুঁটির জোর আছে। অবশ্য আমি কিছু কেয়ার করি না। আমার রিটায়ার করবার

www.boiRboi.blogspot.com

সময় হ'য়ে এসেছে, ওরা আমার বেশী কিছু পারবে না। তবে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন—"

"স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকে ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতাটা একটু বেড়েছে—"

"বাড়বেই তো। আমি তো ইংরেজ আমলের লোক, এদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। খদ্দর পরে' যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেবেছিল তাদের মধ্যে ওয়ান পারসেন্ট লোক ভালো ছিল কিনা সন্দেহ। তাদের হাতেই রাজত্ব গেছে, তারা লুটেপুটে খাচ্ছে। সেদিন এক গ্রামে এক বড় গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতি হ'য়ে গেছে, গ্রামের লোক তাড়া করাতে ডাকাতগুলো পালিয়েছিল। কিন্তু তারা যে জীপ্‌টায় এসেছিল সেটা নিয়ে যেতে পারেনি। দেখা গেল যে জীপ্‌টা একজন হোমরাচোমরা রাজপুরুষের—"

"কি করলেন আপনারা—"

"কি আর করব। তিনি বললেন, তাঁর জীপ্‌টাও ডাকাতরা চুরি করে' নিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা ধামা-চাপা পড়ে' গেল। দুরাত্মার পিছনে যদি রাজবল থাকে তাহ'লে সে দিন-দুপুরে হাতে মাথা কাটবে—"

"এর প্রতিকার কি ?"

"প্রতিকার ? It will come in time ! ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের ইতিহাস পড়েছেন ?"

"ভালো করে পড়িনি।"

"পড়ে' দেখবেন। ওর মধ্যে অনেক শিক্ষাপ্রদ জিনিস আছে।"

ডি. আই. জি. হাসিমুখে হুইস্কি-সোডা সিপ করতে লাগলেন।

"আচ্ছা, এবার উঠি আমি।"

"আচ্ছা। নমস্কার। দিন আষ্টেক পরে খবর পাঠাব কেমন আছি। নমস্কার।"

পনর

সদাশিবের মোটর বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাজারে তিনি রোজ একবার করে' যান, শুধু বাজার করবার জন্যেই নয়, বাজারের লোকদের খবর নেবার জন্যেও বটে। মাঝে কয়েকদিন যেতে পারেননি। সেদিন গিয়ে আবদুলকে দেখতে পেলেন না। শুনলেন তার জ্বর হয়েছে। তার জায়গায় জগদম্বা বসে' মাছ বিক্রি করছে।

www.boiRboi.blogspot.com

জগদম্বা মাছের ব্যবসা ছেড়ে চায়ের দোকান করেছিল, তার দোকানের বড় কাচের বোতলে রঙীন মাছ ছিল, সিনেমা অভিনেত্রীদের ছবিও টাঙানো ছিল অনেকগুলো। চা বিক্রিও হ'ত খুব। হঠাৎ সে আবার মাছ বিক্রি করতে বসল কেন? জগদম্বা বললে, লোকে ধারে চা আর পান খেয়ে খেয়ে দোকানটা তার উঠিয়ে দিলে। সে কাকে 'না' বলবে? বাবুভেইয়ারা পর্যন্ত ধারে নিতে আরম্ভ করেছিল। তার পুঁজি আর কতটুকু! সুতরাং দোকান তুলে দিতে হয়েছে। এখন সে আড়তদারের মাছ বিক্রি করে। যা লাভ হয় ভাগাভাগি করে' নেয়।

ছিপলী তার কোণটিতে ঠিক বসে' ছিল। তাঁকে দেখে মৃদু হেসে বললে যে তাঁর জন্যে সে সদ্য-ধরা টাটকা রুই মাছের পেটি খানিকটা রেখে দিয়েছে। আরও একটি সুখবর দিল সে। সেই গুণ্ডা ছোঁড়া তিনটিকে পুলিসে ধরে' নিয়ে চালান দিয়েছে। তার কাছে ভগলু মহলদার বসে' ছিল প্রকাণ্ড একটা চিতল মাছ নিয়ে। সদাশিব দেখলেন তার একটা চোখ বেশ ফুলে রয়েছে।

"চোখে কি হ'ল ভগলু?"

ভগলু মৃদু হেসে চুপ করে' রইল, তার ঝাঁকড়া গোঁফগুলো কম্পিত হ'তে লাগল শুধু।

"কি হ'ল চোখে—"

চিতল মাছটাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে—"ই শালা মারিস হায়।"

চিতল মাছের ল্যাজের ঝাপটায় চোখটা জখম হয়েছে তার। সদাশিব চোখটা দেখলেন। তারপর বললেন, "বিশেষ কিছু হয়নি, সেঁক দিও। আর আমি ওষুধ একফোঁটা দিয়ে দেব চোখে।"

বাঁড়ুয্যে মশাই যথারীতি মাছ ঘাঁটছিলেন বসে'।

"নমস্কার বাঁড়ুয্যে মশাই। ভালো আছেন? ক'দিন আসতে পারিনি।"

বাঁড়ুয্যে ঘাড় তুললেন না। হেঁটমুণ্ডেই উত্তর দিলেন, "নমস্কার। আপনি আমার ওখানে যাবেন বলেছিলেন, কই এলেন না তো!"

"নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। ভুলেই গেছি।"

"তা বুঝতে পেরেছি। গরীবের কথা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।"

অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লেন সদাশিব।

"আচ্ছা, আজই যাব। বারোটা নাগাদ যাব আপনার বাসায়।"

"বেশ—"

হঠাৎ সরখেলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল। তাঁর বাঁ হাতে রুমালে

বাঁধা কতকগুলি কুঁচো মাছ। চোখেমুখে একটা চাপা অপ্রসন্নতা ফুটে রয়েছে। দারিদ্র্য-জনিত যে অসন্তোষের আগুন তাঁর অন্তরে ধিকিধিকি অহরহ জ্বলে তার শিখা তাঁর চোখেমুখে পরিস্ফুট। সৌভাগ্যবান লোকের সান্নিধ্য তিনি সহ্য করতে পারেন না। সদাশিবকে পারতপক্ষে তিনি এড়িয়ে চলেন। বাজারের সেরা মাছ মাংস তাঁর বাড়িতে রোজ যায় এইটেই বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। সদাশিবকে দেখলেই তাঁর চোখেমুখে একটা উগ্রভাব দেখা দেয়। ভদ্রতার খাতিরে একটু হাসেন অবশ্য, কিন্তু তা ঈর্ষা-ক্লিষ্ট তিক্ত হাসি।

"নমস্কার। আপনার জন্যে তো রুই মাছের পেটি কেটে রেখেছে মেছুনীটা। আমিও নিতুম, কিন্তু একটু দোরসা মনে হ'ল, তাই আর নিলাম না। খুব 'রেয়ার' জিনিস পেয়ে গেছি একটা—"

"কি—"

"টাট্‌কা ট্যাংরা মাছ। এ দেশে দুর্লভ—"

"তা বটে—"

নমস্কার করে' সরখেল কেটে পড়লেন।

তারপর দেখা হ'ল প্রফেসার জলধর বাবুর সঙ্গে। থলথলে মোটা মানুষ। বাজারে কখনও আসেন না। ভিড়ে আর টেলাঠেলিতে বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন।

"নমস্কার, নমস্কার, আপনি হঠাৎ বাজারে যে!"

"আর বলেন কেন। জামাই এসেছে। গিন্নী বললেন তুমি নিজে গিয়ে রুই মাছের মুড়ো নিয়ে এস একটা। কিন্তু রুই মাছ তো নেই। সবই দেখছি আড়, শিলং আর বাঘাড়। এই ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করে' খোঁজাও তো মুশকিল—"

"দাঁড়ান দেখছি—"

তিনি এগিয়ে গেলেন ছিপলীর কাছে।

"তুই যে রুই মাছটা কেটেছিলি তার মুড়োটা কোথা?"

"তোরহ্‌ বাস্তে রাখলি—"

ছিপলী আলাদা করে' রেখে দিয়েছিল মাছ আর মুড়ো পিছনের দিকে একটা ঝুড়িতে ন্যাকড়া চাপা দিয়ে।

"মুড়োটা প্রফেসার সাহেবকে দিয়ে দে। জলধরবাবু, মুড়ো পাওয়া গেছে একটা—"

জলধরবাবু আকর্ণ হাসি হেসে' বললেন—"বাঁচালেন মশাই। মুড়ো না নিয়ে গেলে জামাইয়ের কাছে মান থাকত না। এর দাম—"

ছিপলী দাম নিতে চাইছিল না। সদাশিব ধমক দেওয়াতে নিলে।

জলধরবাবু একটু অবাক হলেন—"দাম নিতে চাইছে না কেন!"

"ও আমার বেটি কিনা। তাই আপনাকেও খাতির করছিল।"

অনেক ধন্যবাদ দিয়ে জলধরবাবু চলে' গেলেন।

সদাশিব চারদিক একবার চেয়ে দেখলেন। পরিচিত সবাইকেই দেখতে পেলেন। বাজারে এসে নিজের অজ্ঞাতসারেই অনেকে স্বরূপ প্রকাশ করে' ফেলেন। পবিত্রবাবু মাছের বাজারে ঘোরেন যেন তিনি নিজের জমিদারি পরিদর্শন করছেন। স্কুলমাস্টার শম্ভুবাবু সর্বদাই কুণ্ঠিত, ভিড়ের মধ্যে সাইকেল ঠেলে' ঠেলে' ঢোকেন, দেখা হ'লেই ঘাড়টি নুইয়ে নমস্কার করেন। তাঁর সাইকেলটি একটি জবড়জং ব্যাপার। সামনে পিছনে বেতের ঝুড়ি নানারকম জিনিসে ভরা। তরি-তরকারি, ওষুধ, কাপড়।

শম্ভুবাবু ভোর সকালে টিউশনি করতে বেরোন। দুটো টিউশনি সেরে' এসে বাজার করেন। তারপর বাড়ি গিয়ে স্নানাহার করেই স্কুলে ছোটেন। স্কুল থেকে আর বাড়ি ফেরেন না, টিউশনি করতে যান। রাত দশটা পর্যন্ত টিউশনি করেন। ঘানির বলদরাও বোধ হয় এত খাটে না। অথচ তাঁর মুখে কোন অসন্তোষ বা ক্ষোভের গ্লানি নেই। মিষ্টি হাসিটি লেগেই আছে।

ত্রৈলোক্যবাবুর স্বভাব কলহ করা। তিনি মাছ কিনবেন একপো কি দেড়পো কিন্তু তার বায়নাক্কা অনেক। ওজনদাঁড়ির 'পাষাণ' দেখবেন, মাছ টাটকা কি বাসি দেখবেন, মাছের সঙ্গে 'কানকো' বা ফুলখারা দিচ্ছে কিনা দেখবেন, পরিশেষে দর নিয়ে কচলাকচলি করবেন। তাঁর মুখটা নাক-সর্বস্ব। খাঁড়ার মতো নাক। টকটকে ফরসা রং, কটা চোখ। মনে হয় কোন সাহেব যেন বাঙালী পোশাক পরেছে। জেলেরা তাঁর নাম দিয়েছে সাহেববাবু। তিনি মাছ কেনবার সময় এত হাঙ্গামা করেন, কিন্তু জেলেরা এতটুকু বিরক্ত হয় না। তাঁর এই সব অন্যায় আবদার হাসিমুখে সহ্য করে তারা।

কতরকম লোকই যে আসে বাজারে। একদল আসে তাদের ব্যক্তিত্ব বলে' কিছু নেই। মুখের দর্পণে কোন ভাব প্রতিফলিত হয় না। বোদা চেহারা। ভিড়ের মধ্যেও যেমন, ফাঁকা জায়গাতেও তেমনি। কথা বলে না, গা বাঁচিয়ে

চলে, টুক করে' বাজারে ঢোকে, টুক করে' বেরিয়ে যায়। অনেকটা শশক-প্রকৃতির।

হঠাৎ যোগেনবাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। তিনি একজন খবরের কাগজের ঘুণ। দু'তিনটি কাগজ তন্ন তন্ন করে' পড়েন এবং কারো সঙ্গে দেখা হ'লেই খবরের কাগজের খবর নিয়েই আলোচনা করেন।

"ডাক্তারবাবু নমস্কার। নেহেরুর কাণ্ডটা দেখেছেন? আমাদের অতখানি জায়গা পাকিস্তানকে দিয়ে দিলে! যেন ওর বাপের সম্পত্তি। ও যদি আর কিছুদিন প্রাইম মিনিস্টার থাকে আমাদের প্রত্যেকের ভিটেতে ঘুঘু চরিয়ে দেবে—"

সদাশিব সাধারণতঃ রাজনৈতিক তর্ক করেন না। মুচকি হাসলেন একটু। উত্তেজিত যোগেনবাবু বললেন, "আপনি কেন যে খদ্দর পরেন বুঝি না। ওই খদ্দরধারীরাই তো আমাদের দফা নিকেশ করে' দিলে। বাঙালীদের নিশ্চিহ্ন করে' দেবে ওরা, দেখে নেবেন। দেখবেন ঠিক দেবে। গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি হয়।"

যোগেনবাবুর ক্ষোভের কারণ আছে। তিনি রিটায়ার করবার পর এক্স্‌টেনশন পাননি। তাঁর ধারণা বাঙালী বলেই পাননি। তাঁর ছেলে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক, একবার ফেল করে' আই. এ., দু'বার ফেল করে' বি. এ. পাস করেছে। কোথাও তাকে ঢোকাতে পাচ্ছেন না। তাঁর ধারণা বাঙালী বলেই পাচ্ছেন না। আহা, আজ যদি হ্যামিলটন সাহেব থাকত তাহ'লে তাঁর ছেলের চাকরির ভাবনা! সেলাম করলেই চাকরি হ'ত। বার বার এই কথাই বলেন।

যোগেনবাবু একটি সাংঘাতিক খবর দিলেন।

"মহেন্দ্রবাবুর খাবার আপনার বাড়ি থেকে যায় তো?"

"হ্যাঁ—"

"তাঁর খবর জানেন?"

"না। অনেকদিন দেখা হয়নি।"

"শুষ্‌ছে —"

"তাই না কি?"

"যান একবার দেখে আসুন।"

"শুষ্‌ছে? আমাকে তো কোন খবর দেননি।"

"খবর দিলে যদি খাওয়াটি বন্ধ করে' দেন, সেই ভয়ে দেননি। রোজ রসগোল্লা কিনে খেতেন। আপনি নাকি খেতে বলেছিলেন।"

"না। আমি মিষ্টি খেতে বারণই করেছিলুম।"

"উনি এখন দোষটা আপনার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। ওঁর খাওয়ার খরচটা তো আপনার ঘাড় দিয়ে চলে' যেত, যা বাড়তি পয়সা হাতে থাকত তাই দিয়ে রসগোল্লা কিনতেন।"

সদাশিব গিয়ে দেখলেন মহেন্দ্রবাবু সত্যিই মরছেন। শেষ অবস্থা। আচ্ছন্নের মতো পড়ে' আছেন। অনেক ঠেলাঠেলির পর চোখ খুললেন।

"কে ডাক্তারবাবু! নমস্কার—"

খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে আবার বললেন, "অনেক করলেন আমার জন্যে। অনেক ধন্যবাদ। আপনার কথা একটাও শুনিনি। বাঁচতে চাই না। বেঁচে সুখ নেই—"

একটু পরেই মারা গেলেন।

শবদাহের ব্যবস্থা করে' বাঁড়ুয্যে মশায়ের বাড়িতে আসতে প্রায় একটা বেজে গেল। বাঁড়ুয্যে মশাইদের বাড়ি বেশ বড়। কিন্তু পরিবার বড় বলে' ভাগ ভাগ হ'য়ে গেছে। বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের ভাগে দু'খানি ঘর, একফালি বারান্দা, একফালি উঠোন, আর উঠোনের পাশে ছোট রান্নাঘর। বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের নাতিনীটি ছাড়া আর কেউ নেই। নাতনীটির চেহারা বীভৎস। মুখের আধখানা পোড়া। স্টোভে পুড়ে গিয়েছিল। সদাশিব গিয়ে দেখলেন বাঁড়ুয্যে মশাই নিজেই রাঁধছেন। শুধু গা, পরনে একটি গামছা। রান্নাঘর থেকে তিনি বললেন, "ওরে, ডাক্তারবাবুকে ঘরে বসিয়ে হাওয়া কর। একটু বসুন। বেগুন-চিংড়িটা নাতনীকে দিয়ে রাঁধিয়েছি, ওটা ওর স্পেশালিটি। আমি লাউঘণ্টটা রাঁধছি, ওটা আমার স্পেশালিটি। খেয়ে দেখুন কেমন লাগে—"

সদাশিব ঘরের ভিতর গিয়ে বসলেন। নাতনী একটি ভাঙা হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। ঘরের চারিদিকেই দারিদ্র্যের ছাপ। দেওয়ালে বহুকাল চুনকাম করা হয়নি। দু' এক জায়গায় নোনা ধরেছে। চেয়ারটা ভাঙা, নড়বড়ে, একটি হাতল নেই। বিছানার চাদর ময়লা। মাছি ভন ভন করছে চতুর্দিকে। পাশের নর্দমা থেকে দুর্গন্ধ উঠছে একটা।

সদাশিব কখনও বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাড়িতে আসেননি। যখন হাস-পাতালে সিভিল সার্জন ছিলেন তখন এই নাতনী স্টোভ জ্বালতে গিয়ে পুড়ে যায়। বাঁড়ুয্যে মশাই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন একে। বাঁচবার আশা

ছিল না। অনেক চেষ্টা করবার পর বাঁচল বটে, কিন্তু মুখটা বীভৎস হ'য়ে রইল।

সদাশিবের কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। তিনি যেন হঠাৎ একটা রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন। নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী গৃহস্থের নগ্নরূপটা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল এদের দশা কি হবে? এরা কি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে? কে বাঁচাবে এদের? ভারত স্বাধীন হ'য়ে এরাই তো সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হয়েছে। উদ্বাস্তুদের কথা মনে পড়ল, তারা নাকি আরও বিপন্ন। শিয়ালদহ স্টেশনে তাদের যে চেহারা একবার দেখেছেন তা মর্মন্তুদ। মানুষ নয়, যেন পশুর দল। তিন-চারজন নেতা মিলে দেশটাকে ভাগ করে' দিলে ক্ষমতার লোভে! ভাঙা দেশ আবার কি জুড়বে? কতদিনে?

এই সব নানা চিন্তায় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন তিনি। বাঁড়ুয্যে মশাই এলেন একটু পরে।

"হ'য়ে গেল, এইবার খেতে বসুন। মুখপুড়ী জায়গা করে' দে। কার্পেটের আসনটা বিছিয়ে দিস—"

নাতনী বেরিয়ে গেল। বাঁড়ুয্যে মশাই আবার চেঁচিয়ে বললেন, "কাঁসার গেলাসটা মেজেছিস তো?"

"হ্যাঁ"—মৃদুস্বরে উত্তর এল বাইরে থেকে।

বাঁড়ুয্যে মশাই (তখনও গামছা-পরা) ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর তাঁর ভাবলেশহীন মুখে হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়ল একটু।

বললেন, "ওর মা ওর নাম স্বর্ণলতা রেখেছিল। দেখতে স্বর্ণলতার মতো না হোক, তাম্রলতার মতো হয়েছিল। এখন ওকে মুখপুড়ী বলে' ডাকি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় ভাগ্যে ওর মুখ পুড়েছিল, তাই তো ও আমার কাছে আছে, আমাকে দুটো ভাত ফুটিয়ে দিচ্ছে। মুখ না পুড়লে তো এতদিন বিয়ে হ'য়ে আমাকে ছেড়ে চলে' যেত। বিয়ে দিতেই হ'ত, ভদ্রাসনটুকু বিক্রি করেও দিতে হ'ত। কিন্তু তা আর হ'ল না, ভগবান আমার উপর দয়া করল, মুখটা ওর পুড়ে গেল—"

ভগবানের এই দয়ার জন্যে বাঁড়ুয্যে মশাই যে কৃতজ্ঞ তা কিন্তু মনে হ'ল না। কারণ তাঁর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

সদাশিব বললেন, "আমার একটু সংকোচ হচ্ছে। এমনভাবে বিব্রত করলুম—"

"কিছুমাত্র না। এ তো ভাগ্য, ভাগ্য, পরম ভাগ্য। বেশীদিনের কথা নয়, আমার ঠাকুরদার আমলেই আমাদের বাড়িতে দু'বেলায় পঞ্চাশজন লোকের পাতা পড়ত—পাড়ার লোক, বাইরের লোক, অতিথি বন্ধু আত্মীয় অনাত্মীয় কেউ বাদ পড়ত না। আমাদের ঠাকুমারা রুপোর গয়না পরতেন, শাড়ির বাহার ছিল না, কিন্তু তাঁরা দশজনকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন, নিজেরাই পরিবেশনও করতেন। দাসী চাকরানীর মতো গজগজ করে' করতেন না, হাসি-মুখে করতেন। দেখতে দেখতে সব মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল। এক জীবনে কতোই না দেখলুম। চলুন—"

সদাশিব গিয়ে দেখলেন প্রচুর আয়োজন করেছেন বাঁড়ুয্যে মশাই। নানা-রকম তরকারি, নিরামিষই প্রায় আট-দশ রকম।

"করেছেন কি! এতো কি খেতে পারব?"

"আপনি পারবেন না তো পারবে কে। আপনি তো খাইয়ে লোক—"

"আপনি খাবেন না?"

"আমার দেরি আছে। স্নান করব, আহ্নিক করব, তবে খাব। ভাবছি একেবারে ওবেলায় খাব। একবেলাই খাই আমি। দু'বেলা খাওয়া সহ্য হয় না। আপনি বসে' খান, আমি হাওয়া করি—"

"না না, আপনি হাওয়া করবেন কি—"

"যা মাছি, খেতে দেবে না আপনাকে। ফিনাইল কিনেও কূল পাই না, তাই আজকাল কেনা ছেড়ে দিয়েছি—"

খেতে খেতে গল্প হ'তে লাগল।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন, "আপনাদের পরিবার এককালে নিশ্চয়ই খুব বড় ছিল—"

"বড় বলে বড়, রাবণের গুষ্টি। বিষয় ভাগ করতে করতে প্রত্যেকের ভাগে চটকস্য মাংসও হয়নি। এ পাড়াটাই বলতে গেলে আমাদের। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে মকদ্দমা করেছে—ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল।"

"মকদ্দমা কেন—"

"মতিচ্ছন্ন আর কি! আমি নিজেই সাতবার মকদ্দমা করেছি। যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল ওতেই গেছে। এখন পেন্সনটির উপর ভরসা। বেগুন-চিংড়ি কেমন হয়েছে, বলুন?"

"খাসা—"

"মুখপুড়ী ওটা রাঁধে ভালো—"

"আপনার লাউঘণ্টও চমৎকার হয়েছে। এমন ঘণ্টও বহুকাল খাইনি। আপনি এত চমৎকার রাঁধেন! বাঃ—"

"ও রান্নাটি আমার স্ত্রীর কাছে শিখেছিলাম। তিনি শিখেছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। ওর একটু ট্রিকস্ আছে, সেটা সবাইকে শেখাই না।"

বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মুখে আবার একটু হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়ল।

"এতো রকম করেছেন, আবার মাংস করতে গেলেন কেন?"

"আপনি যে রোজ মাংস খান। আমি সব খবর রাখি—"

খাওয়া শেষ করে' সদাশিব যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন বাঁড়ুয্যে মশাই হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করে' বসলেন। ঝুঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন সদাশিবকে!

"আপনি যে গরীবের বাড়ি পাত পেড়ে দুটো খেয়ে গেলেন, এতে কৃতার্থ হ'য়ে গেলাম আমি—"

টপ্ করে' একফোঁটা চোখের জল পড়ল সদাশিবের পায়ের উপর। তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিলেন তিনি। বাঁড়ুয্যে মশাই ঘাড় ফিরিয়ে ভিতরের দিকে চলে' গেলেন! কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সদাশিব। তারপর গিয়ে মোটরে উঠলেন।

ষোল

খুব সকালে গীতিয়া এসেছিল। আর তার সঙ্গে এসেছিল একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

"এরা সব কে—"

"আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়ে। সব চোখ উঠেছে। আপনি তো আমাদের পাড়ায় অনেকদিন যাননি, তাই ডেকে নিয়ে এলাম। নিজেদেরই তো গরজ।"

গীতিয়ার কণ্ঠস্বরে একটু অভিমানের সুর। সে যে ডাক্তারবাবুর বিশেষ স্নেহাস্পদা একথা সে পাঁচজনের কাছে খুব বড় গলা করে' বলে' বেড়ায়, ডাক্তারবাবু অত টাকা দিয়ে তাদের মহাজনের কবলমুক্ত করেছেন, কিন্তু সদাশিবের উদাসীন ব্যবহারে সে যেন একটু নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়েছে ইদানীং।

সদাশিব যদি তাকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন তাহ'লে একমাসের মধ্যে একবারও কি খবর নিতেন না ? আজবলাল চলে' যাওয়ার পর সে সেখানে এসে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু উনি রাজী হননি। সদাশিবের একটু স্নেহ পেলে সে কৃতার্থ হ'য়ে যায়। এর মধ্যে কোনও খারাপ ভাব নেই, খারাপ ভাব যে থাকতে পারে, তা তার চিন্তারও অতীত। সে সদাশিবের কাছে কন্যা-স্নেহ প্রত্যাশা করে। সদাশিব হয়তো তাকে স্নেহও করেন, কিন্তু তার কোনও বহিঃপ্রকাশ নেই। গীতিয়ার তাই অভিমান হয়েছে একটু।

সদাশিব ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের চোখে ওষুধ দিয়ে দিলেন। একটা শিশি করে' কিছু ওষুধ আর একটা ড্রপারও দিলেন।

"রোজ সকাল-বিকেল দিয়ে দিস—"

গীতিয়া তখন আঁচল থেকে খুলে খানকয়েক নোট সদাশিবের হাতে দিয়ে বললে, "এইটে রাখুন—"

"কি এটা—"

"তু'জনে খেটে কিছু টাকা জমিয়েছি, ধারে সেটা শোধ করে' নিন—"

"ঘুঁটে আর তুধ দিয়ে শোধ করবার কথা ছিল। নগদ টাকা কেন ? কোথা পেলি নগদ টাকা ? কারো কাছে ধার করেছিস নাকি ?"

চুপ করে' রইল গীতিয়া। তারপর বলল, "টাকা যে অনেক। ঘুঁটে আর তুধ দিয়ে ও-টাকা শোধ হবে না।"

"তুই টাকা কোথা পেলি বল না—"

গীতিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করে' থেকে বলল, "ছবিলাল মোড়লের বাড়ি 'গিল্লা নোক্‌রি'তে বাহাল হয়েছি। খাওয়া-পরা দেবে, তা ছাড়া ২৫৲ টাকা মাইনে দেবে। ওঁকেও কংগ্রেস-আপিসে একটা চাকরি করে' দিয়েছে মাইনে ৪৫৲ টাকা, পিওনের কাজ করতে হয়। এ মাসে পঞ্চাশ টাকা জমাতে পেরেছি, সেটা দিয়ে গেলাম। ঘুঁটে আর তুধে টাকা তিরিশেক শোধ হবে—"

সদাশিব টাকাগুলি পকেটে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, "ছবিলাল লোকটা পাজি শুনেছি—"

"খুব পাজি। কিন্তু কি করব, ভালো লোকে না রাখলে পাজি লোকের কাছেই যেতে হবে—"

গীতিয়ার চোখে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল।

চুপ করে' রইলেন সদাশিব, কি আর বলবেন। সেই পুরাতন সত্যটাই উপলব্ধি করলেন, অসাধু লোকেদের হাতে ক্ষমতা এসেছে, সাধুদের এখন পরিত্রাণ নেই। ছলে বলে কৌশলে ওরাই এখন ভোগদখল করবে।

প্রশ্ন করলেন, "ছবিলাল মোড়লের ছেলেটাকে তো পুলিসে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল—"

"ছাড়া পেয়ে গেছে। ওদের টাকার জোর আছে, কংগ্রেস ওদের সহায়, ওদের কি কেউ আটকে রাখতে পারে ?"

স্তম্ভিত হ'য়ে বসে' রইলেন সদাশিব। মনে হ'ল তিনি হেরে গেলেন। আর একটা কথাও মনে হ'ল—গীতিয়ার মতো মেয়ে এইবার ওর লম্পট ছেলেটার কবলে পড়বে। একটা ছবি ফুটে উঠল মনে—হরিণী যেন ময়াল সাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

"আমি যাই তাহ'লে—"

গীতিয়া প্রণাম করে' কিছুদূর চলে' গেল।

"গীতিয়া, শোন—"

"কী—"

"ও চাকরি ছেড়ে দে তুই—"

সোৎসুক হ'য়ে উঠল গীতিয়ার চোখের দৃষ্টি। নির্বাক আগ্রহে সে চেয়ে রইল সদাশিবের দিকে। সদাশিব কোন কথা কইলেন না। তখন গীতিয়া জিগ্যেস করল, "চাকরি ছেড়ে দিলে আমাদের চলবে কি করে' ?"

"তোরা স্বামী-স্ত্রী আমার এখানে এসেই থাক। তুই তো লেখাপড়া জানিস, আমার বাড়ীর 'আউট হাউসে' ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল কর একটা। আর তোর স্বামী আমার গরু-বাছুর ঘর-দোর দেখাশুনা করুক। দুটো গাই এবার বিয়োবে। দু'জনে আমার এখানে খাবি-দাবি থাকবি। তোদের আর যা যা দরকার হয় তা-ও পাবি।"

গীতিয়া হাতে যেন স্বর্গ পেল।

উদ্ভাসিত মুখে বলল, "এই তো আমি চাইছিলুম। যাই ওকে বলে' আসি—"

"এগুলো নিয়ে যা—"

"কি—"

"টাকাগুলো—"

"ও নিয়ে আমি কি করব ?"

"পোস্টাফিসে একটা পাস বুক ক'রে জমা করে' রাখ—"

"কিন্তু—"

"আর 'কিন্তু' শুনতে চাই না। যত শিগ্‌গির পার এখানে এসে পড়—"

গীতিয়া একছুটে বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়েগুলোও ছুটতে লাগল তার পিছু-পিছু।

রামলক্ষ্মণ ঠাকুর এসে বলল, "চাল ডাল নুন তেল সব ফুরিয়ে গেছে।" সদাশিব বললেন, "আচ্ছা, স্লিপ লিখে দিচ্ছি, দোকান থেকে আনিয়ে নাও।" সদাশিব আজকাল বাইরে বাইরে খান। কিন্তু বাড়িতে অনেক লোক খায়, অনেক গরীবদুঃখী।

সতর

নবীপুরের হাটে দেখা হ'ল কেব্‌লী আর কেব্‌লীর স্বামী নারাণের সঙ্গে। কেব্‌লী একটি নূতন শাড়ি হলুদ রঙে ছুপিয়ে পরেছে, নারাণের পরনেও একটি গোলাপী রঙের ধুতি। নারাণ এগিয়ে এসে প্রণাম করল সদাশিবকে। কেব্‌লী তার পিছনে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"কি নারাণ, কি খবর, হঠাৎ প্রণামের ধুম কেন?"

"সাধি ভে গেলে হুজুর—"

কেব্‌লী মুখে কাপড় দিয়ে খুব হাসতে লাগল। নারাণের দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে হওয়াতে সে যে খুব দুঃখিত হয়েছে তা মনে হ'ল না।

ধী-বিশালের দোকানের দিকে গেলেন সদাশিব। মঙ্গলদাসের খবর নিলেন। মঙ্গলদাস ভালো আছে। কিন্তু আবার জল জমেছে পেটে।

"ও তো জমবেই। ও অসুখ সারবে না। বেশী জল জমলে আবার বার করে' দিতে হবে। এইভাবে যে ক'দিন চলে।"

ধী-বিশাল বললে মঙ্গলদাসও সে কথা বুঝেছে। তার বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা নাম-সংকীর্তন হচ্ছে। তারপর ধী-বিশাল নিম্নকণ্ঠে বললে যে, সেই 'বদমাশ' ছোক্‌রা তিনটে পুলিসের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে। কাল সন্ধ্যের সময় তার দোকানের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ধী-বিশাল ভয় খেয়ে তিনজন তীরন্দাজ সাঁওতাল বাহাল করেছে দোকান পাহারা দেবার জন্যে।

"তুমি থানাতেও একটা ডায়েরি করিয়ে দাও—"

www.bhojpuri.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

"আচ্ছা—"

হাটে অনেক রোগী অপেক্ষা করছিল মোটরের আশেপাশে। সদাশিব সেইদিকে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে দেখলেন, কেব্‌লী দাঁড়িয়ে আছে, নারাণ সঙ্গে নেই।

ভিড় কমে' যাবার পর কেব্‌লী কাছে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে' বললে, দু' নৌকোয় পা দিয়ে নারাণ এখন মহাবিপদে পড়েছে। নারাণের মা ওই কানী বিধবাকে ঘরে নিতে চাইছে না। আর ওই কানীর বাবা যে জমি দেবে বলেছিল সে জমিও দেয়নি। সে বলেছে আগে দেখি আমার মেয়ের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করে, তবে জমি লিখে দেব।

"তোকে তো জমি দেবে বলেছিল, তাও দেয়নি ?"

"না—"

"তুই কিছু বললি না ?"

"কানী হামরা মারে লে দৌগেছে। বড় বরিয়ার ছে। হাম্‌ ভাগীকে চললো আইলি। বড় মারখুণ্ডা ছে। ওকরো ভী মারেলা দৌগেছে—"

"কানী বিধবাকে বিয়ে করে' নারাণ তো তাহ'লে মহাবিপদে পড়েছে। কোথায় আছে এখন ও ?"

"হিয়ঁাই। কাঁহা যাইতে—"

মুখ ফিরিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেব্‌লী হাসতে লাগল। তারপর সে আসল কথাটি ভাঙল।

আবার 'পঞ্চ' ডাকা হয়েছে। কেব্‌লীর প্রাপ্য জমি তাকে দেওয়া হবে কিনা সেই 'পঞ্চ' ঠিক করবে। সেই পঞ্চের দু'জন মাতব্বর লোক সদাশিবকে খুব খাতির করে। তাদের কঠিন কঠিন অসুখ সদাশিবই নাকি একদিন সারিয়েছিলেন। তারা আবার ওষুধ নিতে সদাশিবের কাছে আসবে। তখন সদাশিব যদি তাদের একটু বলে' দেন তাহ'লে কেব্‌লী জমিটা পেয়ে যাবে।

সদাশিব বললেন, "কবে কার অসুখ সারিয়েছি আমার তো কিছু মনে নেই !"

কেব্‌লী মনে করিয়ে দিলে তিনি তখন সরকারী কাজ করতেন। একজনের 'পোতা' (হাইড্রোসিল) আর একজনের 'গুমা' (ফোড়া) কেটেছিলেন। সদাশিবের মনে পড়ল না। বললেন, "আচ্ছা আমার কাছে আসে তো বলব। নারাণ আর একটা বিয়ে করেছে বলে' তোর দুঃখ হয়নি একটুও—"

www.boiRboi.blogspot.com

"দুঃখ করে কে কি করবো। ওই সেই ওকরো মতি-গতি আর হম্‌রা কপার—"

কেব্‌লী খানিকক্ষণ ঘাড় হেঁট করে' দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ল, তারপর চলে' গেল।

তারপর এল কয়েকটা ছোট ছেলে। ফরসা জামা-কাপড় পরা। সদাশিব তাদের চোখ দেখলেন, দাঁত দেখলেন, খুশী হলেন খুব।

"আলী, এদের প্রত্যেককে দুটো করে' সন্দেশ দাও—"

আসবার সময় দীনু হালুয়াইদের দোকান থেকে সের দুই সন্দেশ কিনে এনেছিলেন তিনি। তারা সন্দেশ নিয়ে কলরব করতে করতে চলে গেল।

"আলী—"

"হজৌর—"

আলী এসে সামনে দাঁড়াল।

"তুমি সন্দেশ খেয়েছ?"

আলীর মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে সে মৃদুকণ্ঠে বলে—"হুজুর হুকুম নেহি দেনে সে কৈসে খায়েঙ্গে?"

"খাও চারটে সন্দেশ। আজ আমাদের রান্নার ব্যবস্থা কি করেছ? হাটে মাছ তেমন পেলে কি?"

"নেই হুজুর! মুরগি লেয়া দোঠো।"

"মুরগির ঝোল আর ভাত বানাও আজকে।"

"বহুত খু—"

"বেশী মসলা দিও না। সাদা ঝোল বানাও—"

"বহুত খু—"

"কোথায় রাঁধবে আজ? ওই বড় তালাওটার ধারে চল—"

"বহুত খু—"

আলী কয়েক মুহূর্ত ঘাড়টা একদিকে বেঁকিয়ে এবং দুটি আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সমস্ত ব্যাপারটা প্রণিধান করে' ফেলল। তারপর মোটরের পিছনে চলে' গেল।

সদাশিব উঠতে যাবেন এমন সময় দেখতে পেলেন নারাণ আসছে। একা আসছে। সঙ্গে কেব্‌লী নেই।

"কি নারাণ, আবার এলে যে—"

নারাণ একটু চুপ করে' রইল, তারপর বললে—গোপনে সে তাঁকে একটা কথা বলতে চায়। এতক্ষণ সে হাটে অপেক্ষা করছিল। রোগীর ভিড় কমে' যাবার পর এসেছে।

"কি কথা—"

নারাণ হিন্দীতে বললে—"আপনি কেব্‌লীকে একটু শাসন করে' দিন। ও একটা সিপাহীর সঙ্গে বড্ড বেশী মাথামাথী করছে। ভেবেছিলাম 'দোসরা' একটা 'সাধি' করে' আমি আলাদা সরে' থাকব, ও যা খুশী করুক। কিন্তু আমার মা ওই কানী বিধবাকে কিছুতেই ঘরে নিতে চাইছে না। আমাকে বাধ্য হ'য়ে কেব্‌লীর কাছে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু কেব্‌লী যদি একটা সিপাহীর সঙ্গে লটপট্‌ করে তাহ'লে তো বরদাস্ত করতে পারি না। শেষকালে একটা খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যাবে একদিন।

সদাশিব প্রশ্ন করলেন, "এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি? ও তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপার, তোমরাই ঠিক কর—"

হঠাৎ নারাণ সদাশিবের পা জড়িয়ে ধরল।

"আপ একদফে কহ্‌ দেনে সে সব ঠিক হো যায়ে গা। উ আপকো বাপকো এইসা মানতা হ্যায়।"

হাউ হাউ করে' কাঁদতে লাগল নারাণ।

সদাশিব বললেন, "ওকে যদি চরিত্রহীন বলে' মনে হয়, ছেড়ে দাও না ওকে—"

নারাণ বললে কেব্‌লীকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

"আবার বিয়ে তো করতে গেছ্‌লে—"

নারাণ নিজেই নিজের দু'কান মলে' গালে ঠাস ঠাস করে' চড়াতে লাগল।

"কসুর হো গিয়া হজুর। কসুর হো গিয়া—"

সদাশিব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। শেষে বললেন, "আচ্ছা, আমি শাসন করে' দেব। কিন্তু আমার কথা শুনবে কি?"

"জরুর শুনে গা, জরুর শুনে গা, উস্‌কো বাপ শুনে গা—"

একটু পরেই রাস্তায় কেব্‌লীর সঙ্গে দেখা হ'ল। সে একাই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল হাট থেকে কিছু তরি-তরকারি কিনে। সদাশিব মোটর থামালেন। নাবলেন মোটর থেকে। কেব্‌লীকে ডেকে নিয়ে গেলেন একটু দূরে।

www.boiRboi.blogspot.com

"শুনছি তুই কোন্ এক সিপাহীর সঙ্গে লটপট্ লাগিয়েছিস্?"

কেব্‌লী ঘাড় ফিরিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে রইল মুখে আধঘোমটা টেনে।

সদাশিব সংক্ষেপে বললেন, "ফের যদি শুনি চাবকে তোর পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলব। মনে থাকে যেন; কথাটা মনে থাকবে তো?"

কেব্‌লী সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাৎ করে' জানাল, থাকবে।

সদাশিব ফের এসে মোটরে উঠলেন।

হঠাৎ একটা নির্মল আনন্দে তাঁর সমস্ত মন ভরে' গেল যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি এদের যথার্থ আত্মীয় হ'তে পেরেছেন—এই উপলব্ধিতে তন্ময় হ'য়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

আঠারো

কিন্তু হঠাৎ সব শেষ হ'য়ে গেল একদিন। গভীর রাত্রে সদাশিবের ঘুম ভেঙে গেল কুকুরের ডাকে। কুকুরটা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে খুব ডাকছিল। রামলক্ষ্মণ ঠাকুর, গীতিয়া, গীতিয়ার স্বামী সবাই উঠেছিল। সদাশিব উঠে আলোটা জ্বাললেন। রামলক্ষ্মণ এসে বলল যে ছিপলীর স্বামী এসে ডাকাডাকি করছে। তাদের বাড়িতে নাকি ডাকাতি হচ্ছে। ডাকাতি হচ্ছে? ছিপলীর স্বামীকে ডাকতে বললেন। সে এসে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে' কাঁপতে লাগল। তারপর তাঁর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে' একটি কাতরোক্তিই সে করলে—"বাঁচাইয়ে হুজুর!" অনেক জেরার পর জানা গেল ছবিলালের ছেলেটি দলবল জুটিয়ে তাদের বাড়িতে হানা দিয়েছে, আর ছিপলীর উপর বলাৎকার করেছে। জিতু বাধা দিতে গিয়েছিল, পারেনি। সে তাই ছুটতে ছুটতে এখানে এসেছে।

আলী সাধারণতঃ রাত্রে নিজের বাড়ি চলে' যায়। সদাশিব নিজেই গাড়ি বের করে' বেরিয়ে পড়লেন। তার সঙ্গে রইল রামলক্ষ্মণ ঠাকুর, গীতিয়ার স্বামী আর জিতু। রিভল্‌বারটাও সঙ্গে নিলেন।

সদাশিব যখন পৌঁছলেন তখন যা হবার হ'য়ে গেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। টর্চ ফেলতে ফেলতে সদাশিব ঘরে ঢুকলেন। গিয়ে দেখলেন মেঝের উপর বিস্রস্তবাসা ছিপলী পড়ে আছে। ঘরের কোণে আর একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে ছিল একটা লাঠি। সদাশিবকে দেখেই সে লাঠি চালাল। লাঠিটা সজোরে এসে লাগল সদাশিবের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন।

উনিশ

সদাশিব অনুভব করলেন তিনি যেন কার কোলের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন।

তিনি জিগ্যেস করলেন—"কে—"

"আমি ছিপলী—"

ছিপলীই তাঁর মাথাটা কোলে নিয়ে বসেছিল।

"এখনও কি রাত পোহায়নি ?"

গীতিয়া বললে, "অনেকক্ষণ সকাল হ'য়ে গেছে।"

"কই, আমি তো আলো দেখতে পাচ্ছি না—"

সদাশিবের চোখের ভিতর হেমারেজ হয়েছিল। তিনি অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন।

শহর থেকে একজন ডাক্তার এসেছিলেন। তিনি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেন।

সদাশিব যেতে চাইলেন না।

আস্তে আস্তে বললেন, "আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।"

খরবটা ছড়িয়ে পড়ল দেখতে দেখতে।

হাটের লোক, বাজারের লোক ভেঙে পড়ল ছিপলীর বাড়িতে। বাঙালীরা কেউ যাননি। তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল অবশ্য। কেউ বললেন, লোকটা এক্সেনট্রিক, কেউ বললেন, বাহাদুরি করতে গিয়েই মৃত্যু হ'ল লোকটার, কারও মতে আসলে উনি চরিত্রহীন লোক ছিলেন, হাটে-বাজারে যুবতী মেয়েদের পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াতেন। এর নজীরস্বরূপ তিনি হ্যাভলক এলিস, ফ্রয়েড থেকে বচন উদ্ধৃত করলেন। বাঁড়ুয্যে মশাই-ই নাকি কেবল বলেছিলেন—"উনি নররূপী দেবতা ছিলেন।" ডি. আই. জি. ছিপলীর বাড়ীর চারিদিকে সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন করে' দিয়েছিলেন। আলী হাউ হাউ করে' কাঁদছিল কেবল। গীতিয়া, কেব্‌লী, নারাণও কাঁদছিল। সবারই চোখে জল।

আচ্ছন্নের মতো পড়ে' ছিলেন সদাশিব। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছিলেন।

"কে আবদুল, জ্বর ছেড়েছে ? এখন বাজারে যেও না, দু'দিন বিশ্রাম নাও—"

"ফালতু তোর কামিজটা তো ঠিক ফিট্ করেনি। রমজান দরজির কাছে যাস, সে মাপ নিয়ে নেবে একটা—"

"না, মঙ্গলদাস, নুনটা তুমি ছেড়েই দাও। নুন খাচ্ছ বলেই পা দু'টো ফুলছে। নুন ছেড়ে দাও। দুধ-ভাত খাও—"

"কে, আবদুলের মা? নানি, তোর চোখ ঠিক করে' দিতে পারলাম না। আমি অন্ধ হ'য়ে গেলাম।"

"নারাণ নাকি, কেবলী বলেছে ভালোভাবে থাকবে এবার।"

"ও কে? সরখেল মশাই, ইলিশ মাছ পেয়েছেন? বাঃ—"

"আজবলাল এসেছে? আজ ফিস্ট লাগাও একটা। সবাই খাক। ভালো মাছ মাংস পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

"মহেন্দ্রবাবু নাকি? সেরে গেছেন? রসগোল্লা খেয়ে সেরে গেলেন? এ তো বড় আশ্চর্য! রোগা হ'য়ে গেছেন দেখছি। আমার মনে হয় কিন্তু রসগোল্লাটা বেশী না খাওয়াই ভালো—"

"মালতী? কেদার-বদরি ঘুরে এলি? বাঃ, কাশ্মীর কেমন লাগল? ভালো তো লাগবেই, ভূ-স্বর্গ ওর নাম। এইবার দাক্ষিণাত্যে বেড়িয়ে আয়। কন্যাকুমারী শুনেছি অপূর্ব—"

"কে ভগলু মহলদার? সন্দেশ এনেছ? তোমার বেটীর সাদি হ'য়ে গেল। বাঃ বাঃ। থাক আর প্রণাম করতে হবে না।"

"ছিপলী আমার রিভল্‌বারটা তুই রেখে দে। তোর নামে লাইসেন্স করিয়ে দেব। ওটা সঙ্গে থাকলে কেউ আর কিছু বলতে পারবে না।"

"গীতিয়ার স্কুলটাকে আরও বড় করতে হবে। গীতিয়া পারবি তো? তুইও পড়, প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাস করে' ফেল—"

"মনু? ওই দেখ, তোমার জন্যে জর্দা আনতে ভুলে গেলাম। তোমার কাশীর জর্দার কৌটোটা আলমারির মধ্যে আছে। ভেবেছিলাম নিয়ে আসব। সোহাগ বিলেতে চলে' গেছে, সেখানেই বাড়ি করেছে, সুখে আছে—"

ক্রমশঃ প্রলাপও বন্ধ হ'য়ে গেল। ঠোঁট দুটো নড়ত খালি, কি বলতেন কিছু বোঝা যেত না।

দিন দুই পরে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

মালতী বা সোহাগকে খবর দিতে পারা যায়নি। ছিপলীই তাঁর মুখাগ্নি করল।

www.boiRboi.blogspot.com

ছোট গল্প ঃ নাটিকা

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

বেহুলা

মেয়েটিকে দেখে প্রথমেই একটু যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমার। কেন যে হয়েছিল তা তখন অত বিশ্লেষণ করবার সময় ছিল না। চারিদিকে রোগী ঘিরে ছিল আমাকে। যে-সব রোগী-রোগিণী প্রায়ই আসে আমার কাছে, মেয়েটি সে দলের নয়। অচেনা মুখ। দেখেই একটু চমক লেগেছিল, সে সুন্দরী বলে' নয়, কমবয়সী বলেও নয়, তার চোখে-মুখে কি যেন একটা ছিল যা অস্বাভাবিক, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে জেনেছি চাপা প্রতিহিংসার আগুন ওর অন্তরে জ্বলছিল। তারই হলকা আমি দেখতে পেয়েছিলাম ওর মুখে। মনের ভিতর যে আগুন জ্বলে তা গোপন করা যায় না।

মেয়েটি রোগারোগা, রঙ কালো, চোখ-মুখের হাব-ভাব মন্দ না হলেও নিখুঁত নয়। একটা বন্য বর্বরতার ছাপ যেন আছে। চুলে তেল নেই। রুক্ষ চুলগুলো কোঁকড়ান। এত কোঁকড়ান যে মনে হয় অসংখ্য সর্পশিশু বেশ জড়াজড়ি করে' ফণা তুলে আছে। অধরে অতি সামান্য একটু মুচকি হাসি। তা বাড়েও না, কমেও না। মনে হয় হাসিটা যেন বন্দিনী হয়ে আছে।

আমার কাছে মেয়েটি এসেছিল ঘায়ের ওষুধ নিতে। মাথার ঘায়ের ওষুধ। মেয়েরা যেখানে সিঁদুর পরে ঠিক সেইখানে একজিমার মত হয়েছিল, সমস্ত সীমন্তটা জুড়ে। পরীক্ষা করে' দেখলাম কালো-কালো চাপড়া-চাপড়া মামড়ির মত একটা জিনিস একজিমাটাকে ঢেকে রেখেছে। সেটা পরিষ্কার করে' তলার ঘা-টাকে পরীক্ষা করলাম। একজিমার মত চুলকানিই একটা, কিন্তু তার চেহারাটা বেশ রাগী-রাগী, আমাদের ডাক্তারী ভাষায় অ্যাংগ্রি লুকিং। আমার সন্দেহ হ'ল আলকাতরা জাতীয় কোন জিনিস মেয়েটি ওর ওপর লাগিয়েছে বোধ হয়। একজিমা সারাবার জন্যে অনেকে লাগায়।

বললাম, "ঘায়ের উপর আলকাতরা লাগিও না।"

মেয়েটির মুখের মুচকি হাসি কমলও না, বাড়লও না। চোখের পাতা দুটি কেবল বার কয়েক ঘন ঘন নড়ল। একটি কথা বলল না সে। যে মলমটা দিলাম সেইটে নিয়ে চলে' গেল।

চার-পাঁচদিন মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। একদিন বিকেলবেলা গঙ্গার

ধার দিয়ে অতি সন্তর্পণে মোটর চালিয়ে আসছি, রাস্তাটা খুব খারাপ, আশেপাশে ঝোপঝাড়ও প্রচুর, হঠাৎ দেখতে পেলুম মেয়েটি অশ্বত্থগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভাঙা কুঁড়েঘরের পাশে। জেলেরা যখন মাছ ধরতে আসে, তখন ওই কুঁড়েঘরে থাকে। এখন খালি, ভেঙেচুরেও গিয়েছে।

ওকে দেখে গাড়ি থামালাম আমি। মনে হ'ল ওর মাথার ঘা দিয়ে রক্ত পড়ছে।

"এখানেই থাক না কি তুমি ?"

মাথা নেড়ে ভাঙা কুঁড়েঘরটা দেখিয়ে দিলে।

বললাম, "ওই ভাঙা ঘরে থাক কি করে' ?"

কোন উত্তর দিলে না। মুখের মুচকি হাসি তেমনি স্থির হ'য়েই রইল।

"তোমার বাড়ি কোথা ?"

চুপ করে' রইল। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ঝলক যেন দেখতে পেলাম একটু। ভাবটা—আমার সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন তোমার, যেখানে যাচ্ছ যাও না। একটু চুপ করে' থেকে কিন্তু জবাব দিলে, "বৈরিয়া গাঁয়ে।"

"সে আবার কোথা ?"

"আমদাবাদের কাছে"

"কোন্ জেলা ?"

"পূর্ণিয়া"

"মাথার ঘায়ে মলম লাগিয়েছিলে ?"

"রোজ লাগাই"

"তবু ত রক্ত পড়ছে দেখছি"

চুপ করে রইল।

"আবার এসো আমার ডিসপেন্সারিতে। ভালো করে' দেখব। ঠিক সিঁদুর পরবার জায়গায় একজিমা হ'ল কী করে' ? আশ্চর্য ত! চুলকেছিলে নাকি ? রক্ত পড়ছে"

মেয়েটি কিছু বলল না। হঠাৎ আমার মনে হ'ল রক্তটাই সিন্দুরের স্থান অধিকার করেছে যেন। মনে হ'ল, যে জেলেরা প্রতিবার এখানে মাছ ধরতে আসে, মেয়েটি তাদেরই বোধ হয় আত্মীয়া। তাই ওই কুঁড়েটা অসঙ্কোচে দখল করেছে। যদিও মেয়েটির চোখে-মুখে একটা বিরুদ্ধভাব সজাগ হ'য়ে ছিল, তবু আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমরা কি ? জেলে না কি ?"

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, "না, আমরা সাপুড়ে"

মেয়েটি মলম নিতে আমার কাছে আর আসে নি। দিন সাতেক পরে একটি ছেলে এসে আমায় খবর দিলে গঙ্গার ধারে অশ্বত্থতলায় একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকে নিয়ে আসব কি? আমি নিজেই গেলুম। গিয়ে দেখি, সেই মেয়েটি! খুব জ্বর হয়েছে। মাথায় ঘা-টা দগদগে হ'য়ে উঠেছে আরও। হাসপাতালে খোঁজ করলাম, বেড খালি নেই। তখন ছেলেদের বললাম, "ওই কুঁড়েঘরটাতেই নিয়ে যাও ওকে। খড় পেতে বিছানা করে' দাও। তোমাদের ছাত্র-সমিতি ফাণ্ডে টাকা আছে?"

ছেলেটি ছাত্র-সমিতির একজন সভ্য। দুর্গত দুঃখীদের সাহায্য করাই তাদের ব্রত।

"খড় কেনবার টাকা আছে, কিন্তু ওষুধ কেনবার টাকা নেই"

ওষুধের ভার আমিই নিলাম।

খড় কিনে বিছানা করবার জন্যে দুটি ছেলে ঘরের ভিতর ঢুকল। আমিও ছিলাম সে-সময়।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ওর বিছানাপত্র কিছু নেই ভিতরে?"

"কিছু না। একটা কাপড়ে বাঁধা ঝুলি শুধু ঝুলছে চাল থেকে"

"আর কিছু নেই?"

"না"

প্রায় মাসখানেক ভুগে মেয়েটির জ্বর ছাড়ল। অবশ্য ছেলেরা তার নিয়মিত শুশ্রূষা করতে পারত না। কেবল পথ্য দিয়ে আসত। আমি প্রায় প্রতিদিন কিংবা একদিন অন্তর তাকে গিয়ে দেখে আসতুম। একদিন একটি ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে আমাকে যে খবর দিলে তা অবিশ্বাস্য। এরকম যে হ'তে পারে তা কল্পনাতীত।

ছেলেটি বললে, "সর্বনাশ হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু। মেয়েটিকে গোখরো সাপে কামড়েছে। আর বোধ হয় বাঁচবে না।"

"সাপে কামড়েছে? কি করে বুঝলে তুমি?"

"আমি স্বচক্ষে দেখলুম যে। আমি সাবু দিতে গেছি, গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ ওর গলায় পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে আর তার গালে মুখে ছোবলাচ্ছে। কী প্রকাণ্ড ফণা সাপটার! আমি ভয়ে পালিয়ে এলুম। বাদল

আর কানাইকে ডাকলাম, তারা বাড়ি নেই। আপনি যাবেন একবার আপনার বন্দুকটা নিয়ে?"

গেলাম। গিয়ে দেখলাম, গলায় নয়, সাপটা তার ডান বাহুতে জড়িয়ে রয়েছে। সাপের ফণাটা খুব জোরে চেপে রয়েছে মেয়েটি হাত দিয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম আমি খানিকক্ষণের জন্য। বন্দুক কোথায় ছুঁড়ব? তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল লেজের খানিকটা কাটা। রক্ত পড়ছে।

মেয়েটির তখনও জ্ঞান ছিল।

জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, "আজকে ও জো পেয়েছে। মাস খানেক বিছানায় পড়ে আছি, ওকে কামাতে পারি নি। বিষদাঁত উঠেছে ওর"

"সাপ কি তোমার ওই ঝুড়িতে ছিল নাকি?"

"হ্যাঁ। আমার বিয়ের দিন বাসরঘরে ঢুকে আমার স্বামীকে কামড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ধরে' ফেলেছিলাম ওকে আমি। বেহুলা যেমন যমের সঙ্গ ছাড়ে নি, আমিও তেমনি ওর সঙ্গ ছাড়ি নি। রোজ ওকে বলেছি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও, আর এই গঙ্গার তীরে তীরে হেঁটে হেঁটে আসছি। গঙ্গার জলেই তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল—"

"সাপের ল্যাজটা কাটা দেখছি।"

"ওরই রক্ত দিয়ে সিঁথেয় সিঁদুর পরি যে রোজ। আজও পরতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আজ ওকে সামলাতে পারলাম না"

দেখলাম মাথায় রক্ত-সিঁদুরের রেখা। বাঁ হাতের তর্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে রক্তাক্ত লেজের টুকরোটাও দেখতে পেলাম।

একটু পরেই তার মৃত্যু হ'ল। সাপটারও হল, কারণ যে বজ্রমুষ্টিতে সে সাপের মাথাটা চেপে ধরেছিল মৃত্যুও তা শিথিল করতে পারেনি।

চম্পা মিশির

"জিৎ গিয়া হুজুর।"

সোৎসাহে রমজানের ছেলে সলিম এসে খবরটা দিল। তারপর সেলাম করে' চলে' গেল।

মনে পড়ল চম্পা মিশিরকে। এখনও আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, সোজা হ'য়ে বসে' আছেন টমটমের উপর ঘোড়ার রাশ ধরে', আর যার টমটম

সে পিছনের দিকে বসে' আছে স-সঙ্কোচে। বেশ লম্বা লোক ছিলেন, কিন্তু চওড়া নয়, সরু লিকলিকে চেহারা। অসুস্থ নয়, ওই রকমই গড়ন। গোঁফ ছিল, দাড়ি ছিল না। গোঁফ সরু, ভালো করে লক্ষ্য না করলে বোঝাই যেত না। গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় বেমালুম মিশে থাকত। গায়ের রঙ কালো ছিল না। গোধূম বর্ণ। গোঁফও তাই। ছোট ছোট চোখের তারাও কটা ছিল। মেরজাই পরতেন, মাথায় থাকত মৈথিলী পাগড়ি, কাপড় আঁট-সাঁট করে পরা, পায়ে দেশী নাগরা জুতো সবণ মুচির তৈরী, অন্য মুচির জুতো পছন্দ হ'ত না তাঁর। তাঁর এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার অনেক আগেই তাঁকে দেখেছিলাম আমি। রোজই দেখতাম। বস্তুতঃ না দেখে উপায় ছিল না। আমার ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে যে রাজপথ চলে গেছে তার উপর টমটম হাঁকিয়ে রোজ যেতেন তিনি। এতেও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণতঃ যার টমটম সে-ই হাঁকায়, আরোহী পাশে বা পিছনে বসে' থাকে। আরোহী চম্পা মিশির কিন্তু নিজেই টমটম হাঁকাতেন, যার টমটম সে পাশে বা পিছনে বসে' থাকত। এ খবরটাও আমি পরে জেনেছি।

যেদিন উনি আমার দোকানের সামনে টমটম থেকে পড়ে গিয়ে একটু আঘাত পেলেন, সেই দিনই ডাক্তার হিসেবে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হ'ল। আঘাত সামান্যই, পায়ের গোছটা একটু ছড়ে গিয়েছিল। পায়ে একটু টিঞ্চার আইয়োডিন লাগিয়ে দিলাম। এর পর চম্পা মিশির যা করলেন তাতে আমি নিঃসন্দেহ হলুম, ওঁর পায়ের হাড়ে কিছু লাগে নি। উনি লাফিয়ে নেবে গেলেন আমার ল্যাবরেটরির বারান্দা থেকে, সঙ্গের লোকটাকে হুকুম করলেন, ঘোড়াটাকে ধর ভালো করে', মুখটা শক্ত করে' ধরে' থাক। সে ধরতেই আগা-পাশ-তলা চাবকালেন ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে পিছু হটছিল বলেই পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেজন্যে শাস্তি দিলেন তাকে। তখনও আমি বুঝতে পারি নি যে, মিশিরজি টমটমের মালিক নন, আরোহী মাত্র। ঘোড়াটাকে পিটিয়ে মিশিরজি আবার আমার ল্যাবরেটরিতে এসে বসলেন এবং ভাঙলেন কথাটা। মৈথিলীমিশ্রিত হিন্দীতেই কথা বলতেন তিনি। আমি ভাবার্থটা অনুবাদ করে' দিচ্ছি। বললেন, এমন বোকা এ দেশের লোক ডাক্তারবাবু, পয়সা দিয়ে ওই ঘোড়া কিনেছে। ও যতটা এগোয়, তার চেয়ে পিছোয় বেশী। এ টমটমে কোন্ সোয়ারি চড়বে বলুন? আমাকেই এখন ঠিক করতে হবে, কদিন লাগবে কে জানে?

পরে আরও অনেক ঘটনা থেকে জেনেছি, বাজে ঘোড়াকে ঠিক করাতেই ওঁর আনন্দ। ইংরেজীতে যাকে বলে রঙ হর্স (wrong horse) তাকে ব্যাক করেও উনি আনন্দ পেয়েছেন জীবনে। ওঁর বাড়ি গঙ্গার ওপারে মফস্বলে, অনেক জমি-জায়গা আছে, খাওয়া-পরার ভাবনা ছিল না। কিন্তু শহরে উনি প্রত্যহ আসতেন স্টীমারে পেরিয়ে। বাড়ি থেকে স্টীমারঘাটে আসতেও প্রায় মাইলখানেক হাঁটতে হ'ত ওঁকে। কিন্তু তাতে আনন্দই পেতেন উনি, বলতেন, এইভাবে হাঁটার ফলে শরীর বেশ ভালো থাকে। স্টীমারঘাটে নেবেই একটা টমটম ভাড়া করতেন সমস্ত দিনের জন্য। যে টমটমের ঘোড়া খারাপ সেইটেই পছন্দ করতেন তিনি। তা বলে' তাকে যে কম ভাড়া দিতেন তা নয়, বরং বেশীই দিতেন। আর টমটমটা নিজেই হাঁকাতেন। সেই খারাপ ঘোড়া যতদিন না ঠিক হ'ত ততদিন সেই টমটমকেই বাহাল করে' রাখতেন। এই সব কারণে মিশিরজিকে আরোহীরূপে পাবার জন্য সব টমটমওলাই ব্যগ্র হ'ত। দু-একজন ঠকাতও। অর্থাৎ টমটমের ঘোড়া খারাপ না হ'লেও তাঁকে আরোহীরূপে পাবার জন্যে মিথ্যে করে' বলত যে, তার ঘোড়া খারাপ। কিন্তু মিশিরজির কাছে এসব চালাকি চলত না, ঘোড়ার রাশ থাকত তাঁর হাতে। একদিন আমার ল্যাবরেটরির সামনে টমটম থামিয়ে নেবে এসে বললেন, ডাক্তারবাবু, একটা রুগী নিয়ে এসেছি, দেখুন তো শালার যদি কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন, আরে, ইধার আ—

টমটমওলা ছোঁড়াটা মুচকি হেসে নেবে এল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে এর?

মিশিরজি তার মুখের দিকে চিন্তিত মুখে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, শালা ঝুঠ্ঠা ছে। অর্থাৎ শালা মিথ্যাবাদী। টমটমের ঘোড়া ভালো কিন্তু খারাপ বলে' চালিয়েছে তাঁর কাছে। হেসে বললাম, এর তো কোনও দাবাই নেই আমার কাছে—

চম্পা মিশির তখন ছোঁড়ার একটা কান টেনে বললেন, তা হলে পুরানা দাবাই দিয়ে দি একটু। অমন তেজী ভালো ঘোড়া, বলে কি না খারাপ—

তারপর তাকে একটা সিকি দিয়ে বললেন, দু আনার ছাতু তুই খা, আর দু আনার ঘোড়াটাকে খাওয়া। পেট ভরা থাকলে মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরুবে না।

সিকিটা নিয়ে সানন্দে বেরিয়ে গেল ছোঁড়া, মিশিরজি আমার দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে গেলেন তার পিছু-পিছু।

মিশিরজি শহরে এসে ব্যস্ত থাকতেন সমস্ত দিন। আদালতেই বেশির ভাগ সময় কাটত তাঁর। রোজই তাঁর একটা-না-একটা মকদ্দমা থাকত। তাঁর নিজের মকদ্দমা নয়, পরের মকদ্দমা। যে পক্ষ দুর্বল সেই পক্ষের মকদ্দমার তদ্বির করতেন উনি। তার জন্য উকিল ব্যবস্থা করতেন, সাক্ষী যোগাড় করতেন, নিজেও পরামর্শ দিতেন। শহরে তাঁর একটা ছোট বাসা ছিল, সেই বাসায় আশ্রয় দিতেন তাদের। একজন ভালো উকিলের মুখে শুনেছি, মিশিরজি মকদ্দমা বুঝতেনও বেশ। মোটামুটি আইনের জ্ঞান ছিল, তা ছাড়া বিপক্ষকে জেরা করবার এমন সব ঘাঁত-ঘোঁত বলে দিতে পারতেন যে, অনেক বুদ্ধিমান উকিলেরও তাক লেগে যেত। সুতরাং মকদ্দমাতেও মিশিরজিকে স্বপক্ষে টানবার জন্য চেষ্টা করত অনেকে। এ বিষয়ে খুব সুনাম ছিল তাঁর। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ সব করে' তাঁর কি লাভ হয়? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সময় কাটে। কিন্তু তিনি কখনও সবলের পক্ষ অবলম্বন করেন নি। যার কেস কম-জোর, যার অর্থাভাব, যে পুলিসের বিষ-দৃষ্টিতে পড়ে' নাজেহাল হচ্ছে, চম্পা মিশির সর্বদা তার পক্ষে। উকিলরাও, বিশেষ করে নূতন উকিলরা, খুব সমীহ করত তাঁকে। সাধারণতঃ যে সব উকিলের মক্কেল জুটত না তাঁদেরই নিযুক্ত করতেন তিনি। দরকার হ'লে কোনও নামজাদা উকিলের পরামর্শ যে না নিতেন তা নয়, কিন্তু মকদ্দমার সম্পূর্ণ ভার থাকত নূতন উকিলটির উপর। পরে যাঁরা নামজাদা উকিল হয়েছিলেন তাঁরাও প্রথম জীবনে মিশিরজির সাহায্য পেয়েছিলেন, সুতরাং সে মহলেও মিশিরজির খুব খাতির ছিল। একবার এক উকিল কমিশন দিতে চেয়েছিলেন তাঁকে। মিশিরজি জিব কেটে উত্তর দিয়েছিলেন, আরে রাম রাম ওকিল সাহেব, আমি ব্রাহ্মণ, বেনিয়া নই। এ আমার পেশা নয়, খেলা।

আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমাকেও অনেক রোগী পাঠিয়েছেন তিনি মফস্বল থেকে। মফস্বলের নিরীহ রোগীদের কাছে আমার সম্বন্ধে এমন সব অত্যুক্তি করতেন যা শুনে আমি লজ্জিত হতাম। আমি নাকি খুন পরীক্ষা করে তড়াক্সে (চট করে) সমস্ত রোগ নির্ণয় করে' ফেলতে পারি। মাঝে মাঝে অপ্রস্তুতও হ'তে হ'ত। একবার তাঁর প্রেরিত এক রোগী এসে বলল যে, তার রক্ত পরীক্ষা করে' বলে দিতে হবে তার শ্বশুরের রক্তে কোনো দোষ

www.boiRboi.blogspot.com

আছে কি না! বললাম, আমি তো পারব না। কিন্তু লোকটা না-ছোড়। বলল, মিশিরজি যখন বলে' দিয়েছেন তখন নিশ্চয় আপনি পারবেন। ফী যা লাগে আমি দেব, কাজটা করে' দিন। বললাম, তোমার শ্বশুরকে পাঠিয়ে দাও। সে বলল, তিনি থাকলে তো নিয়েই আসতাম। কিন্তু তাঁর নামে সম্প্রতি হুলিয়া বেরিয়েছে বলে তিনি কোথায় যে আত্মগোপন করে' আছেন তা কেউ জানে না। বললাম, তা হলে আমি পারব না।

পরদিন চম্পা মিশিরকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হ'ল সে।

চম্পা মিশির এসেই আমাকে আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, খুন লে লিজিয়ে ডাক্তার সাহেব।

আমি পুনরায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চম্পা মিশির হাত তুলে ঈষৎ অধীরভাবে যা বললেন তার ভাবার্থ—আমি এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, আপনি রক্তটা তো আগে নিয়ে নিন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাসারম্যান টেস্টের জন্য নিলাম খানিকটা রক্ত।

মিশিরজি লোকটার দিকে ফিরে বললেন, কিস্ রাখ্‌খো। লোকটি একটি একশ' টাকার নোট আমার সামনে রাখল। আমি আবার বলতে যাচ্ছিলাম যে, একশ' টাকা এর ফী নয়। মিশিরজি আবার হাত তুলে বারণ করলেন আমাকে। আদেশের ভঙ্গিতে আবার বললেন, উঠা লিয়া যায়। তুলে নিলাম নোটটা।

মিশিরজি তখন সেই লোকটার দিকে ফিরে বললেন, অব তুম্ যাও।

চলে গেল সে।

তখন আমি মিশিরজিকে বললাম, আপনি যা বলছেন তা তো করা অসম্ভব। ওর রক্ত দেখে ওর শ্বশুরের—

মিশিরজি বললেন, আপনি ওরই রক্তে দোষ আছে কি না দেখুন। কিন্তু রিপোর্ট দেবেন পি. সিং.—এই নামে। ওর নাম প্রয়াগ সিং, ওর শ্বশুরের নাম প্রাণেশ্বর সিং।

আমি বললাম, এ রকম চাতুরীর অর্থ কি!

মিশিরজি তখন যা বললেন তার ভাবার্থ হচ্ছে, এ লোকটির ছেলে হ'য়ে হ'য়ে মরে' যাচ্ছে। সিভিল সার্জেন বলেছেন—হয় এর রক্তে, না হয় এর স্ত্রীর রক্তে, কিংবা উভয়েরই রক্তে সিফিলিসের বিষ আছে। কিন্তু এরা দুজনেই হলফ করে' ঘোষণা করেছে যে এদের চরিত্র স্ফটিকের মত নির্মল।

ওর স্ত্রী তো রক্ত পরীক্ষাই করাতে চায় না। যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে, ভয়ানক কলঙ্ক রটে যাবে একটা। মানী বংশ ওদের। সব দিক বাঁচাতে হবে। তখন আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলে গেল। পলাতক খুনী শ্বশুরের ঘাড়ে দোষটা চাপালে সব দিক্ রক্ষে হয়। এ ছোকরার রক্তে দোষ পাবেন আপনি। কারণ ও বাইরে সাধু সেজে থাকে, কিন্তু আমি জানি, ও ডুবকি মেরে জল খায়। আপনি রিপোর্ট দেবেন পি. সিং—এই নামে।

বললাম, কিন্তু একশ' টাকা তো আমার ফী নয়।

তা-ও জানি আমি। এটা ওর জরমানা ঝুট বলেছে বলে'।

রক্তে দোষ ছিল। চিকিৎসার পর ছেলেও হয়েছিল ওদের। ছেলের অন্নপ্রাশনে আমি নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম। গরদের জোড় নিয়ে প্রণাম করেছিল আমাকে প্রয়াগ সিং।

মিশিরজি সম্বন্ধে নানা ঘটনা মনে পড়ছে।

আর একটা ঘটনা বলি। একবার আমার বাড়িতে এসেছিলেন। চা দিতে গেলাম, বললেন চা খান না।

শরবত আনিয়ে দেব ?

তা দিতে পারেন।

শরবত যখন এল তখন বললেন, আপনি খাবেন না ?

আমার তো চিনি খাওয়ার উপায় নেই। ডায়াবিটিস আছে—

শরবতটি শেষ করে' মুখ মুছে বললেন, ইয়ে বাৎ ? চিনি সে আপকো ঝগড়া হ্যায়, আচ্ছা, বিনা চিনিসেই আপকো শরবত পিলাউঙ্গা—

তার পরদিন এক ঝুড়ি বড় বড় লেবু নিয়ে এসে হাজির হলেন। বললেন, এর নাম হচ্ছে শরবতিয়া লেবু। দুটো লেবুর রস গেলে এক গ্লাস জলে দিয়ে দিন, এক গ্লাস শরবত হয়ে যাবে, চিনি দিতে হবে না। দেখলাম সত্যিই তাই। অবশ্য এত মিষ্টি লেবুও ডায়াবিটিস রোগীর পক্ষে অচল, কিন্তু সে কথা তাঁকে বলি নি। পরে তিনি শরবতিয়া লেবুর গাছও একটা দিয়েছিলেন আমাকে; আমার হাতার এক ধারে এখনও আছে বোধ হয় সেটা।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আমাকে ডেকেছিলেন একবার।

আমাকে দেখেই হেসে বললেন, চিকিৎসার জন্যে নয়, শেষ দেখা করবার জন্যে ডেকেছি। এবার আর মকদ্দমায় জেতবার আশা নেই। মহাকালের শমন এসেছে, যেতেই হবে। ডাক্তারের সার্টিফিকেটে কাজ হবে না—

তারপর একটু থেমে বললেন, যাওয়ার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করে' যাচ্ছি, যদি পারেন কিছু ব্যবস্থা করে' দেবেন। এখানে রমজান বলে একটা গরিব লোক আছে। ভেড়া আছে তার একটা। ভেড়াটা আগে খুব ভালো লড়ত। রমজান ওকে লড়িয়ে রোজগার করত কিছু। কিন্তু গত দু বাজিতে হেরে' গেছে ভেড়াটা। রমজান বলছে, ও দানা হজম করতে পারছে না, তাই কম-জোর হয়ে গেছে। এখানে কাছেপিঠে তো ভালো পশু-চিকিৎসক নেই। আপনি কি ব্যবস্থা করতে পারবেন কিছু? লোকটা গরিব, ওই ভেড়া লড়িয়েই রোজগার করত—

বললাম, আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে'।

দু'দিন পরে খবর পেলাম মিশিরজি মারা গেছেন।

মানুষেরই ওষুধ দিয়েছিলাম ভেড়াটাকে। বাজি জিতেছে যখন, উপকার হয়েছে নিশ্চয়ই।

মনে হচ্ছে, চম্পা মিশিরের মতো লোকেরা কোথায় গেল, যারা কেবল দুর্বল মানুষদেরই সাহায্য করত, বাঙালী বিহারী হিন্দু মুসলমান—এসব ভেদ ছিল না যাদের কাছে···?

বাড়ি ফিরে দেখলাম, শরবতিয়া লেবুর গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে। তার চারদিক খুঁড়িয়ে, সার দিয়ে, জল দেওয়ালাম ভালো করে'। গাছটাকে বাঁচাতেই হবে।

বিনতা দস্তিদার

শ্রীবিরূপাক্ষ ভৌমিক যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স বাহান্ন বৎসর। তাঁর বন্ধু—একমাত্র বন্ধু—ত্রিপুরা সেন বলেন তিনি প্রেমে পড়ে বিনতাকে বিয়ে করেছিলেন। ত্রিপুরা সেন মানা করা সত্ত্বেও করেছিলেন। প্রেমে পড়লে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

ত্রিপুরাবাবুর সঙ্গে বিরূপাক্ষ ভৌমিকের আলাপ প্রায় বছর দশেকের। আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল ক্রমশ। প্রথম আলাপ হয়েছিল কারণ দু'জনেরই পেশা ছিল এক, দু'জনেই ইন্‌শিওরেন্সের দালাল। অন্তরঙ্গতা হবার আর একটা বিশেষ কারণ ছিল—দু'জনেই বেশ অশ্লীলতাপ্রিয় ছিলেন। দু'জনের কাছেই পর্নোগ্রাফির অনেক বই ছিল এবং দু'জনেই মেয়েদের সম্বন্ধে যে ধরনের

www.boiRboi.blogspot.com

আলোচনা করতেন তা ভদ্রলোকের পক্ষে অশ্রাব্য। এই প্রবৃত্তিই তাঁদের বন্ধুত্বকে নিবিড়তর করেছিল। বিরূপাক্ষবাবু বিপত্নীক এবং ত্রিপুরাবাবু অবিবাহিত, সেজন্য আরও জমেছিল অন্তরঙ্গতাটা। ভালবাসার ভাগীদার ছিল না কেউ। এক বাড়িতে বাস করতেন দু'জনে। এক গলিতে দোতলার উপর ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন তাঁরা। পাশাপাশি দুটি শোবার ঘর, তাছাড়া একটি বসবার ঘর এবং রান্নাঘর। দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট।

পর্নোগ্রাফি পড়া ছাড়া দু'জনের অবসরবিনোদনের আর একটি উপায় ছিল। সন্ধ্যার পর দু'জনে যখন মিলিত হতেন তখন আলোচনা করতেন কার চোখে সেদিন কি রকম মেয়ে পড়েছে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাব-ভাবের বর্ণনায় মশগুল হ'য়ে যেতেন তাঁরা।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন ত্রিপুরা এসে বললেন, "বুকে ছুরি মেরে দিয়েছে দাদা আজ। একেবারে ঘায়েল হয়ে গেছি!"

উৎসুক বিরূপাক্ষ বললেন—"কি রকম? কে মারল বুকে ছুরি—"

"বিনতা দস্তিদার!"

"সে আবার কে—!"

"আমাদেরই কম্পানির একটি এজেন্ট। আজই বহাল হয়েছে। আপিসে এসেছিল আজ। তুমি তো গেলে না, গেলে দেখতে পেতে কি মাল একটি! চোখের চাউনি যেন চাকু ছুরি। ঘ্যাঁচ করে' বুকে বসে' যায়।"

লালায়িত হয়ে উঠলেন বিরূপাক্ষ।

"ওফ্ বড্ড মিস করেছি তো!"

"মিস কর নি। আবার সে আসবে কাল। সে তোমাকে চেনে বোধ হয়। তোমার খোঁজ করছিল। আমি তাকে বলেছি কাল তুমি আপিসে আসবে"

"আমাকে চেনে? বিনতা দস্তিদার? মনে পড়ছে না তো। বয়স কত হবে—"

"কুড়ির নীচেই। অর্ধস্ফুট গোলাপ—"

বিনতার সঙ্গে বিরূপাক্ষের যখন দেখা হ'ল তখন একটা জিনিস দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তার মুখের নিচের দিকটা ওড়না দিয়ে ঢাকা। থুতনিও ভালো করে' দেখা যায় না। মনে হয় যেন কোনও বোরখা-পরা মেয়ে মুখের উপরার্ধ টা

খুলে দিয়েছে। আলাপ হবার পরই বিরূপাক্ষ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আপনার পোশাকের একটু নতুন রকমের বৈচিত্র্য আছে দেখছি। এদেশে হিন্দু মেয়েদের এরকমটা প্রায় দেখা যায় না—।"

বিনতা উত্তর দিয়েছিল—"না, এদেশের পোশাক নয়। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে মিশরে গিয়েছিলাম। সেখানে এই রকম পোশাক অনেক মেয়ে পরত। খু-উ-ব ভালো লাগত আমার। সেই জন্মে যখনই বাইরে বেরুই এই পোশাক পরি। দেখতে ভালো নয় ?"

"চমৎকার।"

···বিনতার সঙ্গে বিরূপাক্ষের ঘনিষ্ঠতা হ'তে বিলম্ব হয় নি। বিরূপাক্ষকে সেজন্য বেশী চেষ্টাও করতে হয় নি। বিনতাই বিরূপাক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে বেশী উৎসুক এই কথা মনে হয়েছিল ত্রিপুরা সেনের। বিনতাই হোটেলে নিমন্ত্রণ করত বারবার তাকে। সিনেমার টিকিট কিনে আনত তার জন্মে। তাকে একলা ডেকে নিয়ে যেত ইডেন গার্ডেনে, চিড়িয়াখানায়, হঠাৎ ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে উধাও হয়ে যেত দু'জনে মাঠের দিকে। বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন বিরূপাক্ষ, লোলুপ হ'য়ে উঠলেন ত্রিপুরা সেন। স্বাভাবিক নিয়মে ত্রিপুরা সেনের ঈর্ষাও হ'তে লাগল খুব। কিন্তু চতুর লোক ছিলেন ত্রিপুরা, মনের ভাব গোপন করার দক্ষতাও ছিল তাঁর। তিনি যে ঈর্ষাক্লিষ্ট বা লোলুপ, এটা ঘুণাক্ষরে জানতে দিলেন না বিরূপাক্ষকে। মাঝে মাঝে কেবল ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করতেন—"কি ভায়া, গাঁথতে পারলে ?"

বিরূপাক্ষ বলতেন, "আমারই গলায় বঁড়শি আটকে গেছে। ছটফট করছি।"

"থুতনির সামনের পরদা নেবেছে ?"

"না। সেটা ও সহজে নাবাবে না"

"কেন ?"

"নাবাবে না তার খুশি"

দিন কয়েক পরে বিরূপাক্ষ একদিন বললেন, "এইবার বোধ হয় যবনিকা পতন হবে মনে হচ্ছে"

"কি রকম—"

"ও আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বলছে বিয়ের পর ও থুতনির পরদা সরিয়ে ফেলবে।" ফুলশয্যার রাত্রেই ফেলবে বলছে"

www.boiRboi.blogspot.com

"একটা অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিয়ে করবে? সেটা কি বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে?"

"হবে না তা বুঝতে পারছি। কিন্তু ওকে আমার চাইই। ওর কালো চোখের চাউনি পাগল করেছে আমাকে। ও স্পষ্ট বলে' দিয়েছে বিয়ে না করলে ও ধরা দেবে না"

"কিন্তু তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই কেনা যায়। মূল্যের ইতরবিশেষ হ'তে পারে কিন্তু কেনা যায়। এ লাইনে চেষ্টা করে দেখ না"

"দেখেছি। বিনতাও বিক্রীত হতে রাজী, কিন্তু তার মূল্য ওই—বিবাহ করতে হবে"

বিনতার সঙ্গে বিরূপাক্ষ ভৌমিকের বিবাহ হয়েছিল অনতিবিলম্বে। ঠিক তার পরের ঘটনাটা খবরের কাগজে অনেকে হয়তো পড়েছেন। ফুলশয্যার রাত্রেই বিরূপাক্ষ ভৌমিকের মৃত্যু হয়েছিল। ডাক্তার ঘোষালের মতে হার্টফেল করে' মারা গিয়েছিলেন ভৌমিকমশাই। কাগজে এর বেশী খবর আর বেরোয় নি।

ত্রিপুরা সেন তাঁর ডায়েরিতে কিন্তু এ বিষয়ে যা লিখেছেন তা বিস্ময়কর।

তিনি লিখেছেন—"বিরূপাক্ষবাবুর ফুলশয্যার রাত্রে আমি আড়ি পেতে ছিলাম, তির্যকভাবে আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে। ইংরেজীতে যাকে বলে Vicarious pleasure. ঠিক আমার পাশের ঘরেই ফুলশয্যা হয়েছিল, আমাকে খুব অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি এজন্য। একটা জানালার ফুটো দিয়ে আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। বিনতা শেষ পর্যন্ত তার গলার সামনে সেই নীল ওড়না টাঙিয়ে রেখেছিল। বিয়ে হয়েছিল তিন আইন অনুসারে। সুতরাং সে ওড়না সরাবার প্রয়োজন হয় নি। বিনতা যখন ফুলশয্যার খাটে উঠল তখনও তার গলার সামনে নীল ওড়না। বিরূপাক্ষ বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। একটু অধীরকণ্ঠে বলল—"এইবার ওটা সরিয়ে দাও না বিনতা।" "এই যে দিচ্ছি"—বলে' বিনতা ওড়নাটা খুলে ফেলে দিয়ে এমন গ্রীবাভঙ্গি করে' বসে রইল যে আমি চমকে গেলাম। আমার মনে হ'ল ঠিক যেন একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে। অনেক সাপের গলায় কালো কালো ডোরা থাকে। বিনতার গলাতেও ছিল। চার-পাঁচটা ঘন-কালো রেখা। হঠাৎ মনে হয় চামড়ার নিচে বুঝি রক্ত জমে' আছে। চীৎকার করে' উঠল বিরূপাক্ষ—"কে, কে, কে তুমি? তুমি কি—?" খিলখিল করে' হেসে উঠল বিনতা। তারপর

একেবারে অন্যরকম কণ্ঠে জবাব দিল—"হ্যাঁ, আমি সেই।" আর্তনাদ করে' অজ্ঞান হয়ে গেল বিরূপাক্ষবাবু। বিনতা বিছানা থেকে নেবে এসে ঘরের খিল খুলল। খুলেই আমাকে দেখতে পেল সে। সহজকণ্ঠে বলল—"ডাক্তার ঘোষালকে একবার খবর দিন তো। উনি অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন।" ডাক্তার ঘোষাল এসে ভৌমিকমশাইকে আর জীবিত দেখেন নি। বিনতা ঠিক তারপরই চলে গেল। ঠিক যেন উপে গেল। শবানুগমনও সে করে নি। আশ্চর্য মেয়ে—"

বিরূপাক্ষবাবুর মৃত্যুর এক বছর পরে সি. আই. ডি. বিভাগের একটি কর্মচারী একদিন বিরূপাক্ষবাবুদের অফিসে এলেন। তিনি একটি ফোটো ত্রিপুরা সেনকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন—"এই চেহারার কোনও লোক কি আপনাদের অফিসে কাজ করেন?" ত্রিপুরা সেন অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন ফোটো-টার দিকে। চেনা-চেনা মনে হচ্ছে অথচ ঠিক চিনতে পারছেন না। তারপর হঠাৎ পারলেন। বিরূপাক্ষবাবুর ফোটো, কিন্তু অনেকদিন আগের, সম্ভবত তাঁর যৌবনকালের।

বললেন—"বিরূপাক্ষবাবুর ফোটো মনে হচ্ছে—"

"হ্যাঁ, তিনি ওই ছদ্মনামেই আপনাদের অফিসে কাজ করেন শুনেছি। তিনি কোথায়?"

"তিনি তো বছরখানেক আগে মারা গেছেন"

"ও"

"তাঁকে কেন খুঁজছেন?"

"তিনি একজন ফেরারী আসামী। প্রায় একুশ বছর আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করেছিলেন—"

"বলেন কি—!"

ত্রিপুরা সেনের চোখের সামনে বিনতার গলার কাল দাগগুলো সহসা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

রঘুবীর রাউত

জমিদারী-প্রথা তখনও অবলুপ্ত হয় নি। মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত রঘুবীর রাউতের দোর্দণ্ড প্রতাপে তখনও বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাচ্ছে।

www.banglabookpdf.com

মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল তখন, ইংরেজের কড়া আইন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু রঘুবীর রাউত নিজের আইনে চলেন। সে আইনের সঙ্গে ইংরেজের আইনের গরমিল হ'লেও চিন্তিত হ'ন না তিনি। টাকার জোরে সব ঠিক হ'য়ে যায়। তা বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। বরং সুবিচার করবার জন্যেই তিনি প্রচলিত আইন অমান্য করতেন। তিনি ব্যাপারটার মর্মস্থলে একেবারে তীরের মত সোজা সবেগে পৌঁছে যেতেন। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

এক ছোকরা দারোগা এসে তাঁর জমিদারিতে উৎপাত করতে লাগল একবার। লোকের খাসিটা-পাঁঠাটা নিয়ে যায়, দাম দেয় না। ঘুষ খেয়ে আসল অপরাধীকে ছেড়ে দেয়, নিরপরাধ গরীবকে নিয়ে টানাটানি করে। রাউত মশায়ের গুপ্তচর (লোকে গোপনে তাকে মাহুত বলত) মুলুক দাস এসে খবরটি রাউত মশায়ের কর্ণগোচর করল। রাউত মশায় ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "সাবধান করে দাও ওকে। পুলিসের লোক, হট করে ঘাঁটাতে চাই না; কিন্তু বেশী যদি বাড়াবাড়ি করে, শিক্ষা দিয়ে দেব।"

সপ্তাহ-খানেক পরে মুলুক দাস এসে বলল, "সাংঘাতিক লোক ব্যাটা। আমাদের হীরু গোয়ালার মেয়েটাকে নিয়ে টানাটানি করেছে রাত্রে। সবাই হৈ-হৈ করে উঠতেই বাইকে চড়ে পালাল। আজ সকালে আমি থানায় গিয়েছিলাম। আড়ালে ডেকে বললাম আপনার কথা। জবাবে কী বললে জানেন—বললে, "আমি স্বয়ং কুইনের প্রতিনিধি, আর উনি একটা সামান্য জমিদার। যদি ইচ্ছে করি ছারপোকার মত পিষে মেরে ফেলতে পারি ওঁকে। মানা করে দেবেন, উনি যেন আমার ব্যাপারে হাত না দেন। আমি ওঁর প্রজাও নই, খাতকও নই।"

রাউত মশায় কিছু বললেন না। বাঁ হাতের আঙুলগুলি দিয়ে বাঁ দিকের গোঁফটায় তা দিতে লাগলেন খালি। বাঁ দিকের গোঁফটার উপর তাঁর কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব ছিল।

সাতদিন পরে রাউত মহাশয় বৈঠকখানায় বসে আছেন, দেখতে পেলেন দারোগাটা তাঁর গেটের সামনে দিয়ে বাইকে করে যাচ্ছে।

"রাবণ মিশির—"

"জী হুজুর!"

বলিষ্ঠ সিপাহী রাবণ মিশ্র সেলাম করে' দাঁড়াল।

"দারোগা বাহেব বাইকে করে যাচ্ছে, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো। যদি আসতে না চায়, ধরে' নিয়ে এসো।"

"যো হুকুম।"

মিনিট দশেক পরে ক্রুদ্ধ দারোগাকে টানতে টানতে নিয়ে এল রাবণ মিশির।

"থামের সঙ্গে বেশ কস্‌কসিয়ে বাঁধো ওকে। আগে প্যান্ট কোট গেঞ্জি সব খুলে নাও, যদি চেঁচায়, মুখটাও বেঁধে ফেলো।"

রাবণ মিশির তাকে টানতে টানতে নির্জন পশ্চিম বারান্দায় নিয়ে গেল। একটু পরে এসে খবর দিল, দারোগাকে থামে বাঁধা হয়েছে। রাউত মশায় উঠে গিয়ে দেখলেন, উলঙ্গ আবদ্ধ দারোগা নির্বাক হ'য়ে রয়েছে বটে, কিন্তু তার চোখ দুটো দিয়ে আগুনের হলকা ফুটে বেরুচ্ছে।

রাউত বললেন, "আপনি মহারানীর প্রতিনিধি, আমি আমার প্রজাদের প্রতিনিধি। আপনি যেসব অন্যায় করেছেন তার শাস্তি দিচ্ছি। আজ আপনাকে চাবকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু ফের যদি এসব করেন তাহলে বাঘ কিংবা কুমির দিয়ে আপনাকে খাওয়াব। ও দুটো জানোয়ারই আমি পুষি, আশা করি জানা আছে সেটা আপনার। এই, বেত লাগাও—"

রাবণ মিশির একটা হান্টার বের করে এনে চাবকাতে লাগল দারোগাকে। রঘুবীর রাউত একটা মোড়ায় বসে বাঁ দিকের গোঁফটি চোমরাতে লাগলেন। একটু পরে দারোগা অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন রাউত মশায় হুকুম দিলেন, "ওকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে হীরু গোয়ালার বাড়ির পিছন দিকের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আয়। তারপর এই টেলিগ্রামটা ডাকঘরে নিয়ে যা। আমি টেলিগ্রাম লিখছি, ওটাকে ফেলে দিয়ে আয় আগে।"

টেলিগ্রাম করলেন পুলিস সুপারিনটেণ্ডেন্টকে। লিখলেন, "এখানকার দারোগা একটি গোয়ালার মেয়েকে বলাৎকার করছিল বলে গুরুতররূপে প্রহৃত হয়েছে। অবিলম্বে কিছু একটা ব্যবস্থা করুন।"

অনেক হাঙ্গামা হুজ্জত হ'ল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি গেল দারোগাটার। রঘুবীর রাউত ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পক্ষপাতী ছিলেন। যা করতেন নিজেই করতেন। আবেদন-নিবেদন বা আইনের ঘোরপ্যাঁচের ভিতর যেতে চাইতেন না। বলতেন, "আইন? ও আইন অনুসারে চললে দোষীকে সাজা দেওয়া

যায় কখনও? হাতে-নাতে চোর ধরলেও মিথ্যে সাক্ষী তৈরি করতে হবে, তা না করলে চোর ছাড়া পেয়ে যাবে।" আদালতে তাঁর মামলা-মকদ্দমা হরদম লেগে থাকত। কিন্তু তিনি একবার ছাড়া কখনও ফরিয়াদী হন নি। বরাবর আসামী হয়েছেন। তিনি নিজের জমিদারিতে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, সুতরাং আইনভঙ্গের অপরাধে আসামী হ'তে হ'ত তাঁকে।

যে-মকদ্দমায় তিনি ফরিয়াদী হয়েছিলেন তারই গল্প এবার বলব।

দুই

রঘুবীররা দুই ভাই ছিলেন, রঘুবীর আর সুমিত্রানন্দন। সুমিত্রানন্দন এবং তাঁর পত্নী বহুকাল আগে মারা গেছেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান অযোধ্যাপ্রসাদ রঘুবীরের কাছে মানুষ হচ্ছিল। রঘুবীর অপুত্রক এবং বিপত্নীক। সুতরাং অযোধ্যাপ্রসাদ রাউতই বিশাল জমিদারির একমাত্র উত্তরাধিকারী। রঘুবীর অযোধ্যাপ্রসাদকে লেখাপড়া শেখান নি বিশেষ। স্কুল-কলেজের শিক্ষার উপর তেমন আস্থা ছিল না তাঁর। তিনি তাঁকে মোটামুটি বাংলা, ইংরেজী এবং অঙ্ক শিখিয়েছিলেন। পালোয়ান রেখে কুস্তি করতে শিখিয়েছিলেন। গান-বাজনা শেখাবার জন্যে ওস্তাদ রেখেছিলেন একজন। অযোধ্যাপ্রসাদ যখন সাবালক হ'ল তখন তাকে আলাদা বাড়িও করিয়ে দিলেন একটি। জমিদারির একটা মহালের ভারও দিয়ে দিলেন যাতে সে স্বাধীনভাবে থেকে জমিদারি পরিচালনা করবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ—চাণক্যের এই উপদেশ রঘুবীর মানতেন। প্রাপ্তবয়স্ক অযোধ্যাপ্রসাদের কোনও কাজে বাধা দিলেন না তিনি।

ফল নিম্নলিখিত প্রকার হ'ল।

যে পালোয়ানেরা তাকে কুস্তি শেখাতে এসেছিল তারা অযোধ্যাপ্রসাদকে পরামর্শ দিলে যে, পুষ্টিকর খাবার প্রচুর পরিমাণে না খেলে কুস্তিতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, আখরোট, খুবানি, খোয়া প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। এর সঙ্গে মাছ মাংস ডিম থাকলে আরও ভালো হয়। গামা, গোবর, কিকুকর প্রভৃতি বড় বড় ব্যায়ামবীরদের খাদ্য-তালিকা আউড়ে তারা অযোধ্যাপ্রসাদকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলে যে, কুস্তি করতে হ'লে ভালো খাওয়া চাই।

অযোধ্যাপ্রসাদের অর্থাভাব ছিল না। বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি প্রচুর আনিয়ে

ফেললে। মুশকিল হ'ল মাছ-মাংস নিয়ে। পাড়াগাঁয়ে প্রত্যহ ভালো মাছ-মাংস পাওয়া যায় না। অযোধ্যাপ্রসাদ প্রত্যহ কালীপূজার ব্যবস্থা করে' ফেললে। রোজ পাঁঠা কাটা হ'তে লাগল। তার মহালে বড় দীঘি ছিল একটা। সেখানে সে আর তার পালোয়ানরা রোজ ছিপ ফেলে' বসতে শুরু করল। জেলেরা জাল নিয়ে নিয়ে ঘুরতে লাগল। অন্তত সের পাঁচেক মাছ রোজ চাই। কারণ সে একা তো নয়, গোটা পাঁচেক পালোয়ান আছে। মাছও জুটতে লাগল। পয়সা খরচ করলে সবই হয়।

গান-বাজনায় ওস্তাদ নুর মহম্মদও একটি পরামর্শ দিলেন তাকে। বললেন, সেতার যখন বাজে তখন একটি অদৃশ্য নর্তকী সেতারের ছন্দে ছন্দে নৃত্য করে। তার নূপুরের নিক্কণ হুজুর নিশ্চয়ই শুনেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে সতরঞ্চির উপর যদি আর একটি নর্তকী নাচে, তাহলেই জুড়ি ঠিক মেলে আর তাহলেই সেতারের মজাটা পুরো পাওয়া যায়। নুর মহম্মদ অযোধ্যাপ্রসাদের বাড়ির পাশেই একটি আলাদা বাড়িতে থাকতেন। বললেন, লখ্নৌ থেকে তার বিবির এক বোন এসেছে। সাবিত্রী দেবী নাম নিয়ে সে সিনেমায় নামতে চায়। কিন্তু হুজুর যদি মত দেন—।

বাঁ দিকের গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে মুলুক দাসের কাছে খবর শুনছিলেন রাউত মশায়।

মুলুক দাস বলছিল, "বেলা নটা দশটার সময় ওঠে অযোধ্যা আজকাল। উঠে মুখ ধোয় ঘণ্টাখানেক ধরে'। তারপর চা খায়, তারপর বাদাম পেস্তার হালুয়া। যা চেহারা হয়েছে, চিনতে পারবেন না আপনি। এই টেবো-টেবো গাল, থলথলে ভুঁড়ি, গর্দানের উপরও চাপ-চাপ চর্বি। প্রকাণ্ড একটা গড়গড়া কিনেছে দেখলাম, ঘণ্টাখানেক ধরে তামাকই খায়। তারপর তেল মাখতে বসে। ওই পালোয়ানগুলো তেল মাখায় ওকে। বলে না কি মাসাজ করলে শরীরের উপকার হবে। প্রথমে সর্ষের তেল, পরে অলিভ অয়েল, তারপর মাথায় ফুলেল তেল। খেতে বসে দুটো আড়াইটের সময়। মাছ মাংস রাবড়ি রোজ খায়। নানারকম তরিতরকারি খাবার জন্যে বাড়ির পিছনে বিঘে দুই জমিতে শাকসবজি লাগিয়েছে। হাঁস পুষেছে। রোজ ডিম খায়। খেয়ে-দেয়ে শোয়া একটু। তারপর বিকেলে গিয়ে দীঘিতে মাছ ধরতে বসে। পালোয়ানগুলোও বসে। সন্ধ্যের পর থেকে আরম্ভ হয় গানের মজলিস। সাবিত্রী দেবী নাচেন। রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত গান-বাজনা চলে। আজকাল মদও চলছে শুনছি।"

www.boiRboi.blogspot.com

"চুপ কর, বুঝেছি।"

থেমে গেল মুলুক দাস। তারপর আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে উঠে গেল। রাউত মশায় আরও খানিকক্ষণ গোঁফ চোমরালেন, তারপর তিনিও উঠে গেলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

তিন

এর পরই শুরু হ'ল মকদ্দমা।

রঘুবীর রাউত এক জাল দলিল বার করে' দাবি করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে সুমিত্রানন্দন তাঁর অংশের সম্পত্তি তাঁকে (অর্থাৎ রঘুবীরকে) বিক্রি করে' গিয়েছিলেন। জমিদারিতে আইনত অযোধ্যাপ্রসাদের কিছুমাত্র অধিকার নেই। কিন্তু সে জোর করে' একটা মহাল করে' বসে আছে এবং অপব্যয় করে' সম্পত্তি নষ্ট করেছে। আদালত থেকে তাঁকে ন্যায্য অধিকার সাব্যস্ত করবার অনুমতি দেওয়া হোক।

দ্বিতীয় মকদ্দমা করল নর্তকী সাবিত্রী দেবী। তাকে টাকা দিয়ে হাত করলেন রাউত মশাই এবং তাকে দিয়েই এক মকদ্দমা রুজু করা গেল। সাবিত্রী দেবী আদালতে হলফ করে' বলে এল যে, অযোধ্যাপ্রসাদ তার উপর বলাৎকার করবার চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার, উকিল এবং আরও জনকয়েক প্রত্যক্ষদর্শী সমর্থন করলেন সাবিত্রী দেবীকে।

তৃতীয় মকদ্দমা করলে কয়েকটি প্রজা। তাদের নালিশ অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি জোর করে' তাদের কাছে খাজনা আদায় করেছে। মারধোরও করেছে।

চতুর্থ মকদ্দমা করলে পিয়ালীলাল চনচনিয়া। অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি তাঁর মানহানি করেছে। এইভাবে নানা ছুতোয় দশটা মকদ্দমা লাগিয়ে দিলেন রাউত মশায় অযোধ্যাপ্রসাদের বিরুদ্ধে।

ঘুমন্ত লোকের মাথায় যদি বাড়ির ছাত ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে তার যা অবস্থা হয় অযোধ্যাপ্রসাদের তাই হ'ল।

সে প্রথমটা ভাবল যে, জ্যেঠামশায়ের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। কিন্তু এ-ভুল ভাঙতে দেরি হ'ল না। মুলুক দাসই এ-ভুল ভাঙিয়ে দিলে। সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, রঘুবীর বলে পাঠালেন তিনি তার মুখদর্শন করতে অনিচ্ছুক।

অযোধ্যাপ্রসাদের শ্বশুর শাঁসালো ব্যক্তি ছিলেন। অবশেষে তাঁরই শরণাপন্ন হ'তে হ'ল তাকে। সে মকদ্দমা লড়তে লাগল।

বছর দুই কেটে গেছে।

কয়েকটা মকদ্দমা জিতেছে অযোধ্যাপ্রসাদ। কিন্তু আসল মকদ্দমাটা অর্থাৎ বিষয়ের মালিকানা-স্বত্ব নিয়ে যে মোকদ্দমাটা হচ্ছিল সেটা শেষ হয় নি। লোআর কোর্টে হেরে গেছে অযোধ্যাপ্রসাদ, হাইকোর্টে আপিল করেছে।

মুলুক দাস রঘুবীর রাউতকে একটি খবর দিলে।

"অযোধ্যাপ্রসাদ দেখলাম খুব রোগা হয়ে গেছে। দেহের চর্বি বিলকুল ঝরে গেছে। মুখ শুকনো, চুল উস্ক-খুস্ক—"

রাউত গোঁফ চোমরাতে লাগলেন, কিছু বললেন না।

হাইকোর্টে রাউত হারলেন। কিন্তু তিনি ছাড়বার লোক নন, বিলেতে আপিল করলেন আবার। বিলেতের আপিলে জিতে গেলেন তিনি।

তারপর ডেকে পাঠালেন তিনি অযোধ্যাপ্রসাদকে। অযোধ্যাপ্রসাদ নত-মস্তকে এসে দাঁড়াল।

"এই নাও—"

একটা খাম এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

"কী এটা?"

"ডীড্ অব গিফ্ট্। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমায় দান করলাম।"

অযোধ্যাপ্রসাদ বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। একটু ইতস্তত করে' মাথা চুলকে তারপরে বলল, "মকদ্দমা করবার দরকার কী ছিল?"

"তোমার বড্ড চর্বি হয়েছিল, সেটা একটু ঝরিয়ে দিলাম। বিষয়-সম্পত্তি কী করে' রক্ষা করতে হয় তারও একটু ট্রেনিং হয়ে গেল তোমার। বিপদে না পড়লে তো শিক্ষা হয় না। তুমি যে-রাস্তায় চলেছিলে তাতে আমাদের পিতৃপুরুষের বিষয়-সম্পত্তি ডুবে যেত। আমি কাল কাশী যাব, আর ফিরব না। কাল থেকে তোমাকেই স্টেটের ভার নিতে হ'বে। যাও—"

অযোধ্যাপ্রসাদ প্রণাম করে' চলে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

চম্পা

শ্রীমান কার্তিক শ্রীমতী চম্পার প্রেমে পড়িয়াছিল। চম্পা কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই, বরং খুশীই হইয়াছিল। কারণ কার্তিক ধনবান তো বোটেই, রূপবানও। মিলনের পথে সাধারণতঃ যে সব সামাজিক, আর্থিক বা আধ্যাত্মিক বাধা থাকে, এক্ষেত্রে তাহা ছিল না। চম্পা রূপোপজীবিনী। সরকারের খাতায় নাম লিখাইয়া আইনসঙ্গত উপায়ে সে ব্যবসা ফাঁদিয়াছিল। এরকম ঘটনা বিরল নহে। কিন্তু ইহাদের কেন্দ্র করিয়া একদিন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

কার্তিকের প্রতিবেশী অমরবাবুর কলিকাতাস্থ বাসায় একদা প্রভাতে তাঁহার বাল্যবন্ধু যোগেনবাবু আসিয়া হাজির হইলেন। আসিয়া বলিলেন, "ভাই অমর, এসে তো পড়লুম, এবার তুমি সব ব্যবস্থা কর। তোমার পাঁচু স্যাকরাকে এখনই খবর দাও। আমাকে কালই সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরতে হবে। একদিন ছুটি পেয়েছি। বিয়েরও তো দেরি নেই আর। মাঝে মাত্র পনরোটি দিন।"

অমরবাবু দক্ষিণ হস্তটি উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "সব হবে। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আগে হাতমুখ ধোও, কিছু খাও, জিরোও, তারপর সব ঠিক করে দেব। আগে গিন্নিকে খবরটা দিয়ে আসি।" অমরবাবু অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। যোগেনবাবু কোটটি খুলিয়া জানালার ধারে যে পেরেকটি ছিল তাহাতে ঝুলাইয়া দিলেন। তাহার পর গেঞ্জি খুলিতে লাগিলেন।

অমরবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি একেবারে ভিতরেই এস। বাথ-রুমটা খালি আছে এখন, স্নান সেরে নাও। স্নান করবে তো?"

"স্নান করবো বইকি"

"তাহলে চলে' এস"

"আমি সন্ধ্যাহ্নিকও করব"

"সব ব্যবস্থা আছে, চলে' এস"

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

যোগেনবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলেন। রাত্রে ট্রেনে একেবারে ঘুম হয় নাই। স্নানান্তে পূজা করিলেন। তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করেন। পূজার পর চা-জলখাবারের পালা। তাহাতেও খানিকটা সময় গেল। বাল্যবন্ধু যোগেনের জন্য অমরবাবু নানাবিধ আয়োজন

করিয়াছিলেন। আহারাদির পর বিবাহের কথা উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরেই অনিবার্যভাবে আর্থিক প্রসঙ্গ লইয়া দুই বন্ধুতে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

যোগেনবাবু বলিলেন, "ভাই ভদ্রাসনটুকু বাঁধা দিয়ে হাজার তিনেক টাকা যোগাড় করেছি। ওইতেই কুলিয়ে নিতে হ'বে সব—"

"কুলিয়ে যাবে। তবে জিনিসপত্তরগুলো ভালো হবে না। নগদ দিতে হবে না কি কিছু?"

"নগদ দেড় হাজার চেয়েছেন। সেটা বউমার গয়না বিক্রি করে' পাব।"

"বউমা তোমার কাছেই আছেন?"

"এখন আছেন। কিন্তু বিয়ের পর ভেবেছি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। আমার বাড়িতে দেখা-শোনা করবার কেউ নেই, দিনকালও ভালো নয়। গবুর মা যদি বেঁচে থাকত তাহলে ভাবনা ছিল না—"

হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিল। বছর তিনেক আগে যোগেনবাবু তাঁহার একমাত্র পুত্র গোবর্ধনের বিবাহ দিয়াছিলেন। মাস ছয়েক পরেই গোবর্ধন মারা যায়। তাহার মাস ছয়েক পরেই গোবর্ধনের মা-ও। পুত্রশোক তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই।

অমরবাবু জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যোগেনবাবু কোঁচার খুঁট দিয়া উদ্গত অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন।

"গবুর বিয়েতে তুমি তো নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিলে। সব টাকাটা খরচ করে' ফেলেছ?"

"বাড়িটা দোতলা করলাম যে। গবুর জন্যেই দোতলা করাতে হয়েছিল। এখন সব শূন্য পড়ে আছে। যাক, ভাগ্যে বাড়িটা ছিল তাই সেটা বাঁধা দিয়ে বিয়ের টাকাটা যোগাড় হ'ল—"

"বাড়ি বাঁধা দিয়ে মোটে তিন হাজার টাকা পেলে?"

"তাই দিতে চায় না হে। গরজ যে আমার। এদিকে মেয়ের বয়স আঠারো পেরিয়ে গেছে, সুপাত্র যখন পেয়েছি তখন আর দ্বিমত করলাম না। কিছুদিন পরে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডটা পাব, তাই দিয়ে উদ্ধার করব বাড়িটা। আর কার জন্যেই বা বাড়ি, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে বাড়িতে কে থাকবে বল—"

"তা বটে—। পাত্রটি কি করে?"

"এবার বি. এ. পাস করেছে। আগে বার দুই ফেল করেছিল। তবে বংশ ভালো। ঘরে খাওয়া-পরার সংস্থান আছে, দেশে বাড়ি আছে—"

www.boiRboi.blogspot.com

"এই পাত্র নগদ পণ দেড় হাজার চাইছে?"

"আর বল কেন ভাই। আমি আর দরদস্তুর করি নি, বুঝলে! মেয়ে পছন্দ হতেই ওরা যা বললে তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। গত দু-বৎসর থেকে ক্রমাগত মেয়ে দেখাচ্ছি, কারও পছন্দই হয় না—ওর সামনের দাঁতগুলো উঁচু কি না—"

বলিয়াই যোগেনবাবু একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তিনিও গবুর জন্য অনেক মেয়ে দেখিয়াছিলেন, অনেককে প্রত্যাখ্যানও করিয়াছিলেন। একটি মেয়েকে তাহার খুব পছন্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বাবা নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন নাই। আর একটি মেয়ে……

"পাঁচু স্যাকরাকে ডাকতে পাঠাই তা'হলে। ডাকবার দরকার কী, নিজেরাই যাই চল। ট্রামে পাঁচ মিনিট লাগবে।"

দুইজনেই বৈঠকখানায় বাহির হইয়া আসিলেন।

"এ কী, আমার কোটটা কোথা গেল! এইখানে টাঙিয়ে রেখেছিলাম যে—"

"কোন্‌খানে—"

"এই পেরেকে—"

"তাহলে ঠিক কেউ জানালা দিয়ে নিয়ে গেছে। ওখানে কোট রাখতে গেলে কেন—"

"ওই কোটের পকেটেই যে তিন হাজার টাকা আছে আমার।"

"অ্যাঁ, বল কী!—"

যোগেনবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ব্যাপারটা পাড়ায় চাউর হইয়া গেল।

অমরবাবু নিজের এবং পাশের বাড়ির চাকরদের ডাকিয়া জেরা করিতে লাগিলেন, পুলিসের ভয় দেখাইলেন। যদি খুঁজিয়া দিতে পারে বকশিশ দিবেন এ কথাও বলিলেন। কিন্তু ফল হইল না।

অবশেষে একটা চাকর বলিল, "কার্তিকবাবুকে বলুন, তাঁর হাতে অনেক গুণ্ডা আছে, তিনি যদি চেষ্টা করেন হয়তো কোনও পাত্তা লাগাতে পারেন।"

কার্তিকের পিতা বিশ্বেশ্বরবাবুর সহিত অমরবাবুর হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু তিনি মারা গিয়াছেন। কার্তিকও তাঁহাকে চেনে, খাতিরও করে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যে-সব কানাঘুষা বাজারে শোনা যাইতেছে, তাহাতে তাহার নিকট যাইতে

অমরবাবুর প্রবৃত্তি হয় না। বন্ধুর খাতিরে তবু গেলেন। সমস্ত শুনিয়া কার্তিক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আমি চেষ্টা করে দেখছি, যদি কিছু করতে পারি। যদি কিছু করা সম্ভব হয় আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আপনার কাছে যাব। আর যদি না যাই তাহলে জানবেন কিছু করতে পারি নি।"

অমরবাবু চলিয়া আসিলেন।

কার্তিকও মোটরটি বাহির করিল এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই চম্পার বাড়িতে পৌঁছিয়া গেল।

চম্পা বিস্মিত হইল একটু। এ সময়ে কার্তিক সাধারণতঃ আসে না।

"আজ এমন অসময়ে যে"

"একটু দরকার আছে। একটা কথা শুনেছিলাম কিন্তু সে কথা তোমাকে জিগ্যেস করতে ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার গুণ্ডারা তোমাকে নাকি 'রানী' করেছে?"

মুচকি হাসিয়া চম্পা বলিল, "হ্যাঁ করেছে—। আমি ত্রিশ ভোটে জিতেছি। ফুলী আমার সঙ্গে কনটেস্ট করেছিল, পারে নি।"

"ভোট নিয়ে ঠিক হয় নাকি এসব?"

"নিশ্চয়!"

"রানীর ক্ষমতা কী?"

"ঠিক রানীর মতোই ক্ষমতা। ওদের আমি যা করতে বলব তা ওরা তৎক্ষণাৎ নির্বিচারে করবে। কেন, দরকার আছে নাকি কিছু?"

"আছে—"

কার্তিক সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল।

"চোর পকেটমার এদের উপরও তোমার কর্তৃত্ব আছে না কি?"

"আছে বই কী। এ বছরকার মতো কলকাতার আণ্ডার ওয়ার্লডের রানী আমি। বাংলা ভাষায় পাতালের রানী বলতে পার—"

"দেখ যদি ভদ্রলোককে সাহায্য করতে পার। বড়ই বিপন্ন হয়েছেন। ধার করে মেয়ের বিয়ের বাজার করবার জন্য যে টাকা এনেছিলেন, তা সব ছিল ওই কোটের পকেটে—"

"দেখি—"

ইলেট্রিক বেল টিপতেই দৈত্যের মতো বিরাটকায় একটি লোক অভিবাদন করিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

www.boiRboi.blogspot.com

"দেখ মুনিম, কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে একটি কোট চুরি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। কে সেখানে ডিউটিতে ছিল?"

"সুখন"

"তাকে ডাক"

আধ ঘণ্টা পরে সুখন আসিয়া হাজির হইল। অতিশয় নিরীহ ভদ্র চেহারা। কে বলিবে লোকটা চোর।

"সুখন,আজ সকালে কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে কোট পেয়েছ কি একটা?"

"হাঁ মাইজি। জানালার ধারে ঝুলছিল, গলি থেকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছি।"

"কোটটা ফেরত দিতে হবে।"

"সেটা তো গুদামে জমা হয়ে গেছে মা"

চম্পা কার্তিকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি কোটটা চেন কি?"

"না—"

"সেই ভদ্রলোককে নিয়ে এস এখানে, আমি কোটটা এখানে আনিয়ে রাখছি।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে।

কার্তিক ও যোগেনবাবু চম্পার বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। সুসজ্জিত ঘর। মেজেতে দামী কার্পেট পাতা। চলিতে গেলে পা ডুবিয়া যায়। প্রত্যেকটি আসবাবই দামী। পরদা ঠেলিয়া চম্পা প্রবেশ করিল।

"এই কোটটা কি আপনার?"

চম্পাকে দেখিয়া যোগেনবাবু একটু চমকাইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "হ্যাঁ, এইটেই—"

"দেখুন এতে যা যা ছিল তা ঠিক আছে কি না"

যোগেনবাবু দেখিলেন সবই ঠিক আছে। ইনার পকেটে নোটের তাড়াটা যেমন পিন করা ছিল তেমনি রহিয়াছে। একটা পকেটে বিড়ি দিয়াশালাই ছিল তাহাও আছে।

যোগেনবাবুর মনে হইল এ মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখিয়াছে। তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল।

"তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি এর আগে?"

"না, কোথাও দেখেন নি"

"আচ্ছা, তোমার নামটি কি সাবিত্রী ?"

"না, আমার নাম চম্পা।"

চম্পা আর দাঁড়াইল না, ভিতরে চলিয়া গেল।

যোগেনবাবুর কিন্তু ভুল হয় নাই। গবুর বিবাহের জন্য যখন তিনি একের পর এক পাত্রী দেখিতেছিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে এ মেয়েটিকেও দেখিয়াছিলেন। মেয়েটির রূপ দেখিয়া এবং তাহার 'সাবিত্রী' নাম শুনিয়া ইহাকে তাঁহার পছন্দও হইয়াছিল। কিন্তু ইহার বাবা নিতান্ত গরীব ছিল, পাঁচ হাজার টাকা পণ শুনিয়া পিছাইয়া যায়।

যোগেনবাবু হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

"চলুন, কোট তো পেয়ে গেলেন—"

আসিবার সময় আবার নরম কার্পেটে তাঁহার পা ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ

শীতের রাত্রি। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলাম। সদ্য বিবাহিতা পত্নী পাশের ঘরে সেতার সাধিতেছিলেন। কাফির গৎটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ রস-ভঙ্গ হইল। নীচে কড়াটা নড়িয়া উঠিল এবং একটু পরে ভৃত্য মণিলাল একটি পত্র হস্তে প্রবেশ করিল।

"নবীপুরের জমিদার বাড়ি থেকে আপনাকে ডাকতে এসেছে—"

লেপ ছাড়িয়া উঠিতে হইল। পত্রটি দেখিলাম স্বয়ং জমিদারবাবুই লিখিয়াছেন।

ডাক্তারবাবু,

আমার ছেলেটি বড় অসুস্থ। আপনি পত্র পাইবামাত্র চলিয়া আসুন। আপনার জন্য নৌকা পাঠাইলাম। ইতি—

বীরেন্দ্রনারায়ণ

পত্রটার অভব্য ভঙ্গীতে আত্মসম্মান ঈষৎ আহত হইল। আমি উঁহার খাতকও নহি কর্মচারীও নহি। আমাকে এমন আদেশের ভঙ্গীতে চিঠি লেখার অর্থ কি ? একটা 'নমস্কারান্তে নিবেদন' বা 'বিনীত বীরেন্দ্রনারায়ণ' লিখিলে ক্ষতি কি ছিল ! লোকটা শুনিয়াছি দুর্দান্ত জমিদার। টাকার জোরে সত্যকে মিথ্যা এবং দিনকে রাত্রি করিয়া নিজের জমিদারির সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া

রাখিয়াছে, বাহিরের লোকদেরও নিস্তার নাই। সকলকে শাসাইয়া চোখ রাঙাইয়া নিজের মহিমাপতাকাটাকে সদর্পে সমুচ্চ করিয়া রাখাটাই যেন লোকটার একমাত্র লক্ষ্য। আমি মাত্র মাসখানেক আগে এই গ্রামে প্রাকৃটিস করিতে আসিয়াছি। গ্রামটি বীরেন্দ্রনারায়ণেরই জমিদারিভুক্ত, কিন্তু তাহার সহিত চাক্ষুষ আলাপ এখনও পর্যন্ত হয় নাই। লোকটার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে আলাপ করিবার আগ্রহও মনে জাগে নাই।

চিঠিটার দিকে কয়েক মুহূর্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। 'আমার ছেলেটি বড় অসুস্থ'—এই কথা কয়টিই আমাকে যাইতে বাধ্য করিল।

রাত্রি বারোটার সময় জমিদার ভবনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম জমিদারের ম্যানেজার জমদগ্নি মিশ্র আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। লোকটার দুশমনের মতো চেহারা। মুখে চাপ চাপ গোঁফদাড়ি, যে অংশটুকু রোমহীন তাহাতে বসন্তের দাগ। নাকটা যেন ছোট একটি উই ঢিপি। "নমস্কার ডাক্তারবাবু। আসুন, বসুন। পথে আশা করি কোনও কষ্ট হয় নি—"

"এখানে বসে আর কি হবে? চলুন একবারে রোগীর ঘরে যাই।"

"আমিই রোগী। আপনার ফি-টা আগে নিয়ে নিন।"

তিনি একটা টাকার থলি আমার দিকে আগাইয়া দিলেন।

"পাঁচ শ' টাকা আছে ওতে। যদি আরও চান আরও দেব। আমাকে কিন্তু বাঁচাতে হবে।"

"ব্যাপারটা কি—?"

"একটা খুনের মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছি। দাঙ্গা হয়েছিল, একটা লোক মারা গেছে। বিপক্ষ দলেরা আমাকে আসামী করেছে। উকিল পরামর্শ দিয়েছেন যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করতে হবে। তাতে লেখা থাকবে, যে তারিখে ওই খুনটা হয়েছে সেই তারিখে আমি কঠিন রোগে আপনার বাসায় আপনার চিকিৎসাধীন ছিলাম—"

বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

জমদগ্নি আমার মুখের দিকে সোৎসুকে চাহিয়া চাপদাড়িতে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

"ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে গেছে ডাক্তারবাবু। বাঁচান আমাকে দয়া করে।"

"আমাকে মাপ করবেন। আমি ডাক্তার, মিথ্যা সার্টিফিকেট লেখা আমার পেশা নয়। এমনভাবে এত রাত্রে আমাকে ডেকে এনে খুবই অন্যায় করেছেন আপনারা। যাক, আমি চললাম। নমস্কার—"

আমি গমনোন্মুখ হইয়া দ্বারের দিকে ফিরিয়াছি এমন সময় জমদগ্নি বলিলেন, "যাবার আগে একটা কথা শুনে যান, নবীপুরে চোখ রাঙাবার অধিকার মাত্র একটি লোকেরই আছে, তিনি জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ। তিনি যদি বিরূপ হন তাহলে তাঁর জমিদারিতে আপনি বাস করতে পারবেন না।"

"বেশ, বাস করব না। কালই না পারি দু' একদিনের মধ্যেই আমি অন্যত্র চলে যাব। আপনাদের এই ব্যবহারের পর আমারই আর এখানে থাকবার প্রবৃত্তি হবে না। আচ্ছা চলি—"

"শুনুন, আর একটা কথা। পাঁচ-শ'র জায়গায় যদি পাঁচ হাজার টাকা দিই, তাহলেও আপনি এই উপকারটি করবেন না?"

"লক্ষ টাকা দিলেও করব না।"

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া গৃহিনীকে বলিলাম, "এখানকার বাস উঠল। জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেল। কাল সন্ধ্যার ট্রেনেই চল কোলকাতায় চলে যাই—"

"কেন হঠাৎ?"

সমস্ত শুনিয়া গৃহিনীও আমার সহিত একমত হইলেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে একটা গরুর গাড়িতে আমার জিনিসপত্র বোঝাই করিতেছি. এমন সময় ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে একজন বলিষ্ঠ সুদর্শন যুবক আসিয়া আমার বাসার সামনে অশ্বের গতিরোধ করিলেন। অশ্বের ঘর্মাক্ত কলেবর দেখিয়া বুঝিলাম, বেশ দ্রুতবেগেই তাহাকে আসিতে হইয়াছে।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যুবক সহাস্য মুখে আগাইয়া আসিলেন।

"নমস্কার। আপনিই ডাক্তারবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?"

"আমি বীরেন্দ্রনারায়ণ। আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। এসব কি—" গরুর গাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

"আমার মালপত্র। আমি আজই চলে যাচ্ছি এখান থেকে—"

"পাগল নাকি! আপনাকে কিছুতেই আমি যেতে দেব না। আপনার মতো লোকের সঙ্গ লাভ করা একটা সৌভাগ্য। টাকা খরচ করলে মিথ্যে সার্টিফিকেট অনেক পাওয়া যায়—জমদগ্নি সিভিল সার্জনের কাছ থেকেই

সার্টিফিকেট এনেছে, কিন্তু আপনার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। দুপুর রোদে তাই নিজেই ছুটে এলাম। যাওয়া আপনার হবে না, প্লীজ—"

বীরেন্দ্রনারায়ণ হাতজোড় করিলেন।

যাওয়া হইল না।

www.boiRboi.blogspot.com

হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে

গৌরবগঞ্জের জমিদার হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে ওরফে রিদুবাবু, অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর চেহারাও ছিল অনন্যসাধারণ। প্রকাণ্ড ভারী মুখ, একমাথা কোঁকড়ানো বাবরি চুল, বিরাট গোঁফ, জমকালো জুলফি। চোখ দুটি বড়-বড় লাল-লাল। নাকটা খাঁড়ার মতো। শরীর যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। রিদুবাবুকে সবাই ভয় করতো, আবার ভালও বাসতো।

আমার সঙ্গে তাঁর দুবার মাত্র দেখা হয়েছিল। প্রথমবার দেখা হয় তাঁর বাড়িতে। আমি তখন সবে ডাক্তারি পাস করে' বেরিয়েছি—কোথায় বসবো ঠিক করতে পারি নি তখনও, পয়সার জোর ছিল না তেমন, একটা চাকরির চেষ্টা করছিলাম ; এমন সময় রিদুবাবু হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন একদিন। রিদুবাবুর নামটা শোনা ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখি নি কখনও আমি। বাবার সঙ্গে নাকি বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। তাঁর জমিদারিতে কিছু জমিও ছিল আমাদের। যৌবনকালে, আমাদের জন্মের পূর্বে, বাবা গৌরবগঞ্জে বাসও করেছিলেন। তারপর চাকরি নিয়ে তিনি কোলকাতায় চলে' আসেন। সেই থেকে কোলকাতাতেই আছি আমরা, আর গৌরবগঞ্জে যাওয়া হয় নি।

হঠাৎ রিদুবাবুর চিঠি এসে হাজির হলো। বাবাকেই লিখেছিলেন তিনি—

'শুনলাম, তোমার ছেলে এবার ডাক্তারি পাস করেছে। তাকে যদি আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও, খুবই খুশী হবো। আমার একটা অসুখ হয়েছে, তাকে দেখাতে চাই। কবে আসবে, আগে থাকতে একটু জানিও, স্টেশনে লোক রাখবো।'

আগে থাকতে খবর দিয়েই গিয়েছিলাম। স্টেশনে নেবে দেখি, হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড। আমার জন্যে হাতী, ঘোড়া, পালকি, ডুলি, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, মোটর-কার—সব রকম যান পাঠিয়েছেন রিদুবাবু। স্বয়ং

নায়েবমশাই স্টেশনে এসেছেন আমাকে অভ্যর্থনা করতে। তাঁর সঙ্গে এসেছে আসা-সোটাধারী বারোজন বরকন্দাজ। আমি তো অবাক।

নায়েবমশাইকে বললাম, "এত সব কাণ্ড কেন! একটা যে-কোনও গাড়ি পাঠিয়ে দিলেই হতো। না পাঠালেও ক্ষতি ছিল না, কতটুকুই-বা পথ"

নায়েমশাই মাথা চুলকে বললেন, "হুজুর বললেন, ডাক্তারবাবুর কিসে সুবিধে হবে তা তো জানা নেই, আমাদের যা আছে সবই নিয়ে যাও তুমি"—তারপর একটু হেসে বললেন, "পরিচয় হ'লে বুঝতে পারবেন, ওঁর স্বভাবই এই রকম।"

—"ওঁর কি অসুখ করেছে?"

—"অসুখ? অসুখের কথা শুনিনি তো!"

—"অসুখের জন্যই তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন"

—"তা হবে। আমি কিছু জানি না"

শাল-প্রাংশু মহাভুজ ব্রিতুবাবুকে দেখে আমারও মনে হলো না যে, তিনি অসুস্থ। আমি গিয়ে প্রণাম করতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। বললেন, "তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল একদিন। এখানে যখন ছিল, একসঙ্গে মাছ ধরতাম দু'জনে। তোমার বাবা হয়তো সে-সব কথা ভুলে গেছে, আমি কিন্তু ভুলি নি। আমাদের গোমস্তা রমেনের মুখে শুনলাম, তুমি ডাক্তারি পাস করেছো, খুব আনন্দ হলো শুনে"

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার কি অসুখ করছে?"

—"ফুসকুড়ি বেরিয়েছে একটা পিঠের উপর। এরকম ফুসকুড়ি প্রায়ই হয় আমার। দেখ দিকি, এর যদি কোনও একটা ব্যবস্থা করতে পারো"

ফুসকুড়িটি দেখলাম। অতি ছোট ঘামাচির মতো, বিশেষ কিছু নয়। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য আমাকে কোলকাতা থেকে ডেকে আনিয়েছেন ভেবে শুধু যে অবাক হলাম তা নয়, মনে-মনে একটু অপমানিতও হলাম। তারপর হঠাৎ সন্দেহ হলো, ভদ্রলোকের মাথা খারাপ নয় তো! স্টেশনে একজন লোককে আনতে অত রকম যানবাহান যিনি পাঠাতে পারেন…

ব্রিতুবাবু বলে উঠলেন, "থাক্, ফুসকুড়ির কথা পরে চিন্তা কোরো। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে' নাও আগে। নায়েবমশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি সব ব্যবস্থা করে' দেবেন। কাল সকালে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। ক'টার সময় ওঠো তুমি?"

—"আমার খুব ভোরে ওঠা অভ্যেস"

—"বেশ ভালোই তো। ক'টার সময় ওঠো"

—"ভোর তিনটেয় আমার ঘুম ভেঙে যায়"

—"আমি উঠি সাড়ে-পাঁচটায়। ঘুমটা কিছুতে কমাতে পারছি না। তোমাদের ডাক্তারি-শাস্ত্রে যদি এরও কোনো ওষুধ থাকে, দিও। আচ্ছা, আমি উঠি এখন। সকাল ছ'টা নাগাদ আবার দেখা হবে।"

রিজুবাবু চলে যাওয়ার একটু পরেই নায়েবমশাই হাজির হলেন এসে।

—"রাত্রে কি খাবেন, ডাক্তারবাবু?"

—"যা আছে, তাই খাবো।"

—"সব রকমই আছে। যা হুকুম করবেন তাই এনে দেব"

—"সব রকম মানে?"

—"কয়েক রকম ভালো চালের ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, সব রকম ডাল, রুটি, লুচি, পরোটা, ডালপুরি, রাধা-বল্লভী, কচুরি, সিঙ্গাড়া, নিমকি, চার-পাঁচ রকমের মাংস, চার-পাঁচ রকম মাছ, তরি-তরকারি সব রকম, এ ছাড়া দই, ক্ষীর, পায়েস, মিষ্টান্ন, মোরব্বা, চাটনি, এসব তো আছেই—"

—"বলেন কি! সব আমার জন্যে করিয়েছেন?"

—"এসব রান্না রোজ হয়"

—"এত রকম?"

—"হ্যাঁ, মায় সাবু, বার্লি, হলিক্স, ওভালটিন পর্যন্ত"

—"রিজুবাবু খুব খাইয়ে লোক বুঝি?"

—"মোটেই না। নিজে খুব সামান্যই খান। কিন্তু কি খাবেন তা আগে থাকতে বলবেন না কিছুতেই। তাই সব রকম তৈরি রাখতে হয়। কোনও জিনিসটা চেয়ে না পেলে কুরুক্ষেত্র করেন"

—"বলেন কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই রান্নার ব্যাপারের জন্যেই জন-কুড়ি রাঁধুনি, আর গোটা পঞ্চাশেক চাকর রাখতে হয়েছে।"

—"এরকম করবার মানে কি?"

—"খেয়াল! সে যাই হোক, আজ রাত্রে আপনি কি খাবেন বলুন"

—"খানকয়েক লুচি, আর যা হোক দু'একটা তরি-তরকারি পাঠিয়ে দেবেন"

—"মাছ মাংস দুই-ই দেব তো?"

—"দেবেন"

www.boiRboi.blogspot.com

—"মিষ্টান্ন"

—"আপনার যা খুশি দেবেন মশাই, যা পারবো খাবো"

—"বেশ। চা খাবেন ক'টায়? হুজুর বলে দিলেন, আপনি তিনটের সময় ওঠেন, আপনাকে ঠিক সময়ে যেন চা দেওয়া হয়। সাড়ে তিনটেয় দেব"

—"কি দরকার অত কষ্ট করে"

—"কষ্ট আবার কি! দুটো ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে দিলেই হবে। একটা ঘড়ি যজ্ঞেশ্বর গোয়ালার কাছে থাকবে, আর একটা থাকবে হীরু খানসামার কাছে।"

—"গোয়ালার কাছে কেন?"

—"সে আড়াইটের সময় উঠে দুধ দুয়ে আনবে। টাটকা দুধ না হ'লে কি চা ভালো হয়? লিপটনের দার্জিলিং চা আছে, অন্য চা-ও আছে, কোন্‌টা—"

"কেন অত হাঙ্গামা করছেন। যা আপনার সুবিধে হবে তাই দেবেন"

—"অত হাঙ্গামা না করলে আমার চাকরি থাকবে না। হুজুর যদি শোনেন যে আপনি উঠেই চা পান নি, তাহ'লে ভীষণ কাণ্ড হবে। সাড়ে-তিনটেয় চা পাঠিয়ে দেব তাহ'লে"

—"বেশ, তাই দেবেন"

—"পাশের ঘরটাই চানের"

—"ভালোই হয়েছে। ভোরে উঠেই আমার স্নান করা অভ্যাস।"

—"ও, তাহলে তো সে ব্যবস্থাও করে' রাখতে হয়—"

নায়েবমশাই ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরে ফিরে এসে বললেন, "পাশের ঘরে স্নানের এবং মুখ ধোয়ার সব ব্যবস্থা রইলো।"

—"আচ্ছা।"

বেশ একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

ঠিক ভোর তিনটেতেই ঘুম ভাঙলো আমার। বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে দেখি, বারান্দায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে একটি চাকর বসে আছে। আমাকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলো, তারপর বললো, "এখনই স্নান করবেন কি? গরম জল তৈরী আছে, আনবো?"

—"নিয়ে এসো"

স্নানের ঘরে ঢুকে দেখি, সেখানেও এলাহি কাণ্ড। দাঁত মাজবার জন্যে কয়েকরকম দেশী-বিলাতী মাজন, টুথ-পেস্ট, টুথ-ব্রাশ, এমন কি, দাঁতন পর্যন্ত

মজুত রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে নানারকম তেল, সাবান, তোয়ালে, গামছা, এমন কি, স্নো, পাউডার, আতর-এসেন্স পর্যন্ত।

স্নান সেরে বেরিয়ে দেখি, হীরু খানসামা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সেলাম করে' বললে, "চা তৈরি হুজুর"

হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম, ঠিক সাড়ে-তিনটে বেজেছে।

ঠিক ছ'টার সময় রিন্টুবাবু এলেন।

তাঁর পিঠের ফুসকুড়িটা আর একবার দেখলাম ভালো করে'। সত্যিই বিশেষ কিছু নয়। আমার ব্যাগেই একটা মলম ছিল, লাগিয়ে দিলাম সেটা।

রিন্টুবাবু বললেন, "মাছ ধরতে ভালোবাসো তুমি?"

—"কখনও ধরিনি"

—"মাছ ধরা দেখবে?"

—"তা দেখতে পারি"

—"তাহ'লে বেড়াজালের ব্যবস্থা করতে হয়"

রিন্টুবাবু তাঁর জলকরের নায়েবকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি আসতেই বললেন, "জেলেদের খবর দাও। সাগরবিলে জাল ফেলুক তারা, বিকাশকে নিয়ে আমি যাচ্ছি একটু পরে।"

সাগরবিল থেকে দশমণ মাছ উঠলো। বড় বড় রুই-কাৎলা। জল থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছিল তারা। এত বড় বড় জীবন্ত মাছ আমি জীবনে কখনও দেখিনি। দেখবার মত দৃশ্য বটে! আমি শহুরে-লোক, কোলকাতার গলিতে বাস করি, দৈনিক একপোয়া মাছ কেনা হয় আমাদের বাড়িতে, একটা কথা বারবার মনে হতে লাগলো আমার—দশমণ মাছ ধরবার কি দরকার ছিল? একি অপচয়! বাড়িতে একটিমাত্র মাছ গেল, বাকী সব মাছ বিলিয়ে দেওয়া হলো!

গৌরবগঞ্জে পাঁচ দিন ছিলাম। এই পাঁচ দিনের প্রতি মুহূর্তে একটি কথাই আমার কেবল মনে হয়েছে—ভদ্রলোক বড় বেশী অপব্যয় করেন। নায়েবমশাই-য়ের মুখে শুনলাম, হুজুরের একজোড়া কাপড়ের দরকার হ'লে বিশজোড়া কাপড় আনাতে হয়। পাঞ্জাবি, কামিজ, গেঞ্জি সমস্তই ডজন-ডজন করানো চাই, নানারকম ছিটের। এ-বছরের শাল ও-বছরে গায়ে দেন না। নিজে যে খুব বেশী ব্যবহার করেন তা নয়, কিন্তু কেনা চাই সব রকম। ওই ওঁর শখ। একটিমাত্র ছেলে, বিলেতে লেখাপড়া করে। স্ত্রী মারা গেছেন বহুদিন আগে।

শেষকালে নায়েবমশাই হেসে বললেন, "বড়লোকের একটা নেশা তো চাই। ওই ওঁর নেশা। অপব্যয়ের নেশায় মশগুল হয়ে থাকেন।"

আমি যেদিন চলে আসি, সেদিন রিতুবাবুকে বলেছিলাম, "যদি রাগ না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে।"

—"কি বলো"

—"এত অপচয় কেন করেন আপনি?"

"—অপচয়! অপচয় কোথায় দেখলে তুমি?"

—"রোজ এত রকম খাবার করবার দরকার কি? খান তো সামান্য একটু।"

—"বাকিটা আর পাঁচজনে খায়"

—"ওদের খাওয়াবার জন্যে অন্নসত্র খুললেই হয়"

—"সেখানে কি এমন খাবার তৈরি হবে? আমার জন্যে তৈরি হয় বলেই যত্ন করে তৈরি করে সবাই।"

আমি চুপ করে রইলাম।

জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো রিতুবাবুর চোখ দুটো।

বললেন, "তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তুমি এটা জানো যে, পৃথিবীতে কিছুই নষ্ট হয় না? তুমি হিন্দুর ছেলে, একথাটা শোন নি যে, তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে! আমি হিন্দু! গৃহস্থ পাঁচজনকে যথাসাধ্য প্রতিপালন করাই যে আমার কর্তব্য।"

আমি কোনও উত্তর দিতে পারি নি। খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে রিতুবাবু হেসে বললেন, "দেখ, বলিষ্ঠপ্রাণের বিকাশই প্রাচুর্যে। ওই বটগাছটার দিকে চেয়ে দেখ, সহস্র-সহস্র পাতা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোটি কোটি বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে, শত শত পাখিকে আশ্রয় দিচ্ছে, পথিককে ছায়া দিচ্ছে। এসব না করলেও ওর চলতো, কিন্তু তাহ'লে ও বটগাছ হতো না—"

আমি চুপ করে' রইলাম।

কোলকাতায় ফিরে আসবার দিন-সাতেক পরে রিতুবাবুর চিঠি পেয়েছিলাম একটা। চিঠিখানা এখনও আছে আমার কাছে। লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু

আশা করি নিরাপদে পৌঁছিয়াছ। যদিও তুমি আমার ছেলের মতো, তবু তুমি ডাক্তার, তোমাকে 'ফি' না দিলে অন্যায় হইবে। তাই সামান্য কিছু

www.boiRboi.blogspot.com

পাঠাইলাম। দ্বিধা করিও না, ইহা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য। তোমার বাবাকে আমার ভালবাসা দিবে, তুমি আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভার্থী

শ্রীহৃদয়েশ্বর মুখোপাধ্যায়

চিঠির সঙ্গে একটি পাঁচ হাজার টাকার চেক ছিল।

রিদুবাবুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয় কুড়ি বছর পরে কাশীতে। তখন শীতকাল। বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে বেরুচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়লো, চাতালের একধারে একটি ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে বৃদ্ধ বসে আছেন একজন। গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই। মুখটা চেনা-চেনা ঠেকলো। ক্ষীণভাবে মনে হলো, কোথায় যেন দেখেছি। একটু এগিয়ে গেলাম। বৃদ্ধও আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। তারপর হেসে বললেন, "কে, বিকাশ নাকি!"

হঠাৎ রিদুবাবুকে চিনতে পারলাম। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম।

—"একি, আপনি এমনভাবে এখানে!"

—"আজকাল এখানেই থাকি"

—"এখানেই? কেন?"

—"জীবনের শেষ আশ্রম যে সন্ন্যাস"

অবাক হ'য়ে গেলাম।

—"কোথায় বাসা আপনার"

—"বাসা নেই। এই মন্দিরে পড়ে থাকি, ভিক্ষে করে খাই।"

সবিলা

জনৈক খবরের কাগজের রিপোর্টার তাসের আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরবার পথে যে মেয়েটিকে কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, সে-মেয়ে যে রাজকন্যা, তা বেচারা বুঝতেই পারে নি। সুতরাং তার সঙ্গে প্রেম করতেও ইতস্তত করে নি। প্রেম যখন জমে উঠল, তখন হঠাৎ জানা গেল ওই কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটির আসল পরিচয়। এতে উক্ত সাংবাদিক যুবকটির মনের অবস্থা যা হ'ল তা বর্ণনীয় নয়, অনুমেয়। বিখ্যাত একটি বিদেশী চলচ্চিত্রে এর শিল্পায়িত অভিব্যক্তি অনেকেই আপনারা দেখেছেন।

সবিলার জীবনেও এই রকম একটি কাণ্ড ঘটেছিল। সবিলা সাংবাদিক নয়,

www.boiRboi.blogspot.com

সহিস। সিকিমের একপ্রান্তে তার বাড়ি। সিকিমের রাজার অশ্বশালার সে একজন পরিচারক মাত্র। কিন্তু তবু সে অসামান্য ব্যক্তি, ধর্মের জ্যোতিতে তার মনপ্রাণ পরিপূর্ণ! সে মুসলমান, তার আকাঙ্ক্ষা বাড়ির পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করাবে। আয় অল্প, কিন্তু তার থেকেই সে একটু একটু করে টাকা জমিয়েছে অনেক দিন ধরে'। জমিও সংগ্রহ হয়েছে একটু। চাঁদা সংগ্রহ করেছে কিছু-কিছু। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ মসজিদ নির্মাণ অল্প টাকায় হবে না, অনেক টাকা চাই। প্রায় দশ বৎসর ধরে' চেষ্টা করে' মসজিদের ভিত্তি পত্তন করতে পেরেছে সে। তার জন্যেই মালমসলা ইট সিমেণ্ট সংগ্রহ করতে জিভ বেরিয়ে পড়েছে তার। ঋণ হ'য়ে গেছে কিছু। তবু সে হাল ছাড়ে নি। আবার একটু একটু করে টাকা জমাচ্ছিল, এমন সময় এই অভাবনীয় ঘটনাটি ঘটল। কোট-প্যাণ্ট-পরা একটি সাহেব এসে হাজির হলেন তার কাছে। খাঁটি সাহেব নয়, দেশী সাহেব। চমৎকার লোক কিন্তু। খাসা উর্দুতে বললেন, "আমি পায়ে হেঁটে এই অঞ্চলটা বেড়িয়ে দেখতে চাই, দশ-বারো দিনের মত থাকবার জায়গা কি পাওয়া যাবে কোথাও?"

"এখানে তো হোটেল বা সরাই নেই সাহেব। এ-অঞ্চলে আমরা দশ-বারো ঘর সহিস আছি কেবল। সবাই মুসলমান। আমার গরিবখানায় থাকতে হুজুরের যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আপনার খিদমত করে' আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

সাহেব বললেন, "ও, তুমি মুসলমান বুঝি? যাক নিশ্চিন্ত হলাম। তোমার গরিবখানাই যে আমার মত মুশাফিরের পক্ষে দৌলতখানা ভাই। তুমি মুসলমান, কত বড় সংস্কৃতির বাহক তুমি—"

পর পর দু-তিনটে উর্দু বয়েত আওড়ালেন, কোরানের কথা বললেন। মুগ্ধ হ'য়ে গেল সবিলা।

সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন সাহেব। সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসতেন, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতেন। সবিলার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল তাঁর। চাচাসাহেব বলে ডাকতে লাগল তাঁকে তারা।

একদিন পাশের জমিতে মসজিদের অর্ধ-সমাপ্ত ভিত্তিটা চোখে পড়ল তাঁর।

"ওটা কী সবিলা? নূতন বাড়ি করছ?"

একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল সবিলা।

"ওটা আমার পাগলামি হুজুর। বামন হ'য়ে চাঁদ ধরবার চেষ্টা—"

www.boiRboi.blogspot.com

"কি ব্যাপার বল তো খুলে—"

কুণ্ঠিতমুখে চুপ করে' রইল সবিলা খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "হুজুর, আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা একটি মসজিদ তৈরি করব। অনেকে আমার কথা শুনে হাসে, ঠাট্টা করে, কিন্তু তবু আমি চেষ্টা করছি—"

সাহেব বললেন, "দেখ সবিলা, এতদিন তোমাকে আমি আমার মতই সাধারণ মানুষ মনে করতাম। এখন দেখছি তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়। তোমার মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। এতদিন বুঝতে পারি নি, দেখতে পাই নি। তোমাকে আমি শ্রদ্ধাভরে সেলাম করছি। একটা কথা তুমিও বুঝতে পার নি সবিলা, তোমার মসজিদও তৈরি হ'য়ে গেছে, তার মিনারও আকাশ স্পর্শ করেছে। স্থান পেয়েছে সূর্যতারার সভায়—"

সবিলা অভিভূত হ'য়ে শুনছিল ; সাহেব থামতেই সে জিজ্ঞাসা করল, "আমার মসজিদ তৈরি হ'য়ে গেছে? এ কি বলছেন আপনি হুজুর—! কিছুই হয় নি, দেখতেই তো পাচ্ছেন—"

সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "হ'য়ে গেছে। যে-মুহূর্তে তুমি সঙ্কল্প করেছ সেই মুহূর্তেই তা হ'য়ে গেছে। তোমার মতো পুণ্যাত্মার সঙ্কল্প পূর্ণ হ'তে দেরি হয় না। ইঁট সিমেণ্ট চুন-সুরকি যোগাড় করতে হয়তো দেরি হচ্ছে, কিন্তু তা-ও হ'য়ে যাবে। টাকা কি করে' যোগাড় করছ তুমি?"

"নিজে কিছু কিছু জমাচ্ছি। চাঁদাও পেয়েছি কারো কারো কাছ থেকে। কিন্তু এখানে তো লোকজন বেশী নেই, যারা আছে তারাও গরিব—"

"বেশ, আমি তোমাকে কিছু চাঁদা দিচ্ছি।"

সাহেব নগদ দশ টাকা দিলেন তাকে। আর একটি ইংরেজীতে ঠিকানা-লেখা কার্ড দিয়ে বললেন, "তুমি যদি কখনও কলকাতায় যাও, এই ঠিকানায় আমার খোঁজ কোরো। আমি তোমাকে আরও চাঁদা যোগাড় করে' দেব।"

তার পরদিনই নেমে এলেন সাহেব পাহাড় থেকে।

দুই

তারপর তিন বৎসর কেটে গেছে।

কলকাতা শহরে প্রকাণ্ড একটি বাড়ির বাইরের ঘরে বহু রোগীর ভিড়ে সংকুচিত হয়ে বসে আছে সবিলা। প্রায় ঘণ্টা দুই বসে থাকতে হ'ল। সব রোগী দেখা শেষ করে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার সাহেব। সবিলা তখনও এক

www.boiRboi.blogspot.com

কোণে বসে ছিল। চোখাচোখি হ'ল দুজনে। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ডাক্তার সাহেব। হাত বাড়িয়ে উর্দুতে বললেন, "আরে, সবিলা সাহেব যে! কী খবর!..."

সবিলা কুণ্ঠিতভাবে বললে, "আপনি ওয়াদা করেছিলেন যে, আমার মসজিদের জন্যে কিছু চাঁদা যোগাড় করে দেবেন।"

"নিশ্চয় দেব। ভিতরে এস।"

সঙ্গে করে' নিয়ে গেলেন ভিতরে।

"একটু চা খাও, নাস্তা কর। তারপর আমি তোমাকে একটা চিঠি দিচ্ছি, সেই চিঠি নিয়ে তুমি চলে যাও। যাঁর নামে চিঠি দেব তিনি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

তিন

তার পরদিন আবার এল সবিলা।

ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "কি হল?"

"টাকা পেয়েছি।"

"কত টাকা?"

"প্রায় তিন হাজার।"

"ওতে তোমার মসজিদ হয়ে যাবে তো?"

"হ'য়ে যাবে। আদাব।"

এত টাকা পেয়েও সবিলা কিন্তু ততটা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারল না যতটা উচ্ছ্বসিত হওয়া উচিত ছিল।

সে আবিষ্কার করেছিল যে, ডাক্তার সাহেব মুসলমান নন, হিন্দু।

অপ্রতিভ মুখে আদাব করে' চলে গেল সে।

দুধের দাম

ট্রেন আসিয়াছিল। কয়েকটি সুবেশা, সুতন্বী, সুরূপা যুবতী স্টেশনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই আশে পাশে জনকয়েক বাঙালী ছোকরাও, কেহ অন্যমনস্কভাবে, কেহ বা জ্ঞাতসারে, ঘোরাফেরা করিতেছিল। ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধা যে একজনের হোল্ডঅলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন, তাহা কেহ

লক্ষ্য করিল না। করিবার কথাও নয়, বিদেশাগত শিভ্যাল্‌রি জিনিসটা যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়। সকলে অবশ্য যুবতীদিগকে লইয়া প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ব্যস্ত ছিল না। যাঁহার হোল্‌ড্র-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া বুড়ী পড়িয়া গেলেন, তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, কাছেই ছিলেন। তিনি বুড়ীকে স-ধমক উপদেশ দিলেন একটা।

"পথ দেখে চলতে পার না? আর-একটু হলে আমার স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যেত যে!"

বুড়ীর ডান পা-টা বেশ মচকাইয়া গিয়াছিল। তবু তিনি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া প্ল্যাটফর্মময় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে একটা স্থান সংগ্রহ করিতেই হইবে। অসম্ভব। ট্রেন বেশীক্ষণ থামিবেও না। হুড়মুড় করিয়া শেষে তিনি একটা সেকেলে ইণ্টার ক্লাসে উঠিয়া পড়িলেন। যথারীতি সকলেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। বর্তমানে অবশ্য ইণ্টার ক্লাসের নাম বদলাইয়া সেকেণ্ড ক্লাস হইয়াছে।

একজন বাঙালী ভদ্রলোক ইচ্ছা করিলে একটু সরিয়া বসিয়া জায়গা করিয়া দিতে পারিতেন, তিনি জিনিসপত্র সমেত বেশ একটু ছড়াইয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি সরিয়া বসিলেন না, উপদেশ দিলেন।

"উঠলে ত, এখন বসবে কোথায় বাছা?"

"আমি নিচে তোমাদের পায়ের কাছে বসব বাবা। দুটো স্টেশন মাত্র, তারপরই নেবে যাব। বেশীক্ষণ অসুবিধা করব না তোমাদের।"

বুড়ী তাঁহার পায়ের কাছেই তাঁহার জুতা জোড়া সরাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অসুবিধা তেমন কিছু হইল না, কারণ বৃদ্ধা ছোটখাটো আয়তনের মানুষ, গুটিসুটি হইয়া বসিয়া ছিলেন। একটু পরেই কিন্তু তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। যে পায়ে স্ট্র্যাপটা আটকাইয়া গিয়াছিল সেই পা-টা বেশ ব্যথা করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলেন, পা ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাবনা হইল নামিবেন কী করিয়া। আর দুই স্টেশন পরেই শুধু নামিতে হইবে না, আর-একটা ট্রেনে উঠিতেও হইবে। অথচ পা নাড়িতে পারিতেছেন না, দাঁড়ানই যাইবে না যে। ট্রেনের কামরায় অনেক বাঙালী রহিয়াছেন, অনেকে তাঁহার পুত্রের বয়সী, অনেকে পৌত্রের। কিন্তু ইঁহারা যে তাঁহার সাহায্য করিবেন, পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না। তবু হয়ত ইঁহাদেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে। উপায় কি!

বৃদ্ধা যে-স্টেশনে নামিবেন, সে-স্টেশন একটু পরেই আসিয়া পড়িল। প্যাসেঞ্জাররা হুড়-মুড় করিয়া সবাই নামিতে লাগিলেন, বুড়ীর দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিলেন না।

"আমাকে একটু নাবিয়ে দাও না বাবা, উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছি না আমি"

বুড়ীর এই করুণ অনুরোধ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কিন্তু অধিকাংশই ভান করিলেন যেন কিছু শুনিতে পান নাই।

একজন বলিলেন, "ভিকিরী মাগীর আস্পর্ধা দেখেছেন ? যাচ্ছে ত উইদাউট টিকিটে, তার উপর আবার—"

তিনি বৃদ্ধাকে ভিখারিনীই মনে করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা কিন্তু ভিখারিনী নন, তাঁহার টিকিটও ছিল। সেকেণ্ড ক্লাসেরই টিকিট ছিল।

আর একজন বিজ্ঞ মন্তব্য করিলেন, "এই সব হেল্পলেস বুড়ীকে রাস্তায় একা ছেড়ে দিয়েছে, এর স্বামী ছেলে নেই না কি, আশ্চর্য কাণ্ড!"

সিগারেটে টান দিতে দিতে তিনিও নামিয়া গেলেন। গাড়িতে যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জন-দুই টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া আহারে মন দিয়াছিলেন, বুড়ীর কথা তাঁহাদেরও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করা তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন না।

বৃদ্ধা তখন দুই হাতে ভর দিয়া ঘঁ্যাসটাইয়া দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নামিতে সাহস পাইতেছিলেন না।

"এই বুড়ী, হটো দরোয়াজাসে—"

এক মারোয়াড়ী যাত্রী বৃদ্ধার গায়ে প্রায় পদাঘাত করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে এক বলিষ্ঠকায় কুলী। তাহার মাথায় স্যুটকেশ হোল্ড-অল। কুলীর পিছনে চপ্পল-পায়ে নীল-চশমা-পরা লক্কা গোছের এক ছোকরা। সে ভঙ্গীভরে বলিল, "দয়াময়ি, পথ ছাড়ুন। দরজার কাছে বসে কেন!"

"পায়ে লেগেছে বড্ড বাবা, নামতে পাচ্ছি না"

"ও দেখি, যদি একটা স্ট্রেচার আনতে পারি"

ছোকরা ভিড়ে অন্তর্ধান করিল, আর ফিরিল না।

যে-বলিষ্ঠ কুলীটা মাল মাথায় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল সে বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"মাইজি, কিরপা করকে থোড়া হট্‌কে বৈঠিয়ে। আনে-যানেকা রাস্তা পর কাহে বৈঠ্ গ্যয়ে ?"

বৃদ্ধা হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

"আমি নামতে পাচ্ছি না, বাবা, পায়ে চোট্ লেগেছে—"

"আপ কাঁহা যাইয়ে গা—?"

"গয়া—"

"চলিয়ে, হাম আপকো লে যাতে হেঁ"

বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি যেমন করিয়া ছোট শিশুকে দুই হাতে করিয়া বুকের উপর তুলিয়া লয়, কুলীটি সেইভাবে বৃদ্ধাকে বুকে তুলিয়া লইল। সোজা লইয়া গেল ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে।

"আপ হিঁয়া পর বৈঠিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জারকা থোড়া দেরি হ্যায়। হাম ঠিক টাইম পর আকে আপকো ট্রেনমে চঢ়া দেঙ্গে"

বৃদ্ধা ওয়েটিং রুমের মেঝেতেই উপবেশন করিলেন।

যে দুইটি ইজিচেয়ার ছিল, সে-দুইটিতেই সাহেবী পোশাক-পরা দুইজন বঙ্গসন্তান হাতলের উপর পা তুলিয়া দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া ছিলেন। একজন পড়িতেছিলেন খবরের কাগজ, আর-একজন একখানি ইংরেজী বই। বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে-নারীমূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।

সম্ভবতঃ আলোচনাটা আগেই হইতেছিল। পুনরায় আরম্ভ হইল।

"শিভ্যল্‌রি আমাদের দেশেও ছিল। নার্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা, একথা আমাদের মনুতেই লেখা আছে মশাই।"

যিনি নারী-মূর্তি-সম্বলিত ইংরেজী মাসিক পড়িতেছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ এ খবর জানিতেন না। উঠিয়া বসিলেন।

"বলেন কি! এ-কথা জানলে ব্যাটাকে ছাড়তুম না কি! মনুর যুগেও যে আমাদের দেশে শিভ্যল্‌রি ছিল, আমরা যে বর্বর ছিলুম না, এ-কথা ভাল করে'ই বুঝিয়ে দিতুম বাছাধনকে—"

বৃদ্ধা অনুভব করিলেন ইতিপূর্বে কোন সাহেবের সঙ্গে বোধহয় লোকটির তর্ক হইয়াছিল। শ্বেতবর্ণ সাহেব সম্ভবতঃ এই সাহেবী পোশাক-পরা কৃষ্ণচর্ম বঙ্গ-সুন্দরকে বর্বর বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা মনে মনে বলিলেন, "তোমরা বর্বরই বাছা। তোমাদের শিভ্যল্‌রি অবশ্য আছে, কিন্তু তার প্রকাশ কেবল যুবতী মেয়েদের বেলা"

www.boiRboi.blogspot.com

বৃদ্ধার বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে কিঞ্চিৎ দখল ছিল। সেকালের বেথুন স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

হঠাৎ দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন।

"আরে, এ আবার কোত্থেকে জুটল এসে এখানে ?"

"কোন ভিকিরী-টিকিরী বোধ হয়"

প্রথম ভদ্রলোক আন্দাজ করিলেন।

"সত্যি, ভিখিরীতে ভরে গেল দেশটা। স্বাধীনতার পর ভিখিরীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। সবাই আবার মুখ ফুটে চাইতেও পারে না"

দেখা গেল ভদ্রলোকটি একটি পয়সা বাহির করিয়া বুড়ীর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন বৃদ্ধা।

"পয়সাটা তুলে নাও, তোমাকেই দিলাম"

বৃদ্ধা তবু কোন কথা বলিলেন না।

দাতা ভদ্রলোকের সন্দেহ হইল বোধহয় বুড়ী বাঙালী নয়। তখন রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করিলেন। চাকুরির অনুরোধে কিছুদিন পূর্বেই রাষ্ট্রভাষায় পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন।

"পয়সা উঠা লেও। তুম্‌হী কো দিয়া"

তখন বৃদ্ধা পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন, "আমি ভিখিরী নই বাবা, আমি আপনাদেরই মত একজন প্যাসেঞ্জার"

"এখানে কেন। এটা যে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম"

"আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট আছে"

পরমুহূর্তেই সেই বলিষ্ঠ কুলীটি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

"চলিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জার আ গিয়া"

তাহার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা পুনরায় বৃদ্ধাকে শিশুর মত বুকে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

গয়া প্যাসেঞ্জারে একটু ভিড় ছিল। কিন্তু কুলীটি বলিষ্ঠ। শক্তির জয় সর্বত্র। সে ধমক-ধামক দিয়া বুড়ীকে একটা বেঞ্চের কোণে স্থান করিয়া দিতে সমর্থ হইল।

বৃদ্ধা তাহাকে দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

এই প্রসঙ্গে কুলীর সহিতে হিন্দীতে যে কথাবার্তা হইল তাহার সারমর্ম এই :

www.boiRboi.blogspot.com

"আমার মজুরি আট আনা। দু টাকা দিচ্ছেন কেন ?"

"তুমি আমার জন্যে এত করলে বাবা, তাই বেশী দিলুম"

"না মাইজি, আমাকে মাপ করবেন। আমি ধর্ম বিক্রি করি না"

তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করেছ। আমি ত তোমাকে দুধ খাওয়াইনি, সামান্য যা দিচ্ছি তা দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা। দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন"

বৃদ্ধার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের কোণে জল টলমল করিতে লাগিল।

কুলী ক্ষণকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রণাম করিয়া নামিয়া গেল।

দন্ত-কৌমুদী

যাহারা পতিতা, যাহারা নিজেদের দেহ বিক্রয় করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, তাহাদের ঘৃণা করা উচিত—সুনীতিপরায়ণ সাধু ব্যক্তিদের ইহাই নির্দেশ। তাঁহারা আরও বলেন, তাহাদের সংস্রবও পরিহার্য। প্রথম উপদেশটি এতদিন পালন করিয়াছি, কিন্তু দ্বিতীয়টি পারি নাই। কারণ আমি ডাক্তার, রোগিণী আসিয়া উপস্থিত হইলে সে পতিতা, কি সতী এ বিচার করা চলে না, তাহার চিকিৎসায় মন দিতে হয়, সুতরাং সংস্রব অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই দ্বিতীয় উপদেশটি পালন করা সম্ভব হয় নাই। আজ দেখিতেছি, প্রথম উপদেশটির মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারিলাম না। চাহনির উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করিতে হইল। সবাই তাহাকে চাউনি বলিয়া ডাকিত। বিহারীরা বলিত, নজরিয়া। আমি নামটাকে একটু শুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলাম। চাহনি নামজাদা পতিতা ছিল না, চিত্র-তারকা হইবার সুযোগ সে পায় নাই। তাহার ফী ছিল মাত্র এক টাকা। পথচারিণী ছিল সে।

সে আমার নিকট প্রথম যখন আসিয়াছিল তখন সে সিফিলিসে জর্জরিত। অনেকগুলি ইনজেকশন দিয়া তাহাকে ভালো করিলাম। আমার ফী দিতে কোনদিন সে কার্পণ্য করিত না, কেবল শেষের ফীটা সে দিতে পারে নাই, হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, এখন হাতে পয়সা নেই ডাক্তারবাবু, পরে দিয়ে যাব। বিশ্বাস করুন আমাকে, নিশ্চয় দিয়ে যাব।

www.boiRboi.blogspot.com

বছর খানেক পরে আবার আসিয়াছিল সে। আমার ফী আনে নাই, নতুন একটা সমস্যা সমাধান করিবার জন্য পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিল।

বলিল, আমার দাঁতগুলো দেখুন তো ডাক্তারবাবু। দেখিলাম, দাঁতগুলি মজবুত আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিই কুচকুচে কালো। মিশি, গুল এবং পান-দোক্তাই কারণ। বলিলাম, দাঁত তো ভালোই আছে। রঙ অবশ্য কালো হ'য়ে গেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি?

চাহনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

এ কালো রঙ উঠিয়ে দেওয়া যায়?

যায়, কিন্তু অনেক হাঙ্গামা। এখানে হবে না। কোলকাতা যেতে হবে। থাক না কালো রঙ, ক্ষতি কি?

চাহনি বলিল, আজকাল ঝকঝকে সাদা দাঁত সবাই চায়। আমার খদ্দের অনেক কমে গেছে।

বলিয়া মাথা হেঁট করিল। তাহার পর বলিল, কোলকাতাই চলে যাই তা হলে। রেশমীও এই কথা বলছিল। আপনিও যখন বলছেন তখন সেই ব্যবস্থাই করি।

যাইবার পূর্বে বলিয়া গেল, আপনার ফীয়ের কথা ভুলি নি, পাঠিয়ে দেব পরে। বড় টানাটানি চলছে আজকাল।

চলিয়া গেল।

তাহার পর আরও পাঁচ বছর কাটিয়াছে। চাহনির কোনও খবর আর পাই নাই। আজ সকালে একটি ঘাড়-ছাঁটা ছোকরা একটি চিঠি এবং একটি সীল-করা কৌটা আমার হাতে দিয়া গেল। বলিল, চাউনি এটা কোলকাতা থেকে আপনাকে পাঠিয়েছে।

কী আছে কৌটোতে?

তা তো জানি না।

ছোকরা চলিয়া গেল।

চিঠিটা খুলিয়া পড়িলাম। আঁকা-বাঁকা লেখা, অজস্র বানান ভুল। ভাষাতেও গুরু-চণ্ডালী দোষ। সংশোধন করিয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

শ্রীচরণেষু—

শত সহস্র প্রণামান্তে নিবেদন,

ডাক্তারবাবু, ভগবানের কৃপায় আশা করি আপনি ভালো আছেন। আশা

করি এ অভাগীর কথা আপনার মনে আছে। আপনার পরামর্শ অনুসারে আমি কলিকাতায় আসিয়া একজন বড় দাঁতের ডাক্তারকে আমার দাঁতগুলি দেখাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সব দাঁতগুলি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লও। সবগুলি না পার, অন্তত সামনের কয়টি বাঁধাইয়া লও। দেখিতেও ভালো হইবে, দাঁতগুলি অনেকদিন টিকিবেও। ইহাতে ফলও হইয়াছিল।, এখানেই নূতন করিয়া আবার ব্যবসা ফাঁদিয়াছিলাম। লোক মন্দ জুটিত না। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমার অদৃষ্টই মন্দ। আবার ব্যায়রামে পড়িলাম। এবার যক্ষা। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, বাঁচিবার আশা কম। অনেক টাকা খরচ করিলে কিছুদিন বাঁচিতে পারি। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইব না। আমার টাকা আর নাই, চিকিৎসায় এবং বাড়িভাড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আর বাঁচিব না। আপনার সহিত আর আমার দেখাও হইবে না। আপনার কিছু ফী বাকি ছিল, সে কথা আমি ভুলি নাই। আপনার ঋণ শোধ করিবার নয়, তবু ফী বাবদ কিছু পাঠাইতেছি। আমার কাছে নগদ টাকা নাই। আমার সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলিই আপনাকে একটি কৌটায় পুরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। পাড়ায় একটি ছোকরা দাঁতের ডাক্তার আছে, সে-ই পয়সা না লইয়া দাঁতগুলি উপড়াইয়া দিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। রেশমীর ছেলে খোনতা এখানে আসিয়াছিল, তাহার হাতেই পাঠাইলাম। আপনি গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি.

সেবিকা

চাহনি

একই বারান্দায়

আমার ডিসপেন্সারির সংলগ্ন ছোট একটি বারান্দা আছে। তার উপরে দিনে ধুলো জমে, রাত্রে কুলি আর রিকৃশাওলারা শোয়। গভীর রাত্রে সেখানে মাঝে মাঝে জুয়ারও আড্ডা বসে শুনেছি। একদিন ডিসপেন্সারিতে বসে আছি এমন সময় সেই বারান্দায় আর একরকম সম্ভাবনা আভাষিত হল হঠাৎ।

একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে এসে ডিসপেন্সারিতে প্রবেশ করল এবং নমস্কার করে' কাচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। রোগী নয়, সাহায্যপ্রার্থী। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। পূর্ববঙ্গের ভাষায় সসঙ্কোচে বললে, "বড় দুরবস্থায় পড়েছি।

কিছু সাহায্য চাই।" এর আগে এরকম সাহায্য আরও অনেককে করেছি। দু' এক টাকা দিলেই চুকে যেত। কিন্তু আমার মনে এক উদ্ভট প্রেরণা এল।

বললাম, "সামান্য দু' এক টাকা নিয়ে কি আপনার অভাব মিটবে? এরকম ভিক্ষে করেই বা চলবে কতদিন?"

"আমাকে একটা চাকরী জুটিয়ে দিন কোথাও"

"লেখাপড়া কতদূর করেছ?"

"ম্যাট্রিক পাশ করেছি"

"ম্যাট্রিক পাশ ছেলের তো কোথাও ভাল চাকরী জুটবে না। তার চেয়ে তুমি ছোটখাটো দোকান কর না কোথাও—"

"ক্যাপিটাল কে দেবে আমাকে!"

"বেশী ক্যাপিটাল দিয়ে কি হবে? খুব কম ক্যাপিটাল নিয়ে আরম্ভ কর কিছু, দোকানদারি করবার অভিজ্ঞতাটা হোক আগে। তারপর বেশী ক্যাপিটাল নিয়ে বড় কিছু করবার যোগ্যতা হবে—"

"কি করব বলুন—"

"আমার এই ডিসপেন্সারির সামনে দিয়ে এই বড় রাস্তা চলে' গেছে। কত লোক যাচ্ছে আসছে। তুমি কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি দেশলাই নিয়েই বসে' যাও না। অনেক ছেলেমেয়েও রোজ স্কুলে যায় এদিক দিয়ে, খাতা পেন্সিল, কালির বাড়ি— এসবও কিছু কিছু রাখতে পার। আমার এই চওড়া বারান্দা রয়েছে, এরই ওপর বসে' যাও কাল থেকে—"

"ওসব জিনিস কেনবারও টাকা নেই আমার কাছে"

"আচ্ছা, আমি দিচ্ছি তোমায় দশটা টাকা—"

দশ টাকা দিলাম। টাকা নিয়ে সে জিনিসপত্রও কিনে আনল। একটা মাদুর দিলাম, সেটা বারান্দায় বিছিয়ে হর্ষকুমার দোকান সাজিয়ে বসল। লজেন্সও এনেছিল কিছু। তাই ছেলেমেয়েরা আসতে লাগল। প্রথম মুশকিল হ'ল ভাষা নিয়ে। হর্ষকুমারের ভাষা বিহারী ছেলেমেয়েরা বোঝে না, তাদের ভাষা হর্ষকুমার বুঝতে পারে না। তারপর লক্ষ্য করলাম হর্ষকুমারের কথা বলবার ধরনটাও মোলায়েম নয়, মুখভাবও স্নিগ্ধ নয়। সে সকলের সঙ্গে যেন খেঁকিয়ে কথা বলছে। যদিও সে মাটির উপর মাদুর বিছিয়ে বসে' আছে এবং তার পুঁজি মাত্র দশ টাকা, কিন্তু তার হাবভাব যেন নবাব খাঞ্জা খাঁর মতো। সম্ভ্রমাত্মক হিন্দী 'আপ' শব্দটা তার জানা ছিল না। কোন ছেলে তাই তার দোকানে

এসে জিনিসে হাত দিলেই সে মাতৃভাষায় খিঁচিয়ে উঠত—"এই ছ্যামড়া, ও কি করস।" তার ভাবভঙ্গি দেখে ছেলেগুলো প্রথম প্রথম হাসত খুব। তারপর ছেলেদের যা স্বভাব ক্ষ্যাপাতে শুরু করলে তাকে। নামই বার করে' ফেললে তার একটা—করসবাবু। 'এ করসবাবু' 'এ করসবাবু' বলে রোজ এসে চীৎকার করত তারা তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। আমি শুদ্ধ অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়লুম। বিক্রি অবশ্য হ'ত কিছু-কিছু রোজই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হর্ষকুমার দোকান টিকিয়ে রাখতে পারল না। একদিন এসে বলল আমাকে যে দেশে তার জমিদারি ছিল, সে জমিদারের ছেলে, এরকম উঞ্ছবৃত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যেন তাকে ক্ষমা করি। পরদিনই আমার বারান্দা থেকে উঠে গেল। দিন কয়েক পরে আমার দশটা টাকাও ফেরত দিয়ে গেল। এইখানেই যবনিকাপাত হ'ল—এই আমার মনে হয়েছিল তখন। কিন্তু যবনিকাপাত হ'ল মাস তিনেক পরে। হর্ষকুমার আর একদিন এসেছিল। একেবারে ফুলবাবু সেজে এসেছিল। মাথায় ঢেউ-খেলানো টেড়ি, কব্জিতে রিস্টওয়াচ, পরনে হাওয়াই কোট আর ছিটের প্যান্ট। বললে—চাকরি পেয়েছি একটা। জিজ্ঞাসা করলাম, মাইনে কত। বললে, পঁয়তাল্লিশ টাকা। পরে আরও বাড়বে। দেখলাম এইতেই সে খুব খুশী।

উক্ত ঘটনার মাস ছয়েক পরে একদিন আর একটি সৌম্যদর্শন যুবক হাজির হল আমার বারান্দায়। এ-ও উদ্বাস্তু। পাঞ্জাব থেকে এসেছে। তার সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হলাম। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে সবিনয়ে নমস্কার করে' এগিয়ে এল। হিন্দী ভাষায় জানাল তার একটি প্রার্থনা আছে আমার কাছে।

"কি প্রার্থনা?"

সে বললে যে, আমার বারান্দায় সে ছোটখাটো একটা চায়ের দোকান করতে চায়। সে গরীব উদ্বাস্তু, মাসে পাঁচ টাকার বেশী 'কেরায়া' (ভাড়া) দিতে পারবে না। আমি যদি মেহেরবানি করি তাহলে বড়ই উপকৃত হয় সে।

তাকে বললাম, বেশ দোকান কর। ভাড়া দিতে হবে না।

কৃতার্থ হয়ে গেল সে যেন।

পরের দিনই যজ্ঞদত্ত তার দোকান ফেঁদে ফেললে। তার সম্বল একটা তোলা কয়লার উনান, কিছু পিরিচ পেয়ালা, এক বালতি জল, কিছু চা দুধ আর চিনি।

উনুনটা বাইরে থেকে ধরিয়ে আনত। ধোঁয়ার জন্য আমাকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি।

উপরন্তু আমার নানারকম সুবিধা করে' দিয়েছিল সে। আমাকে এবং আমার বন্ধুবান্ধবদের বিনা পয়সায় চা খাওয়াতো। রোজ সকালে এসেই আমার ডিসপেন্সারি ঘরটি ঝাড়ু দিত, টেবিল চেয়ার ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কারভাবে কুঁজোয় জল ভরে' আনত। একদিন বললে—ডাক্তারবাবু, আপনার জুতোয় অনেক দিন কালি দেওয়া হয়নি, যদি হুকুম করেন কালি বুরুশ করে' দিই। নিজের জুতোর দিকে চেয়ে লজ্জিত হয়ে পড়লাম। সত্যিই অনেক দিন কালি দেওয়া হয়নি।

বললাম, "থাক। তোমাকে করতে হবে না। ভুটুয়া ক'রে দেবে'খন।"

"আমি দিচ্ছি হুজুর। ভুটুয়ার চেয়ে আমি অনেক ভাল পারব। আপনি দেখুন—"

জোর করে' আমার পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিল। আর সত্যিই এমন চমৎকার বুরুশ করে' দিলে যে, তাক লেগে গেল আমার। কোন মুচিও বোধ হয় এমন চমৎকার করে' করতে পারত না।

আমি খুব খুশী হলাম তার উপর। শুধু আমি নয়, আমার গৃহিণীও হলেন। কারণ গৃহিণীর প্রধান সমস্যা ছিল সকাল বেলার বাজার। আমার ডিসপেন্সারির চাকর ভুটুয়া ডিসপেন্সারির কাজকর্ম সেরে তবে বাজার করতে যেত। যজ্ঞদত্ত তার কাজের ভার নেওয়াতে সে সকাল সকাল ছুটি পেত, বাজারও পৌঁছত ঠিক সময়ে। যজ্ঞদত্তের দোকানও বেশ জেঁকে উঠল।

তার ভদ্র ব্যবহারে আর সুন্দর চেহারায় সবাই আকৃষ্ট হ'ত তার দোকানে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেয়ে যেত অনেকে। ক্রমশ সে বিস্কুট আর কেকও আমদানি করলে। বেশ চলতে লাগল দোকান।

দিনকতক পরে রাস্তার ওপারে একটি ঘর খালি হল। যজ্ঞদত্ত তার দোকান উঠিয়ে নিয়ে গেল সেখানে। টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজাল দোকানটিকে। তারপর একদিন দেখলাম চপ কাটলেটও ভাজা হচ্ছে সেখানে।

যজ্ঞদত্ত দোকান অন্য জায়গায় উঠিয়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আগে যেমন ছিল, তখনও তেমনি রইল। আমার ডিসপেন্সারি ঝাড়ু দেওয়া, চেয়ার টেবিল ঝাড়া, কুঁজোয় জল ভরা এবং মাঝে মাঝে জুতো বুরুশ করা—ঠিক আগের মতোই চলতে লাগল। যজ্ঞদত্ত আমার নির্ভরযোগ্য আপনজন হয়ে উঠল ক্রমশ।

www.banglabooks.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

একদিন সে এসে একখানি চিঠি আমাকে দিলে। বললে, "আমি ইংরেজী পড়তে পারি না, চিঠিটাতে কি আছে মেহেরবানি করে' পড়ে দিন।" দেখলাম চিঠিখানা দিল্লী থেকে এসেছে। তাতে যা লেখা আছে, তা পড়ে বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে গেলাম আমি। লেখা আছে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে যে সম্পত্তি ছিল তা বিক্রি করা হয়েছে এবং তার অংশের এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা সরকারের কাছে জমা করা হয়েছে। যজ্ঞদত্ত যেন আইন অনুসারে সে টাকাটা নেবার ব্যবস্থা করে। যজ্ঞদত্তকে চিঠির মর্ম বললাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কি সম্পত্তি ছিল তোমার ?"

"জমিদারি ছিল হুজুর। জুয়েলারির কারবার ছিল। হাতি বাঁধা থাকত আমাদের দুয়ারে—"

ইচ্ছে হল যজ্ঞদত্তকে প্রণাম করি একটা। কিন্তু তা আর পারলাম না।

পুত্র

নূতন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মফঃস্বলে টুর করতে বেরিয়েছেন। এই প্রথম বেরিয়েছেন তিনি। প্রতিভাবান বাঙালী যুবক, অল্প কিছুদিন আগেই বিলেত থেকে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সসম্মানে। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য স্টেশনে এসেছেন প্রবীণ অবাঙালী সাব-ডিভিশনাল অফিসার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস (ইনি খাঁটি সাহেব), থানার দারোগা, কয়েকজন কনস্টেবল। আর এসেছেন জিতেন্দ্রনাথ বসু, সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কেরানী একজন। স্টেশনের বাইরে তিনখানি মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে। একটি এস. ডি. ও. সাহেবের, একটি এস. পি.-র। তৃতীয় কারটি স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী যুগলরাম মাড়োয়ারীর। এই তৃতীয় কারটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কারণ এটি পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত। সাধারণতঃ বিয়ের সময় বরের গাড়ি যেভাবে সাজানো হয়, এটি সেইভাবে সাজানো। এ গাড়িটি চেয়ে এনেছেন কেরানী জিতেন্দ্রনাথ বসু।

...ট্রেন একটু লেট আসছে। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছেন সবাই। ছোট শহরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আগমনও একটা হৃৎস্পন্দনকর ঘটনা। স্টেশন মাস্টার, টিকিট কালেক্টার পর্যন্ত একটু যেন সন্ত্রস্ত ও বিচলিত। তখন ইংরেজের আমল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরাই তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বৃটিশ শাসনের প্রতিভূ ও

প্রতীক। লাল-পাগড়ি পুলিস, দারোগা, এস. পি., এস. ডি. ও. এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যে প্ল্যাটফর্মে সমবেত যাত্রীরা পর্যন্ত সহজে নিশ্বাস নিতে পারছেন না। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে আধময়লা-জামা-কাপড়-পরা জিতেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন সসঙ্কোচে। তাঁর মনিব সাব-ডিভিশনাল অফিসারের সামনে প্রগল্ভতা প্রকাশ করতে পারছেন না তিনি। কিন্তু তাঁর নাচতে ইচ্ছে করছে।

www.boiRboi.blogspot.com

ঢং ঢং ঢং ঢং—ঘণ্টা পড়ল। ট্রেন আসছে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল ট্রেন। এস. ডি. ও., এস. পি. এগিয়ে গেলেন প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। জিতেনবাবুও দৌড়ে গেলেন, কিন্তু খুব কাছাকাছি যেতে পারলেন না। মনিবের সঙ্গে সম্মানসূচক দূরত্ব রক্ষা করে' একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলেন।

গাড়ি থেকে নাবলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। কচিমুখ, নেহাত ছেলেমানুষ। প্রতিভার দীপ্তি কিন্তু বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখ মুখ থেকে।

নেবেই এস. ডি. ও. এবং এস. পি.র সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করলেন। এগিয়ে আসতে লাগলেন তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। কিছু দূর এসেই জিতেনবাবুকে পেলেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে। অবাক্ হ'য়ে গেল সবাই।

এস. ডি. ও.-র দিকে ফিরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, "ইনি আমার বাবা—।" এস. ডি. ও. এই ধরনের একটা কানাঘুষো শুনেছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করেন নি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা শুনে নমস্কার করলেন জিতেনবাবুকে। কিন্তু নিজের অধীনস্থ কেরানীর কাছে সর্বসমক্ষে মাথা নোয়াতে হ'ল বলে' ক্ষুব্ধও হলেন একটু।

খাঁটি সাহেব এস. পি. বাঙালী-মহলে-প্রচারিত এ খবরটা জানতেনই না। বেশ অবাক হলেন। কিন্তু টুপিটা ঈষৎ তুলে শিষ্টাচার সম্মত অভিবাদন জানাতে কসুর করলেন না।

জিতেনবাবু বললেন, "আমি গাড়ি এনেছি—"

"ও—"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

"জাস্ট এ মিনিট সার—"

এস. পি. তাঁকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেলেন একপাশে। এস. ডি. ও সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

এস. পি. বললেন, "আপনি আমার ওখানে চলুন। এখানে ভালো ডাক বাংলো নেই। আমার বাংলোতেই সব ব্যবস্থা করেছি আপনার। ডিনার ইজ ওয়েটিং—" এস. ডি. ও. বললেন, "এক্সকিউজ মি, আর একটা কথাও বিবেচনা করবার আছে। মিস্টার বোস আমার অফিসের একজন ক্লার্ক। একজন সাব-অর্ডিনেট ক্লার্কের বাড়িতে আপনার ওঠাটা অফিসিয়াল দৃষ্টিতে একটু অশোভন হবে না কি? জানেনই তো আজকাল যিনি কমিশনার, অফিসিয়াল কর্মের দিকে তাঁর খুব কড়া নজর।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ক্ষণকাল চুপ করে' রইলেন। তারপর বাবাকে গিয়ে বললেন সে-কথা। জিতেনবাবু বললেন, "ও, তাই না কি। তাহলে যাও তুমি ওঁদের সঙ্গেই। কমিশনার সাহেব সত্যিই খুব কড়া লোক। হয়তো—না থাক, ওদের সঙ্গেই যাও তুমি।"

এস. পি. সাহেবের গাড়িতে চড়ে' চলে' গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

তাঁর পিছু পিছু এস. ডি. ও. সাহেবও গেলেন।

পুষ্পে পত্রে সজ্জিত যুগল মাড়োয়ারীর গাড়িটা দাঁড়িয়ে রইল।

জিতেনবাবু ড্রাইভারকে গিয়ে বললেন, "একটা জরুরি দরকারে ওকে পুলিস সাহেবের সঙ্গে চলে' যেতে হ'ল। তোমার গাড়ির আর দরকার হ'ল না। তুমি যাও—"

যুগলবাবুর গাড়ি চলে' গেল।

জিতেনবাবু চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর হেঁটে হেঁটেই নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন তিনি।

অতিশয় ছোট বাড়ি তাঁর, গলির গলি তস্য গলির মধ্যে। তবু এই বাড়িটিকেই যথাসাধ্য সাজিয়েছিলেন তিনি। চুনকাম করিয়েছিলেন। বাড়ির সামনেটা দেবদারু পাতা আর রঙান কাগজের শিকল দিয়ে অলঙ্কৃত করেছিলেন; একটা লাল শালুর উপর সাদা অক্ষরে 'স্বাগত' লিখেও টাঙিয়ে দিয়েছিলেন বারান্দার সামনে। ছ'চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন এই উপলক্ষে।

জিতেনবাবু যখন ফিরে এলেন তখনও তাঁর নিমন্ত্রিত বন্ধুরা বসে' ছিলেন।

"সুকু আসতে পারলে না। একটা জরুরি দরকারে পুলিস সাহেব টেনে নিয়ে গেল তাকে"

"তাই না কি—"

হতাশ হলেন দু-একজন, কেউ কেউ অবাক হলেন, মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করলেন দু-একজন। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেলেন একে একে।

www.boiRboi.blogspot.com

সবাই চলে' যাবার পর জিতেনবাবু চুপ করে' বসে' রইলেন বারান্দার উপর খানিকক্ষণ। তিনি বিপত্নীক। ওই সুকুমারই তাঁর একমাত্র সন্তান। বড় আশা করেছিলেন সে এসে তাঁর কাছেই উঠবে। কিন্তু এল না।

দুই

গভীর রাত্রি, থমথম করছে চতুর্দিকে। জিতেনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

"বাবা—বাবা—"

দুয়ারে কড়া সশব্দে নড়ে উঠল।

তড়াক করে' উঠে বসলেন জিতেনবাবু।

এত রাত্রে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছে কে! তাড়াতাড়ি গিয়ে কপাটটা খুলে দিলেন।

"এ কি, সুকু—!"

"আমি এইখানেই চলে এলাম। কমিশনার সায়েব যা-ই মনে করুক, আমি তোমার কাছেই থাকব—"

জড়িয়ে ধরলেন তাকে জিতেনবাবু। কেঁদে ফেললেন।

"এত রাত্রে কি করে' এলি তুই—"

"হেঁটেই চলে এলাম।"

স্মৃতির খেলা

সব শক্তির মতই স্মৃতি-শক্তি ব্যাপারটাও একটু গোলমেলে। কখন যে কি খেলা খেলেন বলা শক্ত। কখনও কৃপা করেন, কখনও করেন না। সেদিন আমার ভাগ্যে দু'রকমই হ'ল এবং দু'বারই নাকাল হতে হ'ল আমাকে।

ফার্স্টক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করে' যাচ্ছি। গাড়িতে উঠে দেখলাম আর কোনও যাত্রী নেই। ন'টা বেজে গেছে, সুতরাং গাড়িটি ভিতর থেকে 'লক্' করে' শুয়ে পড়ায় কোনো বাধা ছিল না। প্যাণ্টটি খুলে হুকে ঝুলিয়ে দিলাম, তারপর লুঙ্গিটি পরে' শুয়ে পড়লাম। কিন্তু 'লক্' করতে ভুলে গেলাম। ফল যা হ'ল তা মর্মান্তিক। গভীর রাত্রে দড়াম্ করে' একটা শব্দ হ'ল, ধড়মড় করে'

উঠে বসলাম। আলো জ্বেলে দেখি সামনের বেঞ্চে আড়ময়লা কামিজ-পরা এক ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে' বসে রয়েছেন আর গাড়ির মেজেতে একটা হাঁড়ি ভেঙে চুরমার হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। তার থেকে কালো চটচটে একটা পদার্থ কামরার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছে।

www.boiRboi.blogspot.com

"কে আপনি মশাই, এ কি কাণ্ড!"

হাত কচলাতে কচলাতে ভদ্রলোক বললেন, "আলকাতরার হাঁড়িটা ওই টেবিলটার উপর রেখেছিলাম, কিন্তু ট্রেনটা এমন ঘচাং করে থামল যে হাঁড়িটা পড়ে গেল—"

আলকাতরা! ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম আমার ঝোলানো-প্যান্টের পা দুটোতে লেগেছে, বেঞ্চির নীচে স্যুটকেসটা ছিল তাতে লেগেছে আর জুতো-জোড়া তো মাখামাখি হ'য়ে গেছে একেবারে। আপাদমস্তক রাগে জ্বলে উঠল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গার্ডকে ডাকলাম। দেখলাম ট্রেন একটা বড় স্টেশনেই দাঁড়িয়েছে।

গার্ডসাহেব এসে সব দেখে শুনে বললেন, "আচ্ছা আমি একটা মেথর পাঠিয়ে দিচ্ছি, যতটা পারে পরিষ্কার করে' দিক—"

গার্ডসাহেব বলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কালেকটার এলেন। দেখা গেল ভদ্রলোকের টিকিট থার্ডক্লাসের।

টিকিট কালেকটার তাঁকে জিগ্যেস করলেন—"কোথা যাবেন আপনি।"

"এখানেই নামব।"

টিকিট কালেকটার তখন পকেট থেকে ছোট বই বার করলেন একটি। বইটি দেখে বললেন, "আপনাকে দশটাকা সাড়ে পনর আনা এক্সেস্ ফেয়ার দিতে হবে।"

"আমার কাছে তো একটি পয়সাও নেই। আমি অন্ধকারে বুঝতে পারি নি এটা কোন্ ক্লাস। আমাদের স্টেশনে ট্রেনও এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। সামনে যে গাড়ি পেয়েছি তাতেই উঠে পড়েছি।"

টিকিট কালেকটার বললেন, "ওসব কথা জেনে আমার লাভ নেই। এক্সেস্ ফেয়ার আপনাকে দিতেই হবে। আপনি শুধু যে বিনা টিকিটে এসেছেন তা নয়, রাতদুপুরে একজন ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারকে বিব্রত করে' তাঁর গুরুতর ক্ষতি করেছেন। আসুন আমার সঙ্গে।"

টিকিট কালেকটারের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক চলে গেলেন। দেখা গেল, আলকাতরার হাঁড়িটি ছাড়া তাঁর আর কিছু ছিল না।

তারপর মেথর এল জল আর ঝাড়ু নিয়ে।

সে সব দেখে শুনে একটি সদুপদেশ দিলে আমাকে।

"পাশের কামরাটাও একদম খালি আছে বাবু। আপনি সেখানেই চলে যান। এ আলকাতরা সাফ করা এখন মুশকিল। কেরোসিন তেল না হ'লে উঠবে না। আমি আপনার জিনিসপত্রগুলো একটু মুছে-টুছে দিচ্ছি।"

"ট্রেন কতক্ষণ থামবে এখানে ?"

"বহুতক্ষণ থামবে হুজুর। অনেক মাল আছে। তাছাড়া আর একটা ট্রেনের সঙ্গে ক্রসিং হবে এখানে। আধঘণ্টা দাঁড়াবে এখানে। ইনজিনও বদলি হবে।"

মেথরটাই একটা কুলি ডেকে এনে পাশের কামরায় সব ব্যবস্থা করে' দিলে আমার। বকশিশ দিলাম তাকে।

পাশের কামরায় যখন গুছিয়ে গিয়ে বসলাম তখন আমার স্মরণ-শক্তি দ্বিতীয় খেলাটি খেললেন।

অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

তখন আমি কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। হাওড়া স্টেশনে থার্ডক্লাস কামরায় বসে আছি। যদিও সেদিন ভিড় খুব, তবু ভাল জায়গাই পেয়েছিলাম ভাগ্যক্রমে। জানালার ধারে বসেছিলাম মুখ বাড়িয়ে।

"কিরে, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছিস নাকি ?"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম প্রশ্নকর্তা সাহেবী-পোশাক-পরা মুখে-পাইপ একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম। বাবার বন্ধু একজন। রেলের বড় অফিসার। প্রশ্ন করে আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।

"থার্ডক্লাসের টিকিট বুঝি তোর ? খুব ভিড় আজকে। ওহে রায়, শোন—"

একটি টিকিট কালেকটার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

"এই ট্রেনে তুমিই কি সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত যাচ্ছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এ আমার বাল্যবন্ধুর ছেলে। ভিড়ে কষ্ট পাচ্ছে, ওকে ফার্স্টক্লাসে বসিয়ে নিয়ে যাও।"

"যে আজ্ঞে। আসুন আপনি।"

আমি থার্ডক্লাস থেকে নেমে পিতৃবন্ধুকে প্রণাম করলাম, তারপর রায়মশায়ের অনুসরণ করে একটি ফার্স্টক্লাসে গিয়ে চড়লাম।

একেবারে ফাঁকা গাড়ি।

বাবার বন্ধু আবার এলেন আমার কাছে।

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে যা। রায় তোকে সাহেবগঞ্জে উঠিয়ে দেবে।"

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে আছি। ট্রেন ছাড়ে-ছাড়ে, প্রথম ঘণ্টা হয়ে গেছে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে কানুদা এসে হাজির। হাতে একটা হাঁড়ি।

"ও, তুই যাচ্ছিস এই ট্রেনে, যাক, বাঁচলাম। এই গুড়ের নাগরীটা মামাকে দিয়ে দিস তুই। খেতু আজ যাবে বলেছিল, তার হাতে দিয়েই এটা পাঠাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে দেখছি আসে নি, এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আজকালকার ছোকরারা।"

কানুদা কামরায় উঠে গুড়ের নাগরীটি বেঞ্চির নীচে ঢুকিয়ে রেখে দিলেন।

"কোণের দিকে ঠেসিয়ে রেখে দিলাম, খুব সাবধানে নিয়ে যাস—"

গার্ডের হুইসল বাজল, কানুদা লাফিয়ে নেবে গেলেন। আমি শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে এবং খানিকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল গভীর রাত্রে, এক মেমসাহেবের চীৎকারে। উঠে দেখি একটি স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার কামরার সামনে ভিড় জমে গেছে একটা। জিগ্যেস করলাম ব্যাপার কি। শুনলাম মেমসাহেব নাকি আমার কামরায় ঢোকবার জন্য দরজা খুলে একটি পা ঢুকিয়েছিলেন, কিন্তু সে পা-টি আর তুলতে পারেন নি। তাঁর জুতো কামরার মেজেতে একেবারে সেঁটে গিয়েছিল। তিনি পা-টি কোনোরকমে বার করে নিয়েছেন, কিন্তু জুতোটি উদ্ধার করতে পারেন নি। তাঁর চীৎকারে চেঁচামেচিতে স্টেশন মাস্টার, গার্ড, টিকিট কালেকটার সবাই এসে জুটে গেছেন। গাড়ির আলো জেলে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কানুদার সেই গুড়ের নাগরী কামরাময় গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়িয়েছে আর সমস্ত মেজেটা চট্‌চটে গুড়ে ভরতি হয়ে গেছে।

স্টেশন মাস্টার জিগ্যেস করলেন, "এ নাগরী কি আপনার?"

"না। আমি কিছু জানি না।"

স্টেশন মাস্টার তখন নিজেই হেঁট হয়ে মেমসাহেবের জুতোটিকে গুড়ের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। তারপর গদ্‌গদ বিনীত কণ্ঠে মেমসাহেবকে বললেন,

"আই অ্যাম রিয়েলি সরি, ম্যাডাম। এ গাড়িতে আপনার বসা চলবে না, পিছনের দিকে আর একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরা আছে, সেইখানে চলুন।"

সাহেব মেমসাহেবকে নিয়ে স্টেশন মাস্টার, গার্ড সবাই চলে গেলেন।

এসে সেই টিকিট কালেকটারটি আমার কাছে দাঁড়ালেন এসে।

তাঁকে আমি নিম্নকণ্ঠে জিগ্যেস করলাম, "আমি কি নেবে যাব?"

"না, না, নাববেন কেন, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। ওরাই কি টিকিট কিনে যাচ্ছে নাকি। ওরা প্ল্যানটার সাহেব, প্রায়ই যাতায়াত করে। এক নাগরী গুড় নষ্ট হ'ল, এইটেই যা দুঃখের। আপনার সঙ্গে যে গুড় ছিল তা তো জানতাম না—"

বললাম তাঁকে সব কথা।

"ও। তাই বুঝি। আচ্ছা আমি মেথর ডেকে গাড়িটাকে ধুইয়ে দিচ্ছি। তা না হ'লে আপনার অসুবিধে হবে—"

মেথর এসে কামরাটি পরিষ্কার করে' দিয়ে গেল। আমি নির্বিঘ্নে যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম।

উক্ত গল্পটি মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হ'তে লাগল সেই সহৃদয় টিকিট কালেকটারটি না থাকলে এ ভদ্রলোকের যে দুর্দশা হয়েছে, আমারও সেই দশা হ'ত। না হয় ভদ্রলোক ভুল করে' ফার্স্ট ক্লাসে চড়েই পড়েছেন, তা ব'লে হাজতে যেতে হবে তাঁকে! তাঁর অসহায় মুখচ্ছবিটা চোখের উপর ভাসতে লাগল। খচখচ করতে লাগল মনটা। পকেটে সদ্য-প্রাপ্ত ফি দু'শ টাকা ছিল। ভাবলাম আমিই না হয় দিয়ে দি ভদ্রলোকের ভাড়াটা। কতদিকে কতই তো বাজে খরচ হয়—আমার স্মৃতিশক্তি অতীতের সেই ঘটনাটিকে বেশ উজ্জ্বল করে' ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন আমার মানসপটে।

নেবে পড়লাম।

স্টেশন মাস্টারের কামরার কাছে এসে শুনতে পেলাম সেই টিকিট কালেকটার ভদ্রলোক তারস্বরে বলছেন, "মাপ করবেন মশাই, আমি ছাড়তে পারব না। চাকরি করি, চাকরির আইন মেনে আমাকে চলতেই হবে। হয় ভাড়া দিয়ে দিন, না হয় লক্-আপে থাকুন।"

"শুনুন—"

হাতছানি দিয়ে ডাকলাম আমি ভদ্রলোককে।

"কি বলছেন?"

www.boiRboi.blogspot.com

"ছেড়ে দিন ভদ্রলোককে।"

"মাপ করবেন, তা আমি পারব না।"

"আমি ওঁর ভাড়াটা দিয়ে দিচ্ছি।"

"আপনি দেবেন কেন, ওরকম লোককে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।"

এমন সময় স্টেশন মাস্টার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

"আবার কি হ'ল? ঝামেলা মিটিয়ে ফেল না বাপু তাড়াতাড়ি।"

"এই ভদ্রলোক ওঁর হ'য়ে ভাড়াটা দিয়ে দিতে চাইছেন।"

"কে—"

আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়েই কিন্তু স্টেশন মাস্টারের মুখের চেহারা বদলে গেল। তাঁর স্মরণ-শক্তি কৃপা করলেন তাঁকে। উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এসে তিনি আমার পায়ের ধুলো নিলেন।

"ডাক্তারবাবু যে, আপনি কোথা থেকে—"

"একটা রোগী দেখে ফিরছি। এই লোকটিকে ছেড়ে দিন, এঁর ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি—"

"আরে ভাড়া দিতে যাবেন কেন? আপনি ছেড়ে দিতে বলছেন, তাই যথেষ্ট—"

মাস্টার মশাই যখন আমাদের স্টেশনে ছিলেন তখন তাঁর ছেলের টাইফয়েডের চিকিৎসা করেছিলাম আমি।

"শনটু কেমন আছে আজকাল?"

"হ্যাঁ মোটা হয়েছে। এখন দেখলে চিনতেই পারবেন না।"

অঙ্কুর ও বৃক্ষ

ভদ্রলোক সত্যিই বিপন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন। আমিও বেশ বিপন্ন হ'য়ে পড়লাম। কম টাকা নয়, প্রায় দু'হাজার টাকা। আমার কথায় অত টাকা সে কি ছেড়ে দিতে রাজি হবে? আমাকে অবশ্য সে খুবই খাতির করে। কিন্তু খাতির করে বলেই কি অসঙ্গত অনুরোধ করা যায়? ভদ্রলোক কিন্তু না-ছোড়। হাত জোড় করে বলতে লাগলেন—"দয়া করুন ডাক্তারবাবু, বিশ্বাস করুন, তিন দিন না খেয়ে আছি।" চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল তাঁর। নিরুপায় হয়ে শেষে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে তাঁর উত্তমর্ণকে অনুরোধ করব যাতে তিনি সুদের টাকাটা

www.boiRboi.blogspot.com

ছেড়ে দেন। তাঁকে বুঝিয়ে বলব যে বসতবাটী বিক্রি করেও সব টাকা দিতে পারবেন না ভদ্রলোক। যতটা দিচ্ছেন ততটা নিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সিভিল জেল দিয়ে আর লাভ কি? ক্ষতিই বরং। আমার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ভদ্রলোক চোখ মুছতে মুছতে উঠে গেলেন। অনাহারক্লিষ্ট চেহারা। পরনে ছিন্ন মলিন বসন। দেখে সত্যিই দুঃখ হ'ল।

একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। অনেকদিন আগেকার ঘটনা, প্রায় বিশ বছরের। আমার এক বন্ধু হঠাৎ একদিন সকালে আমার বাসায় এসে উপস্থিত।

"অনেকদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই ভাবলাম নেবে পড়ি এখানে। পাটনায় যাচ্ছি একটা বিয়েতে। কাল বিয়ে, আজ রাত্রের ট্রেনে এখান থেকে রওনা হলেও ঠিক সময়ে পৌঁছান যায়। তারপর কেমন আছিস?—"

অনেকদিন পরে রতনকে দেখে খুব খুশী হলাম। রতনকে সত্যিই ভালবাসতাম, অন্য কোনও কারণে নয়, তার নিরহঙ্কার সরলতার জন্য। লক্ষপতির একমাত্র ছেলে সে, লেখাপড়াতেও খুব ভালো, কিন্তু তার পোশাক-পরিচ্ছদে বা কথা-বার্তায় কখনও কোনো রকম চালিয়াতি লক্ষ্য করি নি। সদা-হাস্যময় আত্মভোলা লোক। অনেকদিন পরে দেখা হ'ল, দেখলাম একটুও বদলায় নি। তখন আমি সবে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছি, রোগীর ঝামেলা বিশেষ ছিল না, সমস্ত দিন খুব আড্ডা দেওয়া গেল তার সঙ্গে।

হঠাৎ রতন বলে উঠল—"ওহো, একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে! ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্যাক্সি করে' এসে ট্রেন ধরেছি, শাড়িখানা কিনে আনা হয় নি! এখানে ভালো কাপড়ের দোকান আছে?"

আমি ব্যাপারটা ধরতে পারি নি প্রথমে।

"কিসের শাড়ি?"

"বাঃ, বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি, শুধু হাতে কি যাওয়া যায়? একটা ভালো বেনারসী শাড়ি নিয়ে যাব ভেবেছি। এখানে দোকান আছে?"

"আছে। বেশ বড় বাঙালীর দোকান আছে একটা।"

"চল তাহলে সেখানে। একটা শাড়ি কিনে ফেলা যাক—"

আমার পরিচিত জগৎবাবুর জগজ্জ্যোতি ভাণ্ডারে রতনকে নিয়ে গেলাম। জগৎবাবু নিজের মৃতা পত্নী জ্যোতির্ময়ী দেবীর নামের প্রথমার্ধের সঙ্গে নিজের

নামের ব্যঞ্জন সন্ধি করে' দোকানটির নামকরণ করেছিলেন। দোকানটির তখন খুব চলতি।

আমরা যখন দোকানে গেলাম তখন বেলা আড়াইটে হবে। জগৎবাবু নিজেই দোকানে ছিলেন, কর্মচারী কেউ ছিল না। তারা খেতে গিয়েছিল বোধ হয়। জগৎবাবু একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ঢুলছিলেন। আমরা দোকানে ঢুকতেই তাঁর কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেল, মনে হ'ল একটু যেন অপ্রসন্ন হলেন। তাঁর ঈষৎ কুঞ্চিত ভ্রূযুগল দেখে তাই-ই অনুমান করলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তাই মুখে একটা ভদ্রতার হাসি টেনে আনলেন।

"ডাক্তারবাবু যে, আসুন! দুপুর রোদে বেরিয়েছেন যে!—"

"আমার এই বন্ধুটির কাপড় কেনার দরকার। বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে, একটা বেনারসী শাড়ি নিয়ে যেতে চায়। দিন একখানা—"

জগৎবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর দোকানের শেল্‌ফগুলোর দিকে চেয়ে বললেন—"শাড়ি? বেনারসী? আছে বোধ হয় নাগালের মধ্যে। দেখি—"

তাকিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উঠতে গিয়ে কাছাটা খুলে' গেল। সেটা গুঁজে কসিটা ঠিক করে' নিয়ে এগিয়ে গেলেন একটা শেল্‌ফের দিকে। সেখান থেকে একটা কাপড়ের বস্তা নামালেন ধপাস্ করে। তারপর তার পাশে উবু হ'য়ে বসে' বস্তাটি খুলে বা'র করলেন একখানা শাড়ি।

"নিন্ দেখুন—"

রতনের কিন্তু পছন্দ হ'ল না।

"আর একটা দেখান—"

আর একটা দেখালেন তিনি। সেটাও কিন্তু রতনের পছন্দ হ'ল না। তৃতীয় শাড়িখানাও যখন রতনের পছন্দ হ'ল না তখন জগৎবাবুর চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরেছে। গুম হ'য়ে নির্নিমেষে চেয়ে আছেন তিনি রতনের দিকে।

প্রশ্ন করলেন—"কি রকম শাড়ি চাই আপনার?—"

মিতভাষী রতন বললে—"ভালো শাড়ি। আছে কি আপনার?"

"আছে। আড়াই-শ' তিন-শ' টাকা দামের শাড়ি আছে—"

নির্বিকার কণ্ঠে রতন বললে—"বেশ, দেখান—"

"সত্যি সত্যি যদি নেন তাহ'লে দেখাই। তা না হ'লে শুধু শুধু সিঁড়িতে চড়ে' ওই ওপরের তাক থেকে নাবানোর কোনো মানে হয় না!—নেবেন কি?"

"থাক, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।"

মৃদু হেসে উঠে পড়ল রতন, দোকান থেকে বেরিয়ে এল। আমাকেও বেরিয়ে আসতে হ'ল।

"কিনবি না?"

"অন্য দোকানে চল। এখানে কিনব না। অভদ্র লোক।"

মনে পড়ল মথুরাদাসের কথা। মথুরাদাস আমার রোগী। ছোট একটি কাপড়ের দোকান করেছে সম্প্রতি। তার দোকানেই গেলাম। আমাদের দেখেই মথুরাদাস শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল এবং এমনভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করল যেন আমাদের পথ চেয়েই তার দিন কাটছিল।

"একখানা ভালো বেনারসী শাড়ি চাই শেঠজী, আমার দোস্তের জন্য—"

"আইয়ে বৈঠিয়ে—"

সাগ্রহে আহ্বান করল আমাদের, তারপর শাড়ি বার করতে লাগল। এক, দুই, তিন, চার—আর ছিল না বেচারীর দোকানে। রতনের একটাও পছন্দ হ'ল না। শেঠজী কিন্তু দমলেন না তাতে।

হিন্দী ভাষায় বললেন, "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি আরও শাড়ি এনে দেখাচ্ছি। অন্য দোকান থেকে আনছি—"

দুপুরের রোদ তুচ্ছ করে' বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কিছুক্ষণ পরে ফিরল একগাদা শাড়ি নিয়ে, নানা দামের, নানা রঙের। একখানা শাড়ির জমি রতনের পছন্দ হ'ল, কিন্তু রংটা হ'ল না।

শেঠজী একটু অপ্রতিভ হ'য়ে প্রশ্ন করলেন, "বাবুজির কোন রং পছন্দ তাহলে?—"

"ফিকে সবুজ—"

"হুজ্‌রিমলের দোকানটা এখন বন্ধ আছে। সেখানে ফিকে সবুজ রঙের কাপড় আছে। কাল এনে রাখব বাবু, কিংবা বলেন তো ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো—"

"বাবু তো কাল পর্যন্ত থাকবেন না। আজ সন্ধ্যার ট্রেনে পাটনা যাচ্ছেন—"

"ও, আচ্ছা দেখি—"

বেরিয়ে এলাম আমরা দোকান থেকে।

রতন বললে— "পাটনাতেই পেয়ে যাব বোধ হয়।"

সন্ধ্যার সময় রতনকে স্টেশনে তুলে দিতে যাবার জন্য বেরুচ্ছি যাচ্ছি, এমন

www.banglabooks.blogspot.com

সময় মথুরাদাস মাড়োয়ারী এসে হাজির। হাতে ফিকে সবুজ রঙের তিনখানা শাড়ি। রতনের একখানা শাড়ি পছন্দ হ'ল। সাড়ে আট শ' টাকা দিয়ে কিনলে শাড়িখানা।

www.boiRboi.blogspot.com

পরে খবর নিয়ে জেনেছিলাম ওই শাড়িখানা বেচে একশ' টাকা লাভ করেছিল মথুরাদাস।

বিপন্ন ভদ্রলোকটিকে দেখে এই যে ঘটনাটা মনে পড়ল, এটাকে অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করবেন না। রীতিমত প্রাসঙ্গিক। কারণ ঐ বিপন্ন ভদ্রলোকটিই একদা-ধনী জগৎ চৌধুরী। জগজ্জ্যোতি ভাণ্ডার ঋণের বন্যায় বহুকাল আগেই ভেসে গেছে। আর যার কাছ থেকে টাকা ধার করে' তিনি এই বিপুল বন্যায় নিজের নাকটি কোনোক্রমে বার করে' রাখতে সক্ষম হয়েছেন তার নাম শেঠ মথুরাদাস,—যে একদিন রতনকে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি বেচেছিল আমার বাড়িতে এসে। তার এখন চারটে দোকান, দুটো মিল, ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ টাকা।

আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন।

আমার অনুরোধে মথুরাদাস জগৎবাবুকে ঋণমুক্ত করে' দিয়েছিল।

অন্তরালে

পুরাতন বন্ধু উমানাথ বাজপেয়ী কর্ম হইতে অবসর লইয়া কাশীবাস করিতে যাইতেছিল। দিল্লী এক্সপ্রেস ভাগলপুর পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেল। সামনের স্টেশনে একটি গাড়ি লাইনচ্যুত হইয়া পথ আটকাইয়াছিল। উমানাথ জানিত আমি ভাগলপুরে আছি। গাড়ি ছাড়িবার প্রচুর দেরি আছে দেখিয়া সে পুরাতন বন্ধুত্বটা ঝালাইয়া লইবার মতলবে নিজের জিনিসপত্র নামাইয়া একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে আরোহণ করিল এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাকে বাহির করিয়া ফেলিল। পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বলিলাম,—

"আজ আর তোমার যাওয়া হচ্ছে না। এসেছ যখন থেকেই যাও দু'একদিন—"

"আজকের দিনটা তো থাকতেই হবে মনে হচ্ছে, কাল যদি গাড়ি চলে তখন দেখা যাবে—"

সন্ধ্যার পর ছাতের উপর ক্যাম্প-চেয়ার বিছাইয়া উভয়ে বিশ্রম্ভালাপে রত হইলাম। পূর্বজীবনের নানা কথার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"তুমি তো এস. পি. হয়েই রিটায়ার করলে—"

"হ্যাঁ। ডি. আই. জি. হওয়া আর হ'ল না।"

"চাকরি জীবনটা কেমন লাগল?"

"রটন্। নরক বাস!..."

"পয়সা-কড়ি কেমন রোজগার হ'ল?"

"তা মন্দ হয় নি। গোটা দুই ছেলে আছে, তাদের উচ্ছন্ন যাবার পাথেয় রেখে যাব।"

"কেন, লেখাপড়া শেখেনি তারা?"

"ম্যাট্রিকের বেড়া পার হতে পারে নি।"

"আর ছেলে-পিলে নেই তোমার?"

"তিনটি মেয়ে আছে। তিনটিই বিধবা, তার মধ্যে একটি পাগল।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। বাজপেয়ী-ই হঠাৎ আবার বলিল,—

"বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে যাচ্ছি। ভরসা আছে তিনি ঠেলে ফেলে দেবেন না, দু'চারটে ভালো কাজও করেছি জীবনে।"

বলিলাম,—

"তোমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই খুব বিচিত্র। কোন সাহিত্যিক জানতে পারলে হয়তো আমাদের সাহিত্যেও শার্লক হোমস্, পইরো বা ফাদার ব্রাউন দেখা যেত—"

"তাতে সাহিত্যের কি হবে জানি না, আমার যে-ধরনের অভিজ্ঞতা তা' অত্যন্ত সাদা-মাটা, চাঁছা-ছোলা, পরিষ্কার ব্যাপার। কোনও বুদ্ধিমান ডিটেক্‌টিভের দরকার হয় না তার জন্যে। ডিটেক্‌টিভ দরকার হতে পারে কে কি ভাবে ঘুস খাচ্ছে তাই ধরবার জন্যে, চোর ডাকাত খুনী ধরবার জন্যে নয়। আমাদের দেশের ডিটেক্‌টিভরা, ইংরেজ আমলে অন্তত, দেশের সচ্চরিত্র ভদ্রলোকেদেরই ফাঁসাবার চেষ্টা করত খালি। টেরিরিস্ট মুভ্‌মেণ্টের কথা ভেবে দেখ। আমি নিজের স্বপক্ষে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, বিপ্লবী দু'একটি ছেলেকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি। সেইজন্যেই হয় তো বিশ্বেশ্বর আমাকে দয়া করতে পারেন—"

"বল না শুনি দু'একটা ঘটনা।"

ঠিক এই সময়ে ভিতর হইতে গৃহিণীর আহ্বান আসিল—

"খাবার দেওয়া হয়েছে, তোমরা খাবে এস।"

গল্পটা চাপা পড়িয়া গেল। সকালেই আমার কাজের ভিড়। গল্প শুনিবার অবসর নাই। বলিলাম,—

"তোমার গল্পটা আর শোনা হ'ল না। আজ থেকে যাও—"

"না ভাই, জিনিসপত্র সব পৌঁছে গেছে, স্টেশনেই পড়ে আছে হয়তো। গল্পটা লিখে পাঠিয়ে দেব, তবে যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছিলাম তাতে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই। তবে গল্পটা তোমার মন্দ লাগবে না বোধ হয়। বীভৎস গল্প, তবে তার অন্তরালে কিছু পাবে হয়তো।"

বাজপেয়ী সেইদিনই চলিয়া গেল। দিন দশ-বারো পরে সত্যই সে নিম্নলিখিত গল্পটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল।

আমি যখন শেরপুরায় বদলি হইয়া আসিলাম তখন আমাকে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। একেবারে নূতন জায়গা, পরিচিত লোক তেমন কেহ নাই যে কাজকর্মের পর দুই দণ্ড গল্প করিয়া কাটাই। তখনও আমি বিবাহ করি নাই, মন্ত্রও লই নাই। অবসর পাইলে তাস খেলিতাম। কিন্তু শেরপুরায় তখন কোনও ক্লাব ছিল না। সাধারণতঃ দারোগার সঙ্গীর অভাব হয় না, অনেকে বরং দারোগার সহিত ভাবই করিতে চায়। কিন্তু ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-জাতীয় লোক হয় তাহাদের সহিত অবসর-বিনোদন করিবার মতো প্রবৃত্তি আমার তখন ছিল না। আমি যথাসম্ভব ন্যায়-নিষ্ঠ ভাবেই কাজ করিবার চেষ্টা করিতাম এবং পারতপক্ষে এমন কোনও লোকের সহিত মিশিতাম না, যাহারা আমার নিষ্ঠাকে বিচলিত করিতে পারে। সুতরাং শেরপুরায় প্রথম কিছুদিন নিঃসঙ্গ জীবনই যাপন করিতে হইয়াছিল। হঠাৎ একদিন বিধাতা কৃপা করিলেন, বাল্যবন্ধু সুরনাথের সহিত বহুকাল পরে হঠাৎ পথে দেখা হইয়া গেল। সুরনাথ শুধু আমার বাল্যবন্ধুই নয়, আমার দূরসম্পর্কের ভগ্নীপতিও। বলা বাহুল্য হাতে স্বর্গ পাইলাম। শুনিলাম সুরনাথ শেরপুরা হইতে ক্রোশ দুই দূরে সস্তায় কিছু জমি কিনিয়াছে এবং সেই জমিতেই বসবাস করিতেছে। আমাকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। প্রতিশ্রুতি দিলাম—যাইব এবং সেইদিনই গেলাম। আমার ঘোড়া ছিল, বিশেষ কোনো অসুবিধা হইল না। বৈকালে গিয়াছিলাম, তখনও দিনের আলো ছিল। দেখিলাম সুরনাথ যে-স্থানে বসবাস করিয়াছে সে-স্থানটি লোকালয়ের একেবারে বাহিরে। একটু বিস্মিত হইলাম। বীরভূম জেলায় তাহার বাড়ি ছিল, কিছু জমিদারীও

www.banglabooks.blogspot.com

ছিল, সে এরকম নির্বান্ধব পুরীতে আসিয়া বসবাস করিতে গেল কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"মীনুও এখানে আছে তো?"

মীনু আমার দূরসম্পর্কীয়া সেই ভগ্নীর নাম।

"না, সে ভাই অনেকদিন আগে মারা গেছে। সেই জন্যেই তো দেশে আর ভালো লাগল না। এখানে পালিয়ে এসেছি—"

"দেশের বিষয়-সম্পত্তি?"

"সব বিক্রি করে দিয়ে এখানেই বিঘে পঞ্চাশেক জমি কিনেছি—"

"ছেলে-পিলে হয় নি?"

"না—"

"একেবারে একা থাক এখানে?"

"ঠিক একা নয়। ওই যে দূরে একটা বাড়ি দেখছ ওখানে আমার এক বন্ধু থাকে। সে-ও আমার সঙ্গেই জমি কিনেছিল। দু'জনে একসঙ্গে চাষবাস করি, বেশ আছি। ওরে ভজুয়া, চা নিয়ে আয়! চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে না কি?"

"না—"

"আর বিয়ে কর নি?"

"না। ওসবে আর রুচি নেই।"

ভজুয়া একটু পরে চা লইয়া আসিল। ভজুয়াকে দেখিয়া অস্বস্তি বোধ করিলাম। কুচকুচে কালো রং, খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কিছু গোঁফ-দাড়িও আছে, কিন্তু সুবিন্যস্ত নয়, খাপ্‌চা-খাপ্‌চা। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ভয়ঙ্কর। মনে হয় শ্বাপদের চক্ষু। ভজুয়া চা দিয়া চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"এ চাকর কোথায় পেলে? এখানকারই লোক?"

"না, বাইরের। মাসখানেক হ'ল এসেছে। কেন?"

"অতি বদ চেহারা।"

"তা বটে। মাইনে নেয় না, পেট-ভাতাতেই কাজ করে, তাই রেখেছি। চেহারা খারাপ বটে কিন্তু খুব কাজের, জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজ করতে পারে। চেহারাটা অবশ্য খুবই খারাপ।"

ভজুয়া-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। সুরনাথের বন্ধু কালীপ্রসাদ দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলেন। লোকটি একচক্ষু। আলাপ করিয়া মনে হইল বেশ আমোদপ্রিয়।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রকাশ পাইল তিনিও অবিবাহিত। আমারও তখন বিবাহ হয় নাই। হাসিয়া বলিলাম—

"চতুর্থ আর একজন অবিবাহিত লোক জুটলে আমরা ব্যাচিলার্স কার্ড-ক্লাব করতে পারতাম—"

কালীপ্রসাদ বলিলেন—

"আছেন একজন। আমাদের সঙ্গে তেমন আলাপ হয় নি এখনও। মাস দুই আগে তিনিও এখানে জমি কিনবেন ব'লে এসেছেন। সুরনাথ, মিস্টার বক্সীকে খবর পাঠাও না একটা, দারোগাবাবুর নাম শুনলে হয়তো চ'লে আসবেন। আমাদের সঙ্গে ভালো ক'রে আলাপটাও হয়ে যাবে, কার্ড-ক্লাবটারও গোড়া-পত্তন হবে—"

"বেশ, ভজুয়াকে পাঠাচ্ছি।"

একটা চিঠি লইয়া ভজুয়া সাইকেল চড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা গল্প করিতে লাগিলাম। গল্প কিন্তু জমিল না। কালীপ্রসাদবাবুর অদ্ভুত এক-চক্ষুটি গল্পের রসভঙ্গ করিতে লাগিল। শেষে না জিজ্ঞাসা করিয়া পারিলাম না।

"আপনার চোখটি গেল কি করে?"

"এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলাম।"

"বাঘিনী? শিকার করার শখ আছে নাকি?"

"ছিল এককালে।"

কালীপ্রসাদবাবুর চোখে অদ্ভুত একটা ভাব ক্ষণিকের জন্য ফুটিয়া উঠিল। দেখিলাম সুরনাথও তাহার দিকে চাহিয়া একটা অদ্ভুত হাসি হাসিতেছে। আমি বলিলাম—

"তাহলে তো আপনি গুণী লোক মশায়। বলুন, বলুন, শুনি আপনার শিকারকাহিনী—"

কালীপ্রসাদবাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন—

"সে অনেক লম্বা কাহিনী, আর একদিন শুনবেন। আজ আমার একটু কাজ আছে—"

কালীপ্রসাদবাবু উঠিয়া পড়িলেন। আমার মনে হইল গল্পের সুরটা যেন কাটিয়া গেল। কালীপ্রসাদবাবু চলিয়া যাইবার পর আর একটা ব্যাপারে একটু বিস্মিত হইলাম। বাড়ির ভিতরের দিক হইতে নারীকণ্ঠের একটা কলহাস্য ভাসিয়া আসিল। সুরনাথ সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে চাহিল অর্থাৎ বুঝিবার

www.boiRboi.blogspot.com

চেষ্টা করিল হাসিটা আমি শুনিয়াছি কি না, শুনিয়া থাকিলে কি ভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম—

"বাড়িতে কোনও মেয়েছেলে আছে না কি ?—"

"তা আছে বই কি! চাকরানী আছে, চাকরদের বউ আছে। কেন, তুমি অন্য কিছু ভাবছ না কি ?"

"না, না!—"

সুরনাথের চোখে-মুখে কেমন একটা হিংস্রভাব যেন ক্ষণিকের জন্য মূর্ত হইয়া মিলাইয়া গেল। সুরনাথ আমার বাল্যবন্ধু, তাহার সহিত আত্মীয়তাও আছে, কিন্তু সহসা অনুভব করিলাম তাহাকে আমি চিনি না। যাহাকে আমি চিনিতাম, সে অন্য লোক।

ভজুয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল বক্‌সীবাবুর মাথা ধরিয়াছে বলিয়া আসিতে পারিলেন না।

আমিও উঠিয়া পড়িলাম। আমার ঘোড়া ছিল। ঘোড়ায় উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় ভজুয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—

"হুজুর, আমি লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে আপনাকে মাঠটুকু পার করে' দিয়ে আসি—"

"কেন ?—"

"এ-মাঠে বড় বড় গোখরো সাপ আছে হুজুর। সেদিন একটা ঘোড়াকেই কামড়েছিল।"

সুরনাথও সে-কথার সমর্থন করিল। বলিলাম—

"তবে চল—"

আমি অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলাম। ভজুয়া লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া আমার আগে আগে চলিতে লাগিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তোমার দেশ কোথা ?"

"আজ্ঞে মানভূম, হুজুর। পুরুলে থেকে কোশ পাঁচেক হবে।"

"দেশ ছেড়ে এখানে এলে কেন ?"

"কলেরায় সব মরে গেল যে হুজুর। তাই যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে এলাম—"

ভজুয়াকে বেশী দূর যাইতে হইল না। কারণ আমার হাবিলদার সাহেব সাইকেলে চড়িয়া আমার খোঁজে আসিতেছিলেন। থানায় একটা দাঙ্গার

সংবাদ আসিয়াছিল। হাবিলদার সাহেব দেখিলাম ভজুয়াকে চেনেন। বলিলেন—

"কে, ভজু না কি! আজ শহরে যাও নি?—"

"না।"

ভজুয়া চলিয়া গেলে হাবিলদার সাহেব বলিলেন, ভজু প্রত্যহ গাঁজা কিনিবার জন্য আবগারির দোকানে যায়। বলিয়া একটু হাসিলেন।

"তাই নাকি! আপনি জানলেন কি ক'রে?"

"আমিও ভাং কিনতে যাই যে। রোজই দেখা হয়।"

"ও—"

হাবিলদার সাহেব আর একটা কথাও বলিলেন।

"ভজু খুব গুণী লোক, হুজুর। অনেক রকম গাছ-গাছড়া চেনে, অনেক ভালো ওষুধও দিতে পারে। শুনলাম সুরনাথবাবু ওঁকে নিজের চিকিৎসার জন্যেই রেখেছেন।"

"সুরনাথবাবুর অসুখ আছে না কি কোনও? দেখে তো কিছু মনে হ'ল না।"

হাবিলদার সাহেব কয়েক সেকেণ্ড চুপ করিয়া থাকিয়া একটু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—

"শুনেছি পুরোনো গনোরিয়া। এখানকার অনেক ডাক্তার কবিরাজ হাকিম ওঁর চিকিৎসা করেছেন, কিছু হয় নি। এখন ভজু ওঁকে ওষুধ দিচ্ছে—"

আমি এ-সব খবর শুনিয়া শুধু বিস্মিত নয়, একটু বিচলিতও হইলাম।

"আপনি এত-সব খবর জানলেন কি ক'রে?"

"আমি তো এখানে অনেকদিন আছি হুজুর। অনেকের অনেক খবর জানি। সুরনাথবাবুর সব্‌জি বাগানের মালীই আমাকে বলেছিল একদিন। সুরনাথবাবু আপনার কেউ হয় না কি—"

এ-সব খবর শোনার পর তাহার সহিত আত্মীয়তা আছে এ-কথা আর বলিতে পারিলাম না। বলিলাম—

"ছেলেবেলায় এক সঙ্গে এক স্কুলে পড়তাম, সেদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল, তাই এসেছিলাম—"

হাবিলদার বলিলেন—

"ওঁর ভারি বদনাম এখানে। ওঁর কানা দোস্তটিও ভালো নয়।"

www.boiRboi.blogspot.com

উপরোক্ত ঘটনার পর আমি আর সুরনাথের কাছে যাই নাই, যাইবার উৎসাহ পাই নাই। একদিন কিন্তু যাইতে হইল। গভীর রাত্রে সুরনাথের একটি চাকর, ভজুয়া নয়, অন্য চাকর, আসিয়া আমাকে যে-সংবাদটি দিল তাহা ভয়ানক। বলিল, সুরনাথকে এক প্রকাণ্ড গোক্ষুর দংশন করিয়াছে। সুরনাথ অবিলম্বে আমাকে একজন ডাক্তার লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—

"সাপে কামড়েছে? সাপটাকে দেখেছিস?"

"সবাই দেখেছে হুজুর, প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ! বাবুর ঠোঁট মুখ সব নীল হয়ে গেছে। অতি কষ্টে কথা বলতে পারছেন, অতি কষ্টে আপনার কথা বললেন—"

ডাক্তার মৈত্রকে লইয়া যতশীঘ্র সম্ভব অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখিলাম সুরনাথ মারা গিয়াছে। তাহার মুখটা নীল, মনে হইতেছে কেহ যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে। পায়ের গোছে দুই তিন স্থানে দড়ি বাঁধা রহিয়াছে, শুনিলাম পায়ের পাতায় সাপটা কামড়াইয়াছিল। ক্ষতস্থানের উপর ভজুয়া কি একটা জংলি-গাছের পাতা বাটিয়া লাগাইয়া দিয়াছে। ডাক্তার মৈত্র পাতা-বাটাটা জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া ক্ষত-চিহ্নটি দেখিলেন। দুইটি কালো কালো বিন্দু পাশাপাশি দেখা গেল। দুইটি বিন্দুর মধ্যে প্রায় আধ ইঞ্চি ব্যবধান। ডাক্তার মৈত্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া টর্চ ফেলিয়া বিন্দু দুইটিকে বারবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন—

"খুব বড় সাপ মনে হচ্ছে। সাপটা কত বড় ছিল—?"

"প্রকাণ্ড সাপ হুজুর। পাঁচ ছ'হাত হবে—"

ভজুয়া বলিল, "আরও বড়।"

আমি ডাক্তার মৈত্রকে প্রশ্ন করিলাম—

"বড় সাপ বুঝলেন কি করে'?"

"দুটো দাঁতের মাঝখানে কত বড় ফাঁক দেখছেন না? আমি এত বড় ফাঁক আগে দেখি নি।"

ভজুয়া বলিল, "অত বড় সাপও, আজ্ঞা, আমরা দেখিনি কখনও। কি বল যদু?"

যদু নামক মালীটি সে-কথা স্বীকার করিল। আরও অনেকে সাপটি দেখিয়াছিল। সকলেই সমস্বরে বলিল সাপটি সত্যই প্রকাণ্ড বড়। ঘরের মধ্যে

এবং বারান্দায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন লোক সমবেত হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—

"এতগুলো লোক সবই কি সুরনাথের চাকর?"

কে একজন উত্তর দিল—

"কালীপ্রসাদবাবুর চাকরদেরও ভজুয়া ডেকে এনেছে।"

"কালীপ্রসাদবাবু কোথা?"

"তিনি আসেন নি তো দেখছি। ঘুমুচ্ছেন বোধ হয়।"

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক বোধ হইল।

"ভজুয়া কালীপ্রসাদবাবুকে খবর দেয় নি? ভজুয়া কোথা গেল?—"

ভজুয়ার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ভিড়ের ভিতর হইতে একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—

"বাবুকে কি ডেকে আনব?"

"তুমি কে?"

"আমি তাঁর চাকর। তিনি ন'টার পর ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েন। ঘুম এসে গেল, ভজুয়া তাঁর ঘুম ভাঙাতে মানা করে' দিয়েছে, তাই তাঁকে আমরা কেউ ওঠাই নি—"

"ভজুয়া মানা করেছে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এঁরা দু'জনই তো ভজুয়ার তৈরী কি ওষুধ রোজ খান। আমি ডেকে আনছি তাঁকে—"

লোকটি চলিয়া গেল। আমি যদু নামক মালীটির নিকট হইতে সন্ধ্যা হইতে কি কি ঘটিয়াছিল, কে কে আসিয়াছিল খবর লইতেছিলাম, এমন সময় সেই লোকটি, যে কালীপ্রসাদবাবুকে ডাকিতে গিয়াছিল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে কালীপ্রসাদবাবুকে কে খুন করিয়া গিয়াছে।

আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া যাহা দেখিলাম তাহা ভয়াবহ। দেখিলাম—কালীপ্রসাদবাবুর দ্বিতীয় চক্ষুটি কে উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। সমস্ত বালিশ রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। আর একটা চমকপ্রদ ঘটনাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল। কালীপ্রসাদবাবুর ঘরের পাশেই আর একটা ছোট ঘর ছিল। সেই ঘরের ভিতর হইতে একটা খড় খড় শব্দ শোনা গেল। দুই ঘরের ভিতর ছোট একটা বন্ধ কপাট ছিল। কপাটটা খুলিতে তাহার ভিতর হইতে প্রকাণ্ড একটা নেউল বাহির হইয়া আসিল এবং নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলেই

www.boiRboi.blogspot.com

দেখিতে পাইল নেউলটার পায়ে এবং মুখে রক্ত মাখা। সে যেদিক দিয়া চলিয়া গেল লণ্ঠন লইয়া দেখিলাম রক্তাক্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। বলিলাম—

"ভজুয়াকে ডাক।"

ভজুয়ার কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সে অন্তর্ধান করিয়াছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাহাকে আর পাওয়া গেল না। একজন বলিল—

"সে হয়তো বক্সীবাবুকে খবর দিতে গেছে—"

"দেখ তো!—"

আমি এবং ডাক্তারবাবু বাড়িটির চারিদিক লণ্ঠন এবং টর্চ লইয়া যতটা পারিলাম দেখিলাম। অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। যে লোকটি বক্সীবাবুর বাড়ি গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল বক্সীবাবুর বাড়িতে ভজুয়া তো নাই-ই, বক্সীবাবু-ও নাই।

তখন ডাক্তারবাবুকে বলিলাম—

"ব্যাপার ক্রমশ ঘোরতর হয়ে আসছে ডাক্তার মৈত্র। আমি তো সঙ্গে কোনও পুলিস আনি নি। আপনি বাইক করে' থানায় চলে যান, হাবিলদার সাহেবকে জনকয়েক কনেস্টবল নিয়ে এখুনি চলে' আসতে বলুন। তারা যেন বন্দুকও আনে।"

ডাক্তার মৈত্র বলিলেন—

"আমি যাচ্ছি, লাস দু'টোকে পোস্টমর্টেম করতে হবে। আমার বিশ্বাস এর ভিতর অনেক রহস্য আছে।"

পুলিস এবং বন্দুকের নাম শুনিয়া অনেকেই সরিয়া পড়িল। আমি, সুরনাথের মালী যদু এবং আরও গোটা দুই লোক হাবিলদার সাহেবের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। এ-রকম অভিজ্ঞতা আমার আর কখনও হয় নাই। ফাঁকা মাঠের মাঝে অসংখ্য ঝিল্লী ডাকিতেছে, আকাশে নক্ষত্রের ঝাঁক, কাছে দূরে বড় বড় গাছ। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম কে ইহাদের খুন করিল এবং কেন করিল। সুরনাথের মৃত্যু যে সর্পাঘাতে হয় নাই এবং কালীপ্রসাদের চক্ষুও যে নেউলে উপড়াইয়া লয় নাই এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সাপটাকে অনেকে দেখিয়াছে, নেউলটাকেও আমরা দেখিলাম, নেউলটার মুখে এবং পায়ে রক্তও ছিল। ডাক্তার মৈত্র বলিতেছেন সুরনাথের পায়ের ক্ষত-চিহ্নটি সন্দেহজনক, ক্ষত-বিন্দু দুইটির মধ্যে ফাঁক অনেক বেশী, কিন্তু সাপ যদি প্রকাণ্ড হয়, তাহা

হইলে……আমার চিন্তা-ধারা সহসা ব্যাহত হইল। একটা নারীকণ্ঠের কলহাস্যে চমকাইয়া উঠিলাম। মনে পড়িল প্রথম দিনও ওই হাসি শুনিয়াছিলাম। যদুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"হাসছে কে?"

"ছুক্‌রি বোধ হয়।"

"ছুক্‌রি কে?"

যদু একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর উত্তর দিল—

"ওকে বাবু কিছুদিন আগে রেখেছিল।"

"কোথা সে?"

"ভিতরে আছে বোধ হয়।"

"ডেকে নিয়ে এস তো।"

যদু ভিতরে চলিয়া গেল, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

"কই, ভিতরে দেখছি না, বাইরে কোথাও আছে বোধ হয়।"

"ডাক তাকে।"

"বাইরে বড় অন্ধকার বাবু। আমার ভয় করছে বেরুতে।"

যদুর দোষ ছিল না, আমার নিজেরই গা ছমছম করিতেছিল। যে লণ্ঠনটা জ্বলিতেছিল সেটারও শিখা ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। নাড়িয়া দেখিলাম তেল নাই। শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম।

"আর তেল আছে?"

"তেল আর নেই। তবে পেট্রোম্যাক্‌স আছে একটা। তাতে তেল থাকতে পারে। পিছন দিকের ঘরে আছে পেট্রোম্যাক্‌সটা—"

"পেট্রোম্যাক্‌সটাই জ্বাল। স্পিরিট আছে তো?"

"দেখি—"

যদু লণ্ঠনটা লইয়া ভিতরে গেল এবং একটু পরেই আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"সাপ, সাপ—"

ছুটিয়া গেলাম, দেখিলাম পিছনের ঘরে সত্যই একটা বিরাট গোক্ষুর ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যদু বলিল—

"সাপটা ওই ঝুড়ির মধ্যে ছিল। এ-রকম ঝুড়ি এখানে আগে দেখি নি। তাই মনে হ'ল এটা কোথা থেকে এল। যেই তুলে দেখতে গেছি—আর অমনি বাপরে বাপ! উঃ, খুব বেঁচে গেছি—"

যদু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। আমি দেখিলাম ঝুড়িটা সাপুড়েদের ঝুড়ি। সাপটা ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার কাছে লোডেড্ রিভলভারটা ছিল, সাপটা পলাইতে পারিল না। এক গুলিতেই ভূশায়ী হইল। গুলিটা মাথায় লাগে নাই, ঘাড়ের কাছে লাগিয়াছিল। আবার সেই হাসিটা শুনিতে পাইলাম। এবার অনেক দূরে। কি যে করিব মাথায় আসিল না। হাবিলদার সাহেব ও কনেস্টবলরা না আসা পর্যন্ত কিছুই করিবার উপায় ছিল না। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে তাহারা আসিল। তাহারা আসিবার পর চারিদিকটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। কিন্তু ভজুয়া বা ছুকরির সন্ধান পাইলাম না। বক্সীবাবুও অন্তর্ধান করিয়াছিলেন।

পাঁচ-ছয়জন পুলিসকে পাহারায় রাখিয়া আমি অবশেষে ফিরিয়া গেলাম। পরদিন বোঝা গেল পুলিসরা অবশ্য জাগিয়া পাহারা দেয় নাই, কারণ সকালে পোস্টমর্টেম (শব-ব্যবচ্ছেদ) করিবার জন্য ডোমেরা যখন লাস লইতে আসিল, তখন দেখা গেল সুরনাথেরও চক্ষু দুইটি নাই, কেবল দুইটি রক্তাক্ত গহ্বর রহিয়াছে। শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উভয়েরই পেট হইতে প্রচুর আফিং পাওয়া গেল। সিভিল সার্জন বলিলেন আফিংই উভয়ের মৃত্যুর কারণ। সাপটার শবও ব্যবচ্ছেদিত হইয়াছিল, এটা অবশ্য ডাক্তার মৈত্র আলাদা করিয়াছিলেন। দেখা গেল সাপটার বিষদাঁত নাই, দুই একদিন পূর্বেই তাহা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল না যে বক্সীবাবু, ভজুয়া এবং ছুকরিই এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট। কয়েকটি পায়ের এবং হাতের ছাপ সংগ্রহ করিয়া আমরা 'হুলিয়া' করিয়া দিলাম, পুরস্কারও ঘোষণা করিলাম, কিন্তু তাহাদের আর নাগাল পাইলাম না। কেন যে তাহারা উভয়কে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই, কারণ সুরনাথ এবং কালীপ্রসাদের একটি জিনিসও চুরি যায় নাই।

বুঝিতে পারিলাম মাসখানেক পরে। একটি পত্র আসিয়া রহস্যোদ্ঘাটন করিল। পত্রটি এই—

দারোগাবাবু,

ইতিপূর্বে বহুবার আপনাদের ফাঁকি দিয়াছি, এবারও দিলাম। এ পত্র আপনাদের লিখিতাম না, কিন্তু পাছে আপনারা কতকগুলি নির্দোষ লোককে ধরিয়া সাজা দেন, তাই সত্য ঘটনাটা প্রকাশ করিতেছি। যাহাদের আমরা খুন

করিয়াছি তাহারা উভয়েই চরিত্রহীন দুর্বৃত্ত ছিল। অকথ্য অসংযমের ফলে উভয়েরই সিফিলিস, গনোরিয়া তো হইয়াছিলই, উভয়ে অসমর্থও হইয়া পড়িয়াছিল। দৈহিক অপটুতা কিন্তু তাহাদের মানসিক কামনাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। স্ত্রী-সম্ভোগ করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না, কিন্তু বাসনা লোপ পায় নাই। এ নষ্ট ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার জন্য বহুপ্রকার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। অবশেষে তাহারা এক ভয়াবহ কাণ্ড করিয়া বসিল। জানি না কাহার নিকট হইতে তাহারা শুনিয়াছিল যে, কোনও জীবন্ত কুমারীর চক্ষু উপড়াইয়া যদি তাহা কাঁচা গিলিয়া খাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের যৌবন ফিরিয়া আসিবে। এই বিশ্বাসে একদিন রাস্তা হইতে একটি ছোট মেয়েকে তাহারা ভুলাইয়া লইয়া যায়। মেয়েটি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু বিধাতার এমনই চক্র যখন তাহারা একটি নির্জন পোড়ো বাড়িতে মেয়েটির চক্ষু উৎপাটন করিতেছিল, তখন মেয়েটির মাসি সেখানে আসিয়া পড়ে। মেয়েটির মাসি চুড়ি ফেরি করিত। চুড়ি ফেরি করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ওই পোড়ো বাড়ির ভিতরের দিকের বারান্দায় একটু হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে আসিত। সেদিন আসিয়া সে দেখিল, ভিতরের দিকে একটা ঘরে বসিয়া দুইটা লোক মদ খাইতেছে, তাহাদের হাতে কাপড়ে রক্তের দাগ। তখনও সে বুঝিতে পারে নাই যে তাহার বোনের মেয়েকেই তাহারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। সে নিঃশব্দে ঢুকিয়াছিল এবং উঠানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছিল। হঠাৎ লোক দুইটা তাহাকে দেখিতে পাইল এবং জানালা টপকাইয়া পলায়ন করিল। তখন মেয়েটি কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহা মর্মান্তিক। তাহার বোনঝি মুনিয়ার রক্তাক্ত চক্ষুহীন মৃতদেহটা পাশের ঘরেই পড়িয়া ছিল। সে চীৎকার করিল না। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সে ভাবিল চীৎকার করিয়া লোক জড় করিলে সে নিজেই হয়তো খুনের দায়ে জড়াইয়া পড়িবে। সে পুলিসেও গেল না। আমার সহিত তাহার এবং তাহার বোনের যোগাযোগ আছে পুলিসের এ সন্দেহ ছিল, তাই তাহারা পুলিসকে এড়াইয়া চলিত। সে সোজা আমার নিকটে আসিয়া সমস্ত ঘটনা বলিল। আমার সহিত তাহাদের সম্পর্কের কথাটা খুলিয়া না বলিলে আপনার মনে হয়তো নানারূপ সন্দেহ হইতে পারে, তাই কথাটা খুলিয়াই বলিতেছি। আমি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী দলের একজন। যে সব পুলিস অফিসার আমাদের জ্বালাতন করিত, কিংবা আমাদের

দলের যে সব লোক অ্যাপ্রুভার হইয়া আমাদের ধরাইয়া দিত, তাহাদের হত্যা করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। প্রফুল্ল চাকীকে যে সাব-ইনস্পেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জী পুলিসে ধরাইয়া দেয়, সেই নন্দলাল ব্যানার্জীকে আমিই হত্যা করি। এ সব কাজ করিবার জন্য আমাদের অনেক রকম লোকের সহিত যোগাযোগ রাখিতে হইত। এই চুড়িওয়ালী ভগ্নী দুইটি আমাকে অনেক খবর আনিয়া দিত। তাহারা আমাকে গুরুর মতো ভক্তি করিত, আমিও তাহাদের স্নেহ করিতাম। আমি গিয়া সেই হতভাগিনী বালিকার মৃতদেহটি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, তাহার মা-ও আমার সঙ্গে গিয়াছিল। আমরাও অনেক খুন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ বীভৎস ব্যাপার আমাদেরও জীবনে ঘটে নাই। কন্যার এই শোচনীয় মৃত্যুতে তাহার মা কিন্তু এক বিন্দু চোখের জল ফেলে নাই। তাহার দৃষ্টি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়াছিল। এই দুই ভগ্নী 'জিপ্‌সি' জাতের মেয়ে, ইহাদের নীতিজ্ঞান খুব বিশুদ্ধ নয়, তাছাড়া ইহারা ভয়ানক প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহারা আমাকে বলিল ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে, আমি যেন তাহাদের সাহায্য করি।

সেইদিন হইতে ঐ দুইটি নর-রূপী পিশাচের আমি পিছু লইয়াছি। উহাদের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। উহাদের একদিনও চোখের আড়াল করি নাই। উহারা যখন শেরপুরে জমি কিনিয়া বসবাস আরম্ভ করিল, তখন আমিও উহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলাম এবং প্রচার করিলাম যে আমিও জমি কিনিয়া তাহাদের প্রতিবেশী হইব। কিছুদিন আলাপ করিয়া বুঝিলাম উহাদের কাম-প্রবৃত্তি এখনও প্রশমিত হয় নাই। যুবতী নারী দেখিলে এখনও উহারা লোলুপ হইয়া ওঠে এবং ছলে বলে কৌশলে তাহাকে নিজেদের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করে। আমি উহাদের এই কামপ্রবৃত্তির সুযোগ লইলাম। যাহার কন্যাকে উহারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল, সে গিয়া উহাদের সহিত বসবাস করিতে রাজী হইল। জিপ্‌সি মেয়েদের মোহিনী শক্তি উহার ছিল, সুতরাং বেশী বেগ পাইতে হইল না। একদিন চুড়ি বিক্রয় করিবার ছলে সে কালীপ্রসাদবাবুর বাসায় গেল এবং আর ফিরিল না। সেখানেই রক্ষিতারূপে থাকিয়া গেল। ইহার দিন দশেক পরে একদিন দেখিলাম কালীপ্রসাদবাবু বাম চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন তিনি একটা জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন, হঠাৎ একটা বাঘিনীর দেখা পান, বাঘিনীটা চোখে একটা থাবা মারিয়াছে। আমি মনে মনে হাসিলাম, বুঝিলাম

বাঘিনীটি কে। আলিঙ্গনাবদ্ধ ছুক্‌রিরই নখরাঘাতে তাহার চক্ষুটি নষ্ট হইয়াছিল। আমি ছুক্‌রিকে সাবধান করিয়া দিলাম, প্রকাশ্যভাবে সে যেন আর কিছু না করে। কিন্তু ওই লোক দুইটা এমন কামান্ধ ছিল যে ওই ঘটনার পরও তাহারা ছুক্‌রিকে বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেয় নাই। ছুক্‌রির মুখ হইতেই আমি খবর পাই যে, উহারা উভয়েই পুরুষত্বহীন। তখনও আমি ঠিক করিতে পারি নাই, কি উপায়ে উহাদের হত্যা করিব। এমন সময় হঠাৎ এক পুরাতন বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া গেল। কিছুদিন আমি সাপুড়ের ছদ্মবেশে সাপুড়েদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ভজুয়া নামক যে লোকটিকে আপনারা দেখিয়াছিলেন সে আমার পূর্বপরিচিত একজন সাপুড়ে। তাহাকে পূর্বে আমি কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলাম। আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিয়া সে পুলকিত হইল, আমার বাসাতেই আসিয়া আড্ডা গাড়িল এবং নিজের নানা দুঃখের বর্ণনা করিয়া অবশেষে কিছু অর্থ ভিক্ষা করিল। দেখিলাম তাহার নিকট একটি প্রকাণ্ড গোক্ষুর এবং একটি প্রকাণ্ড নেউল রহিয়াছে। নেউল ও সাপের খেলা দেখাইয়া সে অর্থোপার্জন করে। সাপটা দেখিয়া আমি ভয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু সে বলিল সাপের বিষদাঁত নাই, কয়েকদিন অন্তর অন্তর সে বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়। ভজুয়াকে কাজে লাগাইব স্থির করিলাম। সাপ ও নেউল দুইটি ঝুড়িতে আমার পিছন দিকের একটি ঘরে বন্দী রহিল। ভজুয়াকে তখন সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিলাম। কেবল অর্থের লোভে নহে, এই বীভৎস কাহিনী শুনিয়া ওই পিশাচ দুইটিকে শাস্তি দিবার আগ্রহেও সে আমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। আমি তখন প্ল্যান ঠিক করিলাম। তাহাকে বলিলাম, 'প্রথম উহাদের কাছে গিয়া বলিতে হইবে যে তুমি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির দেশী ঔষধ জান। ধাতুদৌর্বল্য, প্রমেহ প্রভৃতি ব্যাধির অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ তোমার নিকট আছে। ইহাও তোমাকে বলিতে হইবে যে, অর্থাভাবে তুমি কষ্ট পাইতেছ, যে কোনও কাজ পাইলে পেটভাতাতেও তুমি করিতে প্রস্তুত আছ। খুব সম্ভব ইহা শুনিয়া উহারা তোমাকে বহাল করিবে। তাহার পর তোমাকে চিকিৎসা শুরু করিতে হইবে। প্রথম প্রথম কিছুদিন উহাদের মদনানন্দ মোদক খাওয়াও। কিন্তু শেষ দিন একটু বেশী পরিমাণে আফিং খাওয়াইতে হইবে। সেই দিন তোমার সাপটাও একজনের ঘরে ছাড়িয়া দিয়া লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে যে, সর্পাঘাতে উহার মৃত্যু হইয়াছে। একটা ছুঁচ লইয়া উহার পায়ের পাতায় দুইটা ক্ষতচিহ্ন করিয়া দিলে কাহারও কোনো সন্দেহ হইবে না। মেয়েটির মায়ের

একান্ত ইচ্ছা উহাদের চোখও উপড়াইয়া লইতে হইবে, না লইলে প্রতিশোধ পূরা হইবে না। সুরনাথের ঘরে যখন সাপ লইয়া সকলে ব্যস্ত থাকিবে তখন অহিফেন-বিষে অজ্ঞান কিংবা মৃত কালীপ্রসাদের চোখটা ছুকৃরি অনায়াসে উপড়াইয়া ফেলিতে পারিবে। চোখ ওপড়ানো হইয়া গেলে তোমার নেউলটার মুখে এবং সামনের পায়ে রক্ত লাগাইয়া পাশের ঘরে সেটাকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে অনেক বোকা লোকের হয়তো ধারণা হইবে যে, নেউলটাই কালীপ্রসাদের চক্ষুটি নষ্ট করিয়াছে। ছুকৃরির ইচ্ছা সুরনাথের চোখ দুইটাও সে উপড়াইবে। যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টাও আমরা করিব।

আশা করি ব্যাপারটা এইবার আপনার নিকট পরিষ্কার হইয়াছে। আর একটা কথা বলিয়া পত্র শেষ করি। এ-পত্রের হস্তাক্ষর আমার নয়। ছুকৃরি, ভজুয়া এবং বক্‌সী এ নাম তিনটিও ছদ্মনাম। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই আমরা এই নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলাম। আপনাদের আইনের চক্ষে আমরা অপরাধী। একটা সান্ত্বনা শুধু আছে উপরওয়ালার আইনে হয়তো আমরা ছাড়া পাইব। ইতি—

বক্‌সীবাবু

এই চিঠি পাইবার মাসখানেক পরে আমি ট্রেনে করিয়া একটা এন্‌কোয়ারি করিতে যাইতেছিলাম। মাঠের মাঝখানে ট্রেনটা থামিয়া গেল, শুনিলাম একটা লোক কাটা পড়িয়াছে। ট্রেন হইতে সকলে নামিয়া পড়িলাম। নামিয়া শুনিলাম লাইনের মাঝখানে একটা কুকুরছানা আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই কুকুর-ছানাটাকে বাঁচাইবার জন্য একটা লোক ছুটিয়া আসে এবং কুকুরছানাটাকে দূরে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু নিজে সে পড়িয়া যায়। ড্রাইভার সময় মতো গাড়ি থামাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা না হইলে কাটা পড়িত। ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া দেখিলাম, ভজুয়া এবং একটি জিপ্‌সি মেয়ে একটি বলিষ্ঠ যুবককে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। যুবকটির মাথা হইতে রক্ত পড়িতেছে, জ্ঞান নাই। রেলের ধারে মাঠের মাঝখানে একটি জিপ্‌সিদের তাঁবু দেখিলাম। তাঁবুর সম্মুখে একটি কুকুরী তাহার নধর শাবকটিকে স্তন্যপান করাইতেছে।

সেদিন আমি ভজুয়া, ছুকৃরি এবং বক্‌সীবাবুকে ধরিতে পারিতাম। কারণ ওই বলিষ্ঠ যুবকটিই যে বক্‌সীবাবু তাহাতে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু

কিছুই করিলাম না। ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া মুগ্ধ নেত্রে কেবল চাহিয়া রহিলাম। জীবনে যে দুই চারিটি সৎকার্য করিয়াছি এইটি মনে হয় তাহার মধ্যে অন্যতম।

www.boiRboi.blogspot.com

দাবি

ডাক্তার অরূপকুমার ক্রমাগত চিৎকার করিতেছেন, "আর কার কার দাবি আছে জানতে চাই—"

ব্যাপারটা তাহা হইলে গোড়া হইতে শুনুন।

ডাক্তার অরূপকুমার নিজে অবশ্য উদরের দাবিতে ব্যাপারটিতে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, কোনো ব্যাপারেই নির্বিঘ্নে লিপ্ত হওয়া যায় না। সুখাদ্যও কেহ যদি মুখে পূরিয়া দেয়, তবু তাহা চর্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়। দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরা আটকাইয়া এই সরল ব্যাপারটাও সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে, তুচ্ছ একটা খড়্‌কের জন্য তখন অস্থির হইয়া পড়িতে হয়।

ডাক্তার অরূপকুমারকেও বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। তিনি যদি সোজাসুজি ডিস্‌পেনসারি খুলিয়া আর পাঁচজন ডাক্তারের মতো প্র্যাক্‌টিস করিতে বসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্যা হয়তো এতটা জটিল হইত না। কিন্তু তিনি মফঃস্বল শহরে প্যাথোলজিস্ট হইয়া ডব্লিউ. আর. (W. R.) নামক দুরূহ রক্ত পরীক্ষা করিয়া অর্থোপার্জন করিবেন মনস্থ করিলেন, সুতরাং প্রথমেই তাঁহাকে গিনিপিগের সন্ধানে ট্যারা পাখিওলাটার শরণাপন্ন হইতে হইল। কলিকাতা শহর নয়, মফঃস্বলে গিনিপিগ যোগাড় করা শক্ত। ট্যারা পাখিওলাটাই যোগাড় করিয়া দিতে পারে। অরূপ জানিতেন, লোকটা চড়াই পাখিকে 'আগ্‌গিন' এবং বাঁশপাতিকে 'হরবোলা' বলিয়া চালায়, অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সাধারণ পায়রাই 'গেরবাজ' নাম দিয়া বিক্রয় করে। চুরির অপরাধে একবার জেলও খাটিয়াছিল। কিন্তু এই লোকটার খোশামোদ না করিলে মফঃস্বলে গিনিপিগ যোগাড় করা শক্ত। কেবলমাত্র পয়সায় কাজ হইবে না। কলিকাতা হইতে অবশ্য আনানো যায়, কিন্তু তাহা বড়ই ব্যয়সাধ্য। সুতরাং তাঁহাকে ট্যারা পাখিওলাটার শরণ লইতে হইল। প্রথমে সে তেমন গা করিল না। অনেক অনুরোধ করার পর বলিল, চেষ্টা করিয়া দেখিবে। চার পাঁচ

দিন পরে দেখা গেল, তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই, কয়েকটি শীর্ণ লোম-ওঠা গিনিপিগ আনিয়া সে হাজির করিয়াছে। বলিল, অনেক কষ্টে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সুতরাং প্রতিটি গিনিপিগের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া দিতে হইবে। বলিল, ডাক্তারবাবুকে খাতির করে বলিয়া সে কম দামই চাহিতেছে। যদিও আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল, তবু ডাক্তার অরূপকুমার দরদস্তুর করিতে ছাড়িলেন না। অবশেষে তিন টাকাতে রফা হইল। গিনিপিগ জুটিল, এবার খরগোশ এবং ভেড়া চাই।

পাখিওলা বলিল, "আমিই আপনাকে খরগোশ দিতে পারতাম। কিন্তু এ অঞ্চলের যত খরগোশ সব দীনু মিঞা কিনে চালান দিচ্ছে। আপনি তাকে ধরুন। আমার কাছে মাঝে মাঝে সাঁওতালরা জংলী খরগোশ বিক্রি করে যায়। তা-ও আমি দীনু মিঞার কাছেই পাঠিয়ে দিই। তার কাছেই আপনি খরগোশ পাবেন—"

দাড়িতে মেহেদি লাগানো দীনু মিঞাকে অরূপবাবু মৎস্য-ব্যবসায়ী বলিয়াই জানিতেন। সে যে খরগোশের ব্যবসায় ধরিয়াছে, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল। দীনু মিঞার সহিত দেখা করিয়া তিনি দেখিলেন শুধু খরগোশ নয়, নেউল, ইঁদুর, কাছিম, জোঁক প্রভৃতি জানোয়ারও দীনু মিঞা নানাস্থানে চালান দেয়। এসব নাকি তাহার শাখা-ব্যবসায়। অরূপবাবুকে বলিল, "সাদা খরগোশ তো সব চালান হয়ে গেছে। তবে ব্রোন কাবুলী খরগোশ একজোড়া আছে। দাম একটু বেশী লাগবে। পঁচিশ টাকা জোড়ায় বেচি, আপনি কুড়ি টাকা দেবেন।"

অরূপকুমার কাবুলী বিড়ালের কথা আগে শুনিয়াছিলেন, কাবুলী খরগোশের কথা প্রথম শুনিলেন। দীনু মিঞা খরগোশ যখন বাহির করিল, তখন কিন্তু দেখা গেল 'কাবুলী' বিশেষণ সত্ত্বেও খরগোশ দুইটি সাধারণ খরগোশের মতোই। রঙ্টা কেবল বাদামী। পুনরায় দরদস্তুর। কিছু দাম কমিল। অরূপবাবু বলিলেন, "আমার একটা ভেড়াও চাই মিঞা সাহেব—"

"ভেড়া তো আমি রাখি না। আপনি কিষণগঞ্জের হাটে লোক পাঠান। সেখানে সস্তায় ভেড়া পাবেন।"

ষোল টাকা দামে একটি ছোট ভেড়াও পাওয়া গেল।

এই ব্যাপারের জন্য ডাক্তারবাবুকে কয়েকটি মূল্যবান যন্ত্রপাতিও ইতিপূর্বে কিনিতে হইয়াছিল। দরদস্তুর করিবার সুযোগ পান নাই, কারণ যন্ত্রগুলি সবই বিদেশী, কিংবা বিদেশী জিনিসের স্বদেশী সমন্বয়, দাম একেবারে বাঁধাধরা।

ইলেক্‌ট্রিক ওয়াটারবাথ, ইনকিউবেটার, সেনট্রিফিউজ, রেফ্রিজারেটার, কেমিক্যাল ব্যালান্স এবং খুঁটিনাটি আরও নানারকম কাচের জিনিসপত্র কিনিতে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা লাগিয়া গিয়াছিল। টাকাটা তাঁহার শ্বশুর দিয়াছিলেন।

অতঃপর, তিনি কাজ শুরু করিলেন। হিতৈষী ডাক্তারদের সুপারিশে পরীক্ষা করিবার জন্য রক্তও জুটিতে লাগিল। ডাক্তার অরূপের ক্লিনিকে সিফিলিস রোগাক্রান্ত নরনারীরা ভিড় করিতে লাগিলেন। তিনি গিনিপিগ, খরগোশ এবং ভেড়ার রক্তের সহিত রোগী-রোগিণীর রক্ত মিশাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন কাহার রক্তে ভাসারম্যান রিয়াক্‌শন্ (Wassermann Reaction) কিরূপ। এই টেস্‌ট্‌ পজিটিভ হইলে বোঝা যায় রোগীর রক্তে উপদংশের বিষ আছে কি না।

কিছুদিন তাঁহার ব্যবসায় ভালই চলিল। গুরুতর সমস্যাটি দেখা দিল পরে। দাবির প্রশ্নটা সম্ভবত খবরের কাগজের মাধ্যমেই তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের কাগজের সীমানা-বিভাগ লইয়া তুমুল আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, ঠিক ইহার কিছুদিন পূর্বে। প্রত্যেক প্রদেশবাসী তারস্বরে ঘোষণা করিতেছিল, ভারতবর্ষের মাটির উপর কাহার কতখানি দাবি। বিনোবাজীর ভূদান যজ্ঞেও এই একই দাবির প্রশ্ন—জমিতে আসল দাবি কাহার, জমিদারের, না চাষীর? প্রতিদিন দাবি-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতেই সম্ভবত ডাক্তার অরূপের মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ তিনি অতিশয় ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রবন্ধ লিখিলেন না, তর্ক করিলেন না, বক্তৃতাও করিলেন না। স্বপ্ন দেখিলেন। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন।

দেখিলেন—একটি রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে তিনি এবং একটি বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি যেন মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বলিষ্ঠকায় ব্যক্তিটি তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ কটমট করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি যে রক্ত পরীক্ষা করে রোগীপিছু ষোল টাকা করে 'ফী' নাও, সে টাকায় কি তোমার একার দাবি? কতগুলি দাবিদার আছে দেখ।..."

যবনিকা সরিয়া গেল। অরূপ ডাক্তার সবিস্ময়ে দেখিলেন ট্যারা পাখি-ওলা এবং দাড়িতে মেহেদি লাগানো দীনু মিঞা দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা হাসিয়া বলিল, "আমরা আপনার জন্যে যা করেছি ক'টা টাকা দিয়ে যে তার মূল্য শোধ করা যায় না তা নিশ্চয়ই জানেন। আপনি শিক্ষিত লোক, আমাদের আসল দাবির কথাটা আশা করি মনে রাখবেন। আমাদের দাবি সর্বাগ্রে—"

কথা কয়টি বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিং উঁচাইয়া প্রবেশ

করিল ভেড়াটা। চোখাচোখি হইবামাত্র শুদ্ধ ভাষায় বলিল, "সপ্তাহে দুইবার করিয়া আমার রক্ত লইয়াছ। আমার দাবির কথা বিস্মৃত হইও না।" ভেড়া অন্তর্হিত হইল। তাহার পর আসিল গিনিপিগ-খরগোশ-পার্টির সম্মিলিত শোভাযাত্রা। ডাক্তার অরূপ আশ্চর্য হইয়া গেলেন। প্রত্যেকেই পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া মানুষের মতো চলিতেছে। প্রত্যেকের হাতে রক্তবর্ণ পতাকা, তাহাতে বড় বড় করিয়া লেখা রহিয়াছে—"আমরা বুকের রক্ত দিয়েছি…" শোভাযাত্রা চলিয়া গেল। তাহার পর আসিলেন তিনজন বিদেশী। ভাষা শুনিয়া বোঝা গেল: একজন জার্মান, একজন সুইস্ এবং আর একজন ইংরেজ। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় বলিলেন, "আমরা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তোমাকে যদি সরবরাহ না করিতাম, তাহা হইলে কি তুমি রক্ত পরীক্ষা করিতে পারিতে? পাখিগুলা এবং দীনু মিঞা ঠিক কথাই বলিয়াছে, কেবলমাত্র অর্থমূল্য দিলেই দাবি শেষ হয় না। ইহার একটা নৈতিক মূল্যও আছে। একটু ভাবিয়া দেখিও। গুড্ বাই…"

ডাক্তার অরূপ একটু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বিদেশী তিনজন চলিয়া যাইবার পর যিনি আসিলেন তাঁহাকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু অপ্রস্তুতও হইলেন। তিনি অন্য কেহ নন, তাঁহার পূজনীয় শ্বশুরমশায়, যিনি যন্ত্রাদি কিনিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য কিছু বলিলেন না, তাঁহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর একে একে আসিতে লাগিলেন তাঁহার শিক্ষকবৃন্দ। পাঠশালার পণ্ডিতমহাশয় হইতে শুরু করিয়া মেডিকেল কলেজের প্রফেসাররা পর্যন্ত। ইহারাও কেহ কোনও কথা বলিলেন না। তাঁহার দিকে গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একে একে চলিয়া গেলেন। অরূপবাবুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাঁহাদের দাবি তুচ্ছ করিবার মতো নয়। বেশ ঘাবড়াইয়া গেলেন। পর মুহূর্তেই কিন্তু আরও ঘাবড়াইতে হইল। শিক্ষকরা চলিয়া গেলে আসিলেন সেইসব ডাক্তারেরা যাঁহারা তাঁহাকে বরাবর রোগী সরবরাহ করিয়াছেন। তাঁহারাও মুখে কেহ কিছু বলিলেন না, দুই একজন ডাক্তার কেবল ভুরু নাচাইলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্য বুঝিতে অরূপবাবুর কোনও কষ্ট হইল না। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারাও তাঁহার উপার্জনের কিছু অংশ দাবি করেন। ডাক্তাররা চলিয়া যাইবার পর যাহা ঘটিল, তাহা অপ্রত্যাশিত এবং রোমাঞ্চকর। অরূপবাবুর মৃত পিতামাতা আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন। পিতা বলিলেন, "আমরাই তোমাকে জন্মদান

করিয়াছি, লালন-পালন করিয়াছি, লেখাপড়া শিখাইয়াছি। তোমার উপার্জনে আমরাও কিছু দাবি রাখি।" তাঁহারা অন্তর্হিত হইবার পর যাহা পরপর ঘটিল, তাহা আরও চমকপ্রদ। আরও দুই জোড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেখা দিলেন। এক জোড়া বলিলেন, "আমরা তোমার মাতামহ-মাতামহী।" তাহার পর চারজনেই সমস্বরে বলিলেন, "আমাদের ভুলো না।" বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাহার পর বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সমাগম হইল, সমস্ত রঙ্গমঞ্চটা যেন ভরিয়া গেল। প্র-বৃদ্ধ অতি-বৃদ্ধ পিতামহ-পিতামহী মাতামহ-মাতামহীরা আসিয়া নিজ নিজ দাবির কথা বলিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবুর মনে হইল ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের সকলেই বোধ হয় আসিয়াছেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ কলরব করিলেন, তাহার পর সহসা একযোগে অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর দেখা দিল ভবিষ্যৎ বংশধরেরা। অম্লান কুসুমের মতো একদল শিশু। আধো আধো ভাষায় তাহারা বলিল, "আমরা এখনও জন্মাইনি, কিন্তু আমাদের কথাও মনে রেখ। আমাদের জন্যেও কিছু রেখ—।" শিশুরা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল, রঙ্গমঞ্চ কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্জন হইল। তাহার পর কলকণ্ঠের একটা হাসি ভাসিয়া আসিল। পরক্ষণেই স্খলিতবসনা স্খলিতচরণা এক তরুণীর পিছু পিছু দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিল এক তরুণ। তাহারা দুইজনেই ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমরা দুজনে যদি বিপথে না যেতাম তাহলে কার রক্ত নিয়ে ডব্লিউ. আর. করতেন আপনি? সুতরাং আমাদের কিছু দাবি আছে, মনে রাখবেন!"—হাসিতে হাসিতে তাহারা চলিয়া গেল।

অরূপকুমার প্রত্যহ এই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। রাত্রে তো বটেই, দিনেও। চোখ বুজিলেই রঙ্গমঞ্চটা চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে।

শেষে তিনি ক্ষেপিয়া গেলেন।

পাগলা গারদে বসিয়া দিনরাত চিৎকার করেন, "আর কার কার দাবি আছে জানতে চাই—"

পাগলা গারদের ডাক্তার দাবি করিয়াছেন, "ডাক্তার অরূপকুমারের রক্ত ডব্লিউ. আর. পরীক্ষার জন্য পাঠানো হউক।"

অরূপকুমার রক্ত দিতে চান নাই। অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রক্ত লওয়া হইয়াছে।

ফলাফল এখনও জানা যায় নাই।

www.boiRboi.blogspot.com

অহির সহিত নকুলের অথবা ঘাসের সহিত ছাগলের বন্ধুত্ব আছে ইহা কল্পনা করা কঠিন। জিতুবাবুর সহিত কিন্তু পানুর বন্ধুত্ব ছিল, যদিও তাহাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। জিতুবাবু সুদখোর মহাজন আর পানু তাঁহার কবলস্থ খাতক। উভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই ছিল না, চেহারারও নয়, বয়সেরও নয়। জিতুবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি, পানুর বয়স চল্লিশের নিচে। জিতুবাবু কালো, বেঁটে এবং ঈষৎ কুঁজো, সামনের দিকে ঝুঁকিয়া থাকেন, সোজা দাঁড়াইতে পারেন না। পানু ছিপছিপে লম্বা, উন্নত-মস্তক এবং সুদর্শন। মতেরও কিছুমাত্র মিল নাই। জিতুবাবু সুদখোর মহাজন, অর্থসঞ্চয় করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং আনন্দ। পানু চিত্রকর, ছবি আঁকিয়া আনন্দ পায়, রং আর তুলি লইয়া খেলা করে এবং পয়সা পাইলেই উড়াইয়া দেয়। তবু দুইজনের বন্ধুত্ব আছে এবং তাহাকে প্রগাঢ় বিশেষণে ভূষিত করিলেও মিথ্যাভাষণ হয় না। জিতুবাবু কখনও যাহা করেন না, পানুর ক্ষেত্রে তাহা করেন অর্থাৎ বিনা সুদে, বিনা হ্যাণ্ডনোটে তাহাকে টাকা দেন। আর পানু কখনও যাহা করে না, জিতুবাবুর ক্ষেত্রে তাহা করে—অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি মতো ঠিক দিনে ঋণটি পরিশোধ করিয়া দেয়। দুই চারিদিন পরে আবার তাহাকে জিতুবাবুর নিকট হাত পাতিতে হয়, জিতুবাবুও পুনরায় টাকা দিতে আপত্তি করেন না। এইভাবেই বহুকাল হইতে চলিতেছে। জিতুবাবুর ধারণা, পানু একটা লক্ষ্মীছাড়া, পানুর ধারণা জিতুবাবু লোকটি স্বল্পবুদ্ধি জানোয়ার বিশেষ। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুকম্পাশীল, অথচ বন্ধুত্বও খুব।

সেদিন জিতুবাবু পানুর ঘরে ঢুকিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার আনন ঈষৎ ব্যায়ত হইয়া গেল। জিতুবাবু নিঃশব্দ চরণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পানু টের পায় নাই। সে পিছন ফিরিয়া ছবি আঁকিতেছিল। কুব্জ জিতুবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরবে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কথা কহিলেন।

"ওটা কি আঁকছ, পেত্নীর ছবি না কি—"

পানু ঘাড় ফিরাইয়া মৃদু হাসিল।

"আর একটু দূরে থেকে দেখুন, তা'হলে বুঝতে পারবেন।"

জিতুবাবু একটু পিছাইয়া গেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আর একবার দেখিয়া বলিলেন, "সুঁটকো কালো মেয়েমানুষ একটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে রয়েছে। এই তো? বুকের কাছটা কি বিশ্রী করেছ, এ যে অশ্লীল একেবারে হে! দাঁত

বার করে হাসছে আবার! এই ছবি বাজারে বার করবে না কি?"

"বহরমপুরের এক জমিদার হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন ছবিটা।"

"বল কি! হাজার টাকা! পেয়েছ টাকাটা?"

"না, পাইনি এখনও। ছবি যেদিন নেবেন সেইদিনই টাকাটা দেবেন বলে গেছেন।"

"ও—"

জিতুবাবু কপালের উপর বাম হাতটা রাখিয়া পুনরায় ছবিটি দেখিলেন। তাহার পর মন্তব্য করিলেন, "আমার বিশ্বাস তিনি আর আসবেন না। বদ্ধ পাগল না হলে এ ছবি পয়সা দিয়ে কেউ কেনে না। মেয়েমানুষই যদি আঁকলে একটা ভদ্র চেহারা আঁকলে না কেন। এই সুঁটকো মেয়ে আঁকবার কল্পনা তোমার হল কি করে—?"

পানু ক্ষণকাল স্মিতমুখে জিতুবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর প্রশ্ন করিল—"কালিদাস কে জানেন?—"

"জানি বই কি। ব্যাংকের সেই কেরানী ছোকরা তো—"

"না, আমি কবি কালিদাসের কথা বলছি।"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—শুনেছি নামটা।"

"তাঁর মেঘদূতের সঙ্গে যদি পরিচয় থাকত তাহলে বুঝতে পারতেন ছবির মানেটা—"

"কি রকম—"

"তাতে কবি যক্ষ-প্রিয়ার যে বর্ণনাটা দিয়েছেন তা অনেকটা এই রকম—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ॥
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ—"

জিতুবাবু ঈষৎ ব্যায়ত আননে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত বিখ্যাত শ্লোকটির আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, ছোক্‌রার গুণ আছে অনেক। এই সব কারণেই পানুকে ভালবাসেন তিনি।

"শ্লোকের মানে কি?—"

"যক্ষ-প্রিয়ার চেহারা কেমন? না, তিনি তন্বী, মানে ছিপছিপে, আপনার

ভাষায় সুটকো, শ্যামা কিনা শ্যামাঙ্গিনী, শিখরিদশনা মানে যার দাঁতের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি মানে যার নীচের ঠোঁট পাকা তেলাকুচো ফলের মতো, মধ্যে ক্ষামা, যার কোমর খুব সরু, চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা—যার চোখ দুটি চকিত-হরিণীর মতো, নিম্ননাভিঃ—যার নাভিদেশ খুব গভীর, শ্রোণীভারাদলসগমনা—যিনি নিতম্বের ভারে আস্তে আস্তে চলেন, স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং—স্তনের ভারে যিনি ঈষৎ অবনত—"

জিতুবাবু হাত তুলিয়া পানুকে থামাইয়া দিলেন।

"হয়েছে হয়েছে, থাম। আমি তো গোড়াতেই বলেছিলাম—পেত্নী! —কবি কালিদাস না হয় সংস্কৃতে বলেছেন যক্ষ-প্রিয়া। যক্ষ মানে ভূত। যাক—আমি যেজন্য এসেছিলাম বলি। টাকাটা সোমবারে দিতে পারবে?"

"আমার তো টাকা দেবার কথা বুধবার—"

"তা জানি। কিন্তু সোমবার পেলে আমার ভাল হত।"

"আপনি তো ব্যাংকে জমা দেবেন? বুধবারেই দেবেন না হয়, সেদিনও তো ব্যাংক খোলা—"

"ব্যাংকে জমা দেব না। অন্য কাজ আছে—"

"কেন আমাকে মিছে ধাপ্পা দিচ্ছেন। আমি জানি এ টাকা আপনি একটিও খরচ করেন না, সব জমা দেন—"

জিতুবাবুও হাসিয়া ফেলিলেন।

"না, খরচ করব না। তবে ব্যাংকেও পাঠাব না—"

"পুঁতবেন না কি?"

জিতুবাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন।

"কি করে জানলে তুমি?"

"আন্দাজ করলুম—"

"কথাটা ঘুণাক্ষরে যেন প্রকাশ না পায় ভাই। ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের যে রকম ব্যাপার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট দেখতে চায়। তাই ভেবেছি যে-সব টাকার খবর খাতায় নেই সেগুলো পুঁতে রাখব।"

"বেশ, বুধবারেই পুঁতবেন—"

"সোমবার ভাল দিন। আমি দু' তিনজনকে দিয়ে পাঁজি দেখিয়েছি। মাত্র একশোটা টাকা তো—দিয়ে দিও ভাই।"

"আমার কাছে এক কপর্দকও নেই এখন। বহরমপুরের জমিদার মঙ্গলবার

লোক পাঠাবেন বলে গেছেন, সেইদিনই না হয় টাকাটা দিয়ে দেব আপনাকে সন্ধ্যাবেলা—"

"না, সোমবার সকালে আমার চাই। দিও, বুঝলে—"

জিতুবাবু পানুর হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিলেন।

পানু স্মিতমুখে বিপন্ন জিতুবাবুর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া ফেলিল। কি অসহায় জীব!

"বেশ, চেষ্টা করব—"

"চেষ্টা নয়, চাই-ই সেদিন!"

"বেশ—"

শুক্রবার সকালে পানু এক ঝুড়ি লিচু লইয়া জিতুবাবুর বাসায় হাজির হইল। হাতে একটি পাঁজি। পাঁজি খুলিয়া পানু বলিল, "আজও দিন ভাল, এই দেখুন। শিবু ভট্‌চাজ দেখে দিয়েছে—"

"সোমবার দিন তো আমি কাজ চুকিয়ে ফেলেছি। আর ভাল দিন দেখে কি হবে!"

পানু হাসিয়া বলিল—"আমি সেদিন আপনাকে যে একশ' টাকার নোটটা দিয়েছিলাম সেটা বার করে এই টাকাগুলো সেখানে রেখে দিন—"

"কেন?"

"সে নোটটা জাল ছিল। আমি এঁকে দিয়েছিলাম। আপনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেন, কিন্তু আপনার চোখে ধুলো দেওয়া কত সহজ দেখুন। এই নিন—একশ' টাকার কয়েন—"

গনিয়া গনিয়া টাকাগুলি জিতুবাবুর সম্মুখে রাখিয়া পানু বলিল, "আপনি লিচু ভালবাসেন, তাই আপনার জন্য কিছু লিচু কিনে নিয়ে এলাম। আপনার জন্যে খুব ভাল একটা স্টীল-বক্‌সেরও অর্ডার দিয়েছি। কাল নাগাদ পেয়ে যাবেন—"

জিতুবাবু বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন।

"এ সব বলছ কি তুমি?"

ঠিকই বলছি। বহরমপুরের জমিদার মঙ্গলবার দিন এসে ছবিটা নিয়ে গেছেন। আমি বুধবারেই আসতাম, কিন্তু শিবু ভট্‌চাজ বললে বুধ-বৃহস্পতি দুটো দিনই খারাপ। তাই আজ এসেছি, আজ দিন ভাল। নোটটা আমাকে বার করে দিন—"

www.boiRboi.blogspot.com

"হাজার টাকা দিয়ে ছবিটা কিনে নিয়ে গেল ?"

"হ্যাঁ। আগামী সপ্তাহে কিন্তু আমার কিছু চাই। বেশী নয়, গোটা পঞ্চাশেক—"

"হাজার টাকা তো পেয়েছ—?"

"সব ফুঁকে দিয়েছে—"

পানুর চোখের দৃষ্টিতে হাসি ঝলমল করিতে লাগিল।

ঋণশোধ

ছকুর কাছে এসেছিলাম। আমার দিকে এক নজর চেয়েই ছকু বুঝতে পারল কেন এসেছি। প্রায়ই আমাকে আসতে হয় এবং একই উদ্দেশ্যে আসতে হয়। ছকুর কাছে কিছু টাকা পাব, কিন্তু কিছুতেই সেটা পাচ্ছি না। প্রথম প্রথম দু' চারবার তাগাদা করেছিলাম, এখন আর তাগাদাও করি না। নিজেরই চক্ষুলজ্জা হয়। তবে আসি রোজ। তার দোকানটিতে বসে' খবরের কাগজটি পড়ি, রাজনীতি নিয়ে দু'চারটে টুকরো আলাপ করি, আর মনে মনে প্রত্যাশা করে' থাকি হয়তো ছকুই নিজে থেকে ঋণশোধের প্রসঙ্গটা তুলবে। কিন্তু তোলে না। ঘড়িতে টং টং করে' ন'টা বাজলে ছকু হাই তুলে টুস্‌কি দিয়ে সামনের দেওয়ালে রক্ষিত গণেশকে প্রণাম করে' দোকান বন্ধ করবার আয়োজন করে। আমিও উঠে বাড়ি চলে যাই। আবার তার পরদিন সন্ধ্যায় এসে হাজির হই। এমনি বহুকাল ধরে' চলছে। ব্যাংক থেকে করকরে পাঁচশ' টাকা বার করে' আমিই একদিন ছকুর এই ঘড়ির দোকানটি করে' দিয়েছিলাম।

বি-এ ফেল করে' বাড়িতে বসেছিল বেচারা, নানারকম চেষ্টা করে' কোথাও কিছু যোগাড় করতে পারছিল না, আমিই তাকে পরামর্শ দিই—"এ শহরে ভাল ঘড়ির দোকান নেই, তুমি একটা ঘড়ির দোকান কর। আগে ঘড়ি সারাতে শিখে এস, তারপর বাজারের মাঝখানে একটা ঘর ভাড়া করে' বসে যাও, কিছু কিছু হবেই।"

ছকু হেসে উত্তর দিয়েছিল—"তা কি আমি জানি না, কিন্তু ক্যাপিটাল পাচ্ছি কোথায় !" হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে আমি বলে' বসলাম, "যা ক্যাপিটাল লাগে আমি ধার দেব তোমাকে, তুমি লেগে পড়।"

ছকু লেগে পড়ল। আমার চেনা-শোনা এক ঘড়ির কারিগর ছিল

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

কোলকাতায়। তার নামে একখানা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ছকুকে। ছকু কোলকাতায় গিয়ে প্রায় বছরখানেক রইল। থাকবার কোনও অসুবিধা হয় নি, ছকুর এক পিশেমশায় চাকরি করতেন খিদিরপুরে। তাঁর স্কন্ধারূঢ় হ'য়ে ঘড়ি সারানো বিদ্যেটা আয়ত্ত করে' ফেললে সে। তারপর আমাকে একদিন এসে বললে, "এইবার ক্যাপিটাল দিন। বাজারের ঠিক মাঝখানে ভাল ঘর খালি হয়েছে একটা। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে আজই ওটাকে 'বুক' করে' ফেলি, কিছু আসবাবপত্রও কিনতে হবে, ভাঙা ঘড়ি যোগাড় করেছি কয়েকটা, আপনার ঘরে যে দেওয়াল ঘড়িটা আছে সেটাও আমি দোকানে টাঙাব, আপনার একটা 'টাইম্‌পীস' তো রয়েছে, নতুন ঘড়িও কিনতে হবে দু'চারটেই ঘড়ির ব্যাণ্ড, কাচ, এসব-ও চাই"···হড়হড় করে' বলে' যেতে লাগল।

আমি একটু ভীত হ'য়ে পড়ছিলাম। বেশী টাকা তো আমার নেই, রিটায়ার করেছি, প্রভিডেণ্ট ফণ্ডটুকুই সম্বল।

বললাম, "আমি শ দুই টাকার বেশী দিতে পারব না, ওতেই কুলিয়ে নাও এখন।"

ছকু চক্ষু দুটি কপালে তুলে বলল—"আপনি ক্ষেপেছেন নাকি। বিড়ির দোকান নয়, ঘড়ির দোকান! অন্তত হাজার খানেক টাকা ক্যাপিটাল না পেলে আরম্ভই করা যাবে না যে, পরে আরও লাগবে। এই দেখুন না লিস্ট—।" আমি লিস্ট দেখি নি। বলেছিলাম, "দেখ, হাজার টাকা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। খুব মেরে কেটে পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।" ছকু চোখ বড় বড় করে' নাক ফুলিয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ আমার দিকে। তারপর বললে—"আপনি শেষে এমনভাবে বিট্রে (betray) করবেন জানলে আমি সাউথ আফ্রিকায় সেই চাকরিটা নিয়েই চলে' যেতাম।"

সাউথ আফ্রিকায় কোনও চাকরি অবশ্য সে পায়নি, খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন দেখে দু' একদিন জল্পনা করেছিল মাত্র যাবে কি না। পাঁচশ' টাকাতেই রফা হল শেষ পর্যন্ত। ছকু ঘড়ির দোকান করে' ফেললে। এ প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার কথা। দোকান নিশ্চয়ই ভাল চলছে। কারণ যে স্টাইলে সে থাকে, তাতে মনে হয় টাকাকড়ি রোজাগার করে নিশ্চয়ই। তা' না-হলে অত সিগারেট, অত সিনেমা, অমন ছিম্‌ছাম হয়ে থাকা সম্ভব হ'ত না। চার পাঁচ রকম জুতোই পায়ে দেয়। এক জামা কখনও দু'দিন পরে না সে উপর্যুপরি। সুতরাং মনে হয় দোকান মন্দ চলছে না। আমাকে কিন্তু একটি পয়সা দেয় নি,

এখনও পর্যন্ত। আমি কিন্তু প্রায়ই যাই সন্ধ্যার পর। বসি খানিকক্ষণ। আশা করে' থাকি ছকু নিজেই হয়তো কথাটা তুলবে, কিন্তু তোলে না! আগেই বলেছি এখন আর মুখে ফুটে তাগাদা করতে পারি না, মনে মনে করি। কিন্তু সেদিন যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম এবং ছকুর মুখে তার যে ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যা শুনলাম তাতে আশা ছাড়তে হ'ল।

দোকানের কোণটিতে বসে' রোজ যেমন করি সেদিনও তেমনি খবরের কাগজ খুলে কোরিয়া এবং লাল-চীন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, এমন সময়ে একটি ছেলে দোকানে এসে ঢুকল। তার হাতে একটি ঘড়ির বাক্স।

"ছকুবাবু, এই রিস্ট ওয়াচটি বদলে দিতে হবে। এর পিছন দিকে একটা দাগ রয়েছে, তখন লক্ষ্য করে' দেখিনি, এই দেখুন—"

ছেলেটি বাক্স থেকে রিস্ট ওয়াচটি বার করে' দেখালে। পিছন দিকে সত্যিই একটা আঁচড়ের মতো দাগ ছিল।

ছকু মৃদু হেসে বললে—"সরি, এখন আর বদলে দিতে পারব না। নেবার সময় আপনার দেখে নেওয়া উচিত ছিল!"

ছেলেটি একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ল।

"তা অবশ্য ছিল, আমার দোষ হয়েছে সেটা। কিন্তু বিশ্বাস করুন ওটা, মানে ওই দাগটা, আপনার দোকান থেকেই হয়েছে। আমরা কেউ হাতও দিই নি ও ঘড়িতে, আজ হঠাৎ উল্টে দেখি—"

ছকু নির্বিকারভাবে উত্তর দিলে—"বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন প্রিন্সিপ্‌লের। জিনিস নেবার সময় সেটা ভালো করে' দেখে না নিলে উভয়তই মুশকিল। মাপ করুন আমাকে। পিছন দিকে ওটুকু দাগ থাকলে ক্ষতিই বা কি!"

"এমনিতে কোনও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বিয়ের উপহার কি না, দাগী জিনিস দেওয়া যাবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমিই ব্যবহার করব, আমাকে আর একটা দিন—"

ছকু তাকে আর একটি ঘড়ি বিক্রি করলে। ছেলেটি এবার উল্‌টে পাল্‌টে ভাল করে' দেখে নিয়ে চলে' গেল।

আসল কথাটি আমি জানতাম। ঘড়িটা কোলকাতা থেকে ছকু যখন এনেছিল তখন ছকুই দেখিয়েছিল আমাকে দাগটা। বলেছিল—"এই দাগটুকুর জন্যে দাম পাঁচ টাকা কম দিয়েছি। কিন্তু দেখবেন ঠিক কাউকে ক্যাটালগ প্রাইসে ঝেড়ে দেব—"

ছোকরাটি চলে গেলে ছকু উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে চাইলে আমার দিকে। আমি কেবল দু'টি মাত্র কথা বললাম—"অন্যায় করেছ।"

ছকু ইতিহাসের ছাত্র। সে ইতিহাসের নজীর তুলে বললে—"ব্যবসার সঙ্গে যুদ্ধের যে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা যদি মানেন তাহলে কিছুই অন্যায় করি নি। জিতেছি এইটেই আমার সবচেয়ে বড় যুক্তি। এভ্রিথিং ইজ ফেয়ার ইন্ ওয়র এণ্ড লাভ্—"

"ব্যবসার সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক কি, ঠিক বুঝলাম না।"

"ইতিহাস পড়লেই বুঝতে পারবেন। আজকালকার যত যুদ্ধ তার মূলে আছে ব্যবসা। পুরাকালেও তাই ছিল। ক্রুসেডাররা ধর্মের জন্য যুদ্ধে নামে নি, নেমেছিল বাণিজ্যপথ দখল করবার জন্য। আমার মতে ব্যবসাটাই যুদ্ধ। খদ্দের হ'ল শত্রুপক্ষ, যে কোনও প্যাঁচে ফেলে তার পকেট থেকে পয়সাগুলো কেড়ে নিতে হবে। মিষ্টি কথা বলে', পিঠে হাত বুলিয়ে, লোভ দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে যেমন করে' হোক—"

ছকুর বিদ্যাবত্তা আর চিন্তাশীলতা দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। ছকু উত্তেজিত হয়েছিল, সে বলেই যেতে লাগল—"এই হালের কথাই ধরুন না। ইংরেজরা যখন প্রথমে এদেশে এসেছিলেন তখন তাদের ব্যবসা-বুদ্ধি ভাল ছিল, তাই তারা এদেশে রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিল। ক্লাইভ উমিচাঁদকে লাল-কাগজ সাদা-কাগজের ভেল্‌কি দেখিয়ে ঠকিয়েছিল, হেস্টিংস নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়েছিল, আরও কত কি করেছিল। অর্থাৎ তখন তারা খাঁটি ব্যবসাদার ছিল। তাই শুধু ব্যবসা নয়, এত বড় সাম্রাজ্যও স্থাপন করতে পেরেছিল। কিন্তু এদেশে কিছুদিন থাকবার পর এদেশের জল-হাওয়ার ফল ফলল। জল-হাওয়ার গুণ যাবে কোথা, মহৎ হ'য়ে উঠল ব্যাটারা। তাদের ব্যবসাদারগুলো পর্যন্ত মহৎ হ'য়ে উঠল। বছর তিনেক আগের একটা ঘটনা বলছি শুনুন, আমার পার্সোনাল এক্‌স্‌পীরিয়েন্স। ঘটনাটা এতদিন কাউকে বলিনি। মল্লিকদের বাড়ির বিয়ের কথা মনে আছে আপনার? সেই যে কোলকাতা থেকে শানাই এসেছিল? ঘেঁটু মল্লিকের মেয়ের বিয়ে—"

"মনে আছে"—

"আমি তখন কোলকাতায়। ঘেঁটু মল্লিক আমাকে চিঠি লিখলে: 'ভাই, তুমি জামাইয়ের জন্য ভালো দেখে একটি রিস্টওয়াচ কিনে এনো। পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত দাম দিতে রাজি আছি। ঘড়িটি সোনার হওয়া চাই।' একটা নামজাদা

সায়েবী দোকানে গিয়ে খুব ভাল ঘড়ি একটা কিনে ফেললাম। দোকানের নামটা আর বলব না, নামটা প্রকাশ করতে চাই না। ঘড়িটা কেনবার পর আরও দু' তিনদিন কোলকাতায় থাকতে হয়েছিল আমাকে। কি যে দুর্বুদ্ধি হ'ল ঘড়ি হাতে পরে' বেড়াতে লাগলাম। শ্যামবাজারে নরুদের বাড়ি গেছেন আপনি? তাদের বৈঠকখানার ফ্যানটা দেখেছেন? এমন নীচু করে' টাঙানো যে কোনও লম্বা লোক যদি হাত তোলে হাতে ব্লেড ঠেকে যায়। আমি জানেনই তো ছ'ফুট দু'ইঞ্চি। নরুদের বাড়ি গেছি, বন্ বন্ করে' ফ্যানটা ঘুরছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইতে কইতে হাতটা তুলেছি—ব্যস্! ব্লেড লেগে ঘড়ির কাচটা চুরমার, কাঁটাও একটা ভেঙ্গে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লাম খানিকক্ষণের জন্য। পাঁচশ' টাকা দিয়ে নতুন ঘড়ি কিনে দেবার সামর্থ্য নেই আমার, কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। ভাঙা ঘড়িটা ঘড়ির বাক্সে পুরে ক্যাশ মেমোটা নিয়ে হাজির হলাম সেই ঘড়ির দোকানে গিয়ে। দেখা করলাম বড় সাহেবের সঙ্গে। বললাম, আমি এই ঘড়িটা যখন নিয়ে গিয়েছিলাম তখন দেখে নিইনি, আজ খুলে দেখছি ঘড়িটা ভাঙা। যদি কাইণ্ডলি বদলে দেন, এটা ম্যারেজ প্রেজেণ্ট। সাহেব কয়েক সেকেণ্ড আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, চোখের উপর পাতা দুটো উঠল-পড়ল বার কয়েক, তারপর বললেন—'আপনি দেখে নেন নি? ও আচ্ছা, বসুন।' টং করে' ঘণ্টা বাজালেন, কর্মচারী এল একজন। সাহেব তাকে বললেন—'এই ঘড়িটা বদলে নিয়ে আসুন।' নতুন ঘড়ি নিয়ে সাহেবকে অনেক ধন্যেবাদ দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু মনে মনে বুঝলাম ব্যাটাদের মরণ এবার ঘনিয়ে এসেছে। এইবার চাটিবাটি গুটিয়ে সরে' পড়তে হবে। পড়তেও হ'ল। মহাত্মাজি যেই কুট্ করে' বললেন: কুইট্ ইণ্ডিয়া, অমনি সুট সুট করে চলে যেতে হ'ল—"

ছকুর ব্যবসা-নীতি এবং ইতিহাস-বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে সেদিন আমার দৃঢ় ধারণা হ'য়ে গেল আমার টাকা আর ফেরত পাব না। ছকু কিন্তু আমার ঋণশোধ করেছিল, যদিও একটু তির্যক পথে। একদিন ছকুর বাড়িতে গিয়ে দেখি বাদল স্যাকরা বসে' আছে। প্রশ্ন করলাম—এখানে কেন? সে বলল, ছকুবাবুর স্ত্রীর জন্য একটা হার গড়িয়ে এনেছি। হারটি আমাকে দেখালে সে। বেশ ভাল হার।

"দাম কত পড়ল?"

"পাঁচশ' টাকা"—

"টাকাটা পেয়ে' গেছ তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করলাম। আমি না পেলেও আমার মেয়ে তো পেল পাঁচশ' টাকা। গল্পের রস হানি হবে বলে' আগে বলি নি—ছকু আমার জামাই।

www.boiRboi.blogspot.com

সাঁতারের পোশাক

আমি মফঃস্বল হইতে যখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িতে গেলাম তখন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী মহলে সাঁতার শেখার হুজুক খুব প্রবল। হেদুয়া পুষ্করিণী প্রত্যহ সকালে-বিকালে সাঁতারুদের এবং সন্তরণ-দর্শনার্থীদের কলরবে মুখরিত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত হুজুকে মাতিয়াছেন। আমারও বাসনা হইল সাঁতার শিখি। বন্ধুবর নগেন্দ্র হেদুয়ার সাঁতার-ক্লাবের একজন সভ্য। তাহারই শরণাপন্ন হইলাম। সে বলিল, "এ তো খুব ভাল কথা। কালই তোকে ক্লাবে নিয়ে যাব। তুই সাঁতার একেবারে জানিস না ?"

"জানি। কতবার গঙ্গা পার হয়েছি। সাঁতার জানি বই কি—"

"বাঃ! তোকে পেয়ে আমাদের ক্লাবের লাভই হ'বে তাহলে। শান্তিদা তোকে লুফে নেবে একেবারে। আসছে বছর আমরা লম্বা একটা রেসে নাবব শান্তিদা বলছিলেন। তোর সুইমিং কস্ট্যুম আছে ?"

"না।"

"কিনতে হবে একটা। চৌরঙ্গীর একটা সাহেবী দোকানে নানারকম ভালো ভাল কস্ট্যুম এসেছে শুনেছি। কাল নিয়ে যাব তোকে।"

হেদুয়া ক্লাবে ভর্তি হইয়া গেলাম। আমার সাঁতার দেখিয়া শান্তিদা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনিও অবিলম্বে একটি সুইমিং কস্ট্যুম কিনিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলেন।

নগেনের সঙ্গে সেই দিনই বৈকালে গেলাম চৌরঙ্গীর সেই দোকানে। নগেনের সমস্তই জানা-শোনা ছিল, যেখানে গেলে সুইমিং কস্ট্যুম পাওয়া যাইবে, সেইখানেই সে আমাকে লইয়া গেল। কস্ট্যুম বাহির করিয়া আনিল একটি রূপসী তরুণী। অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু যে কস্ট্যুম সে বাহির করিয়াছিল নগেনের তাহা পছন্দ হইল না।

"এ ছাড়া অন্য কোন রকম নেই?"

"আছে বই কি।"

ঘাড় দুলাইয়া মুচকি হাসিয়া তরুণী চলিয়া গেল এবং আর এক রকম বাহির করিয়া আনিল। এটাও নগেনের পছন্দ হইল না, আমারও হইল না।

"আর কিছু নেই?"

"আছে।"

সে আর একবার ভিতরে গেল এবং তৃতীয় প্রকার কস্ট্যুম আনিল। বলিল, "এটা বিশেষ রকম মজবুত সুতায় প্রস্তুত। অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারুদের খুব প্রিয়।"

কিন্তু গেঞ্জির কলারটা বড় বেশী লম্বা। পছন্দ হইল না।

"আরও দেখাচ্ছি আপনাদের।"

সুমিষ্ট হাসিয়া মেয়েটি আবার ভিতরে চলিয়া গেল এবং এবার একসঙ্গে চার পাঁচরকম কস্ট্যুম বাহির করিয়া আনিল। একটাও পছন্দ হইল না।

"আর নেই?"

"আছে বই কি। প্লীজ ওয়েট এ মিনিট—"

আবার সে দ্রুতপদে ভিতরে গেল, আবার একগোছা বাহির করিয়া আনিল। কিন্তু নগেনের পছন্দ-অপছন্দের মানদণ্ড এমনি সূক্ষ্ম যে, এবারও একটাও পছন্দ হইল না। কোনটার কলার ছোট, কোনটার বড়, কোনটার রং খারাপ, কোনটার বুনোট ভাল নয়, কোনটার হাতা ঢিলা, কোনটার বেশী টাইট্। কস্ট্যুম স্তূপীকৃত হইয়া গেল।

"আর নেই।"

"বাইরে আর নেই। ওয়েট্ এ বিট্—আজ নতুন একটা চালান এসেছে, তাতে হয়তো থাকতে পারে।"

মধুর হাসিয়া তরুণী আবার চলিয়া গেল। এবার সে যে-কস্ট্যুমগুলি লইয়া আসিল, সেগুলি বাস্তবিকই চমৎকার। আমাদের দু'জনেরই খুব পছন্দ হইল।

"দাম কত?"

"বেশী নয়। পাঁচ টাকা চোদ্দ আনা।"

এইবার একটু মুশকিলে পড়িতে হইল। আমাদের কাছে পাঁচ টাকার বেশী ছিল না। গলা খাঁকারি দিয়া নগেন বলিল, "আমাদের কাছে পাঁচ টাকা মাত্র আছে। ভেবেছিলাম পাঁচ টাকাতেই হ'য়ে যাবে। এইটেই কিন্তু আমাদের

চাই। কাইণ্ডলি এটা একটু আলাদা করে রেখে দিন। এখনি এসে নিয়ে যাব আমরা।"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "ও ইয়েস্! আলাদা প্যাকেট করে' রেখে দিচ্ছি—"

লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছিল। পর-মুহূর্তেই আমরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

নগেন বলিল, "এখনই এসে নিয়ে যেতে হবে ওটা।"

"নিশ্চয়ই!"

সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিতেছিলাম, হঠাৎ 'বাবু বাবু' ডাক শুনিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতে হইল। দেখিলাম একটি চাপরাশি গোছের লোক হাতছানি দিয়া আমাদেরই ডাকিতেছে। দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

"আপনারাই কি সুইমিং কস্ট্যুম কিনছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"বড় সাহেব আপনাদের ডাকছেন।"

"কোন্ বড় সাহেব?"

"দোকানের। চলুন না—"

একটু অবাক্ হইয়া গেলাম।

নগেন বলিল, "চল না, শোনাই যাক—কি বলে!"

চাপরাশি আমাদের একটি প্রশান্ত-বদন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। সাহেব দূরের একটি ঘরে বসিয়া আমাদের পোশাক-নির্বাচন-লীলা দেখিয়াছিলেন। আমরা যাইতেই বলিলেন, "আপনারা অতগুলো কস্ট্যুম দেখলেন, কিন্তু একটিও তো নিলেন না, পছন্দ হ'ল না বুঝি?"

অপ্রস্তুত মুখে সত্য কথাটা বলিলাম।

"কত কম পড়ছে?"

"চোদ্দ আনা—"

সাহেব ঘণ্টা টিপিলেন। চাপরাশি পুনরায় প্রবেশ করিল।

"মিস জেসিকো সেলাম দাও!"

যে তরুণী আমাদের কস্ট্যুম দেখাইতেছিলেন, তিনি আসিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই সাহেব নিজের পকেট হইতে চোদ্দ আনা পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এঁদের যে পয়সাটা শর্ট পড়েছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওঁদের কস্ট্যুমটা দিয়ে ক্যাশমেমো দিয়ে দিন।"

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনারা খেলাটেলা দেখতে নিশ্চয়ই এদিকে আসেন, তখন পয়সাটা আমাকে দিয়ে যাবেন।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সাঁতারু-জীবনের প্রবেশদ্বারে সেই হাস্যমুখ সাহেবটির ছবি আজও টাঙানো আছে। আরও দুইটি ছবিও আছে। সে দুইটির কথাও শুনুন। আমি ডাক্তারি পাস করিতে পারি নাই, সাঁতারটা অবশ্য ভাল করিয়া শিখিয়াছিলাম। একটি সাঁতারু মেয়েকে বিবাহ করিয়া সাঁতারু-জীবনই যাপন করিতেছি।

সাঁতারের পোশাক সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি হইয়াছিল একটি মফঃস্বল শহরে। একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলাম। এমনি দুর্দৈব, আমার সুটকেসটি ট্রেনে চুরি গেল। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, কে নামাইয়া লইয়াছে। সুটকেসের ভিতর আমার সাঁতারের পোশাক ছিল। সুতরাং ট্রেন হইতে নামিয়াই সাঁতারের পোশাক কিনিবার জন্য বাজারে বাহির হইয়া পড়িতে হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু হতাশ হইলাম। অধিকাংশ দোকানদার সুইমিং কস্ট্যুমের নাম পর্যন্ত শোনে নাই। অধিকাংশ দোকানেই ধুতি, শাড়ি, গামছা, ছিট। একজন বলিল, "এখানকার সবচেয়ে বড় দোকান 'ভবতারণ ভাণ্ডার', সেখানে গেলে পেতে পারেন।" ভবতারণ ভাণ্ডারেই গেলাম। সেখানে দেখিলাম বিরাট এক তাকিয়ায় হেলান দিয়া এক বিরাট পুরুষ গড়গড়া সহযোগে তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে তাঁহারই অনুরূপ ভীমকান্তি আর এক ভদ্রলোকের সহিত রাজনীতি আলোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আমি দোকানে প্রবেশ করিলাম, তাঁহারা বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মডারেট্‌রা ভাল, না একস্ট্রিমিস্ট্‌রা ভাল, এই আলোচনাই চলিতে লাগিল।

"সুইমিং কস্ট্যুম আছে কি ?"

"পাশের দোকানে যান, আমরা কাটা কাপড় বেচি, পাশেই ডাক্তার মিত্তিরের ডিস্‌পেনসারি, সেখানেই খোঁজ করুন।"

বুঝিলাম, তাঁহারা সুইমিং কস্ট্যুমের নাম পর্যন্ত শোনেন নাই, ভাবিয়াছেন আমি বুঝি কোনও ঔষধ কিনতে আসিয়াছি। তখনই আমার চলিয়া আসা উচিত ছিল, কিন্তু ললাট-লিপি খণ্ডন করা যায় না, তাই আমি বাংলা করিয়া বলিলাম, "ওষুধ নয়, আমি সাঁতারের পোশাক খুঁজছি।"

বুঝাইয়া বলিলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

"ও, বুঝেছি! কাগজে টাইট্ গেঞ্জি-প্যাণ্ট-পরা ছোক্‌রা-ছুক্‌রিদের ছবি দেখি বটে মাঝে মাঝে। না মশাই, ওসব জিনিস আমার দোকানে পাবেন না!"

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আজ এখানে শীলেদের বাঁধে সাঁতার কম্পিটিশন হ'বে যে। কলকাতার বিখ্যাত সাঁতারু তুলালচাঁদ আসছেন—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি বটে। লোকটা নামী লোক—"

আর আমি আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। নিজের পরিচয় দিলাম।

"ও, আপনিই তুলালচাঁদ, বসুন, বসুন—"

উভয়েই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

আমি উপবেশন করিলাম, এবং তাঁহাদের বুঝাইতে লাগিলাম সাঁতার কাটিতে হইলে সাঁতারের পোশাক কেন প্রয়োজন।

ভবতারণ ভাণ্ডারের মালিক সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "আপনি বিপদে পড়েছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু ও জিনিস তো আমার কাছে নেই। কারও কাছেই পাবেন না। আচ্ছা দাঁড়ান, গফুর, গফুর, ও গফুর!—"

পাশের ঘর হইতে পর্দা ঠেলিয়া লুঙ্গিপরা একটি শীর্ণ ব্যক্তি প্রবেশ করিল।

"এই বাবুর হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্টের মাপ নিয়ে নাও তো! যান আপনি ওর সঙ্গে। চারটে নাগাদ সাঁতারের পোশাক পেয়ে যাবেন—"

"করিয়ে দেবেন বলছেন?"

"হাঁ হাঁ মশাই, ভার নিলুম যখন করিয়ে দেব। খুব ভাল কাপড়ের করিয়ে দেব। কোলকাতায় এমনটি পাবেন না—"

"কী কাপড়ের?"

"সে দেখবেন তখন!"

ভদ্রলোকের চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া আর বেশী ইতস্তত করিতে সাহস হইল না। গফুর-দর্জির ঘরে গিয়া মাপ দিলাম। যাঁহার বাড়িতে উঠিয়াছিলাম, তিনিও আশ্বাস দিলেন, "ভবতাণবাবু স্বয়ং যখন ভার নিয়েছেন, তখন ঠিক পেয়ে যাবেন—"

সাড়ে পাঁচটার সময় সাঁতার আরম্ভ। ভবতারণবাবু ঠিক চারটের সময় যাইতে বলিয়াছিলেন। গিয়া দেখিলাম দোকান বন্ধ, শুনিলাম ভবতারণবাবু এ-বেলা দোকান খুলিবেন না, সাঁতার দেখিতে যাইবেন। অনেক ডাকাডাকির পর গফুর-দর্জি পাশের একটি গলি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"ও, আপনি এসেছেন। টেকে রেখেছি, এইবার কলটা চাপিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুণি হয়ে যাবে—"

বারান্দাতেই বসিয়া রহিলাম। সওয়া পাঁচটার সময় গফুর কোনক্রমে কাজ শেষ করিল। দেখিলাম কাপড়টা কালো এবং খুব খস্‌খসে গোছের।

গফুর বলিল, ছাতার কাপড়। বাবু বললেন, জলে ভিজবে কিনা, ছাতার কাপড়েরই ভাল হবে।"

হাফ প্যান্টটা একটু আঁট এবং হাফ শার্টটা বেশ ঢিলা হইল। অদল-বদল করিবার আর সময় ছিল না। ওই কস্ট্যুম পরিয়াই প্রতিযোগিতায় নামিয়া গেলাম। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানই অধিকার করিয়াছিলাম, কিন্তু জল হইতে যখন উঠিলাম, তখন আমার সর্বাঙ্গ কালো হইয়া গিয়াছে। কাপড়ের রংটা কাঁচা ছিল।

একটা কথা কিন্তু না উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে। ভবতারণবাবু একটি পয়সাও দাম লন নাই। হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ওটা আপনাকে প্রেজেণ্ট করলাম। আপনি নামী লোক, গরিবের একটা স্মৃতিচিহ্ন থাক আপনার কাছে—"

সাঁতারের পোশাক সম্পর্কে একটি বিলিতি দোকানের এবং একটি স্বদেশী দোকানের গল্প বলিলাম। তৃতীয় গল্পটি আরও স্বদেশী। এক অজ পাড়াগাঁয়ে ভাগ্নের বিবাহ উপলক্ষে গিয়াছিলাম। সেখানে সকলে ধরিয়া বসিল, সাঁতার দেখাইতে হইবে। কয়েকজন উৎসাহী প্রতিযোগীও জুটিয়া গেল এবং স্পর্ধা করিতে লাগিল আমাকে হারাইয়া দিবে।

বলিলাম, "সঙ্গে তো সুইমিং কস্ট্যুম আনি নি। সুইমিং কস্ট্যুম না হ'লে সাঁতার কাটতে পারি না।"

ছোকরারা দমিয়া গেল। কিছুক্ষণ অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ একজন বলিল, "বেংকট বাবার কাছে গেলে কেমন হয়। তিনি ছবির অসুখের সময়ে থার্মোমিটার বার করে দিয়েছিলেন, আমাদের অসময়ে কাঁটাল খাইয়েছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে সুইমিং কস্ট্যুমও আনিয়ে দিতে পারবেন। চলুন না তাঁর কাছে। বেশী দূর নয়—"

"বেংকট বাবা কে?—"

"মস্ত বড় সিদ্ধপুরুষ একজন। ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। সুখেনদাকে দামী একটা ঘড়ি আনিয়ে দিয়েছিলেন একবার।"

www.boiRboi.blogspot.com

"কি করে আনিয়ে দিয়েছিলেন ?—"

"মন্তরের চোটে। আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে ঘড়িটা হাতে দিলেন। মনে হ'ল যেন তাঁর কাছেই ছিল।"

কৌতূহল হইল। গেলাম বেংকট বাবার কাছে। ক্ষুদ্র খর্বকায় ব্যক্তি, চক্ষু দুইটি লাল। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সাঁতার কাটবার জন্যে আবার পোশাকের দরকার কি! বাবা, সমস্ত ত্যাগ করে' ভবসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে না পড়লে পার মিলবে না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হ'য়ে সাঁতার কাটতে শেখ বাবা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হ'য়ে সাঁতার কাটতে শেখ। পোশাক নিয়ে কী হবে!—"

সতী

"ওটা কার ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন? চমৎকার চেহারা তো! আপনার মা?"

"না, আমার কেউ নয়। আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর ছবি—"

"বন্ধুর স্ত্রীর ছবি আপনি টাঙিয়ে রেখেছেন কেন?"

"ও ছবি দুর্লভ ব'লে!"

"কি রকম—"

"তাহ'লে সব খুলে বলতে হয়। আজকাল সতীর কদর নেই। যত কদর অসতীদের। কাগজে পত্রিকায় সমাজে তাদেরই জয়জয়কার। জীবনে ওই একটি সতী দেখেছিলাম, তাই ছবিটি যোগাড় ক'রে রেখেছি। রোজ সকালে উঠেই প্রণাম করি।"

"প্রণাম করেন?"

"প্রণাম করি। ওই একটি প্রণামই সত্য প্রণাম হয়। তাছাড়া যে-সব প্রণাম রোজ ডাইনে-বাঁয়ে করতে হয় সে-সব মেকি প্রণাম, স্বার্থের জন্যে বা ভদ্রতার খাতিরে। মা বাবাকে অবশ্য সত্যি প্রণাম করতুম, কিন্তু তাঁরা তো অনেকদিন হ'ল গত হয়েছেন। তাঁদের ছবিও নেই, সেকালে ছবি তোলার তত রেওয়াজও ছিল না। তাঁদের আলেখ্য তাই চোখের সামনে নেই। তবে ভাগ্যবলে ওই পুণ্যবতীর ছবিটি পেয়েছি।"

ভবতোষবাবু আবার প্রণাম করলেন ছবিটিকে।

তাঁর বেয়াই ত্রিদিববাবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ছবিটির দিকে। তারপর বললেন, "চেহারাটা খুবই অসাধারণ সত্যি—। ইনি যে সতী ছিলেন তা আপনি জানলেন কি ক'রে—"

www.boiRboi.blogspot.com

"আপনি যে সন্দেহ-প্রকাশ করছেন সেজন্য আমি রাগ করছি না। ওরকম রূপসী যে সতী থাকতে পারে এ বিশ্বাসই আমাদের চলে গেছে। আজকাল সমাজে অসতীদের আমরা মেনে নিয়েছি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যেন সতী হওয়াটা একটা কুসংস্কার। যাঁরা বিজ্ঞ তাঁরা এ-কথাও প্রচার করেন, স্ত্রীলোক মাত্রকেই কেনা যায়। তারতম্যটা শুধু দামের। হে হে হে হে—"

গড়গড়ায় টান দিয়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগলেন ভবতোষবাবু। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে চুপ ক'রে গেলেন ভুরু কুঁচকে।

"ওদের দোষ নেই। ওরা দেখছে যারা কবি সাহিত্যিক তাদেরও টাকার জুতো মেরে কেনা যায়, তারাও মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'হ্যাঁ'-কে 'না' ব'লে বক্তৃতা দেয়। ওরা দেখছে যে, টাকা দিয়ে অমুকানন্দ তমুকানন্দকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যায়, ওরা দেখছে যে, টাকার মহিমায় বামপন্থী নেতা দক্ষিণপন্থী হ'য়ে যান, দক্ষিণপন্থীর বামপন্থী হ'তে আটকায় না; ওরা দেখছে, ঘরের বউ প্রায়-উলঙ্গ হ'য়ে সিনেমায় নাচছে টাকার লোভে, ওদের দোষ কি। তাছাড়া আর একটা কথা আছে—"

গড়গড়ায় টান দিতে দিতে হাঁটু দোলাতে লাগলেন ভবতোষবাবু। ত্রিদিববাবু আগে দক্ষিণপন্থী ছিলেন, এখন বামপন্থী হয়েছেন, তাছাড়া তিনি মেয়ের বাবা, প্রতিবাদ করতে পারলেন না, ভিজা বিড়ালের মত চাইতে লাগলেন কেবল।

ভবতোষবাবু বললেন, "আর একটা মস্ত কথা আছে এর ভিতর। সবাই ইচ্ছে করলে সতী হ'তে পারে না। সবাই কি ভক্ত হতে পারে? আমরা জগন্নাথদেবের ওই রকম মূর্তি দেখে কি তাঁকে পরম করুণাময় ভগবান বলে' মনে করতে পারি, চৈতন্য মহাপ্রভু যেমন পেরেছিলেন? আমরা সবাই কলম দিয়ে কাগজের উপর লিখি, কিন্তু সবাই কি আমরা লেখক? আমরা বই পেলেই পড়ি কিন্তু সবাই কি পাঠক হ'তে পেরেছি? মন সেইভাবে তৈরি হওয়া চাই, সকলের তা হয় না। নিজের অন্তরে ঐশ্বর্য থাকা চাই, সেই ঐশ্বর্য বাইরে আরোপ করবার শক্তি থাকা চাই, তবে ওসব হয়। পুরীর মন্দিরে জগন্নাথদেবের যে গুরুগম্ভীর ভীষণ মূর্তি আছে, শ্রীচৈতন্য কিন্তু ওর মধ্যেই মদনমোহন বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর মনের মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণ ছিল তাকেই তিনি বাইরে দেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—মূর্তিতে ছিল না, ছিল তাঁর মনে, তাঁর চোখের মণিতে। সতীরাও তাই, স্বামীরা যেমনই হোক, তার মধ্যে তাঁরা দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেন। স্বামীর মধ্যে দেবত্ব নাই, দেবত্ব আছে ওই সতীর মনে। সেরকম মন আর কই, আজকাল তো চোখে পড়ে না। এখন স্ত্রীরা স্বামীর রূপ চায়,

ধন চায়, খ্যাতি চায়, মর্যাদা চায়, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র চায়—তবেই তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তা-ও হয়তো করেন না। যে স্বামীর রূপ নেই, ধন নেই, খ্যাতি নেই, চরিত্র নেই—এরকম স্বামীকে দেবতার মতো ভক্তি করতে পারে এরকম স্ত্রীলোক ওই একটি ছাড়া আর দেখিনি।"

আবার খানিকক্ষণ ছবিটির দিকে চেয়ে রইলেন ভবতোষ। আবার প্রণাম করলেন। ত্রিদিববাবু একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। একটু উসখুস ক'রে বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যে রকম বলছেন সে রকম সতী আজকাল আর কই। আমাদের রজনীবাবুর স্ত্রীকে খুই সতীসাধ্বী ব'লে জানতাম, কিন্তু শেষকালে সে-ও একটা ছোঁড়া অ্যাক্‌টারের সঙ্গে জুটে গেল, সিফিলিসও হ'ল—"

"হ্যাঁ, ঘরে-ঘরেই তো আজকাল ওই ব্যাপার। সেইজন্যেই ওই ছবিটির এত দাম। শুনবেন ওঁর কথা?"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে, নিশ্চয় শুনব।"

"আপত্তি কিছুই নেই। দেবীর গুণকীর্তন করলে পুণ্যই হবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে বললেন—"আমি নাম-ধাম গোপন করেই বলছি। আমার বন্ধুর নাম ছিল, আমি তাকে কেষ্ট ব'লে পরিচয় দিচ্ছি আপনার কাছে। কেষ্ট আমার বাল্যবন্ধু ছিল। স্কুল থেকে আরম্ভ ক'রে কলেজ পর্যন্ত পড়েছিলাম একসঙ্গে। ওর মাকে আমি মাসীমা বলতাম। কেষ্টও আমার মাকে মাসীমা বলত। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও প্রাণের সম্পর্ক খুব গভীর ছিল। রক্তের সম্পর্ক ছিল না বলেই বোধহয় প্রাণের সম্পর্কটা এত গভীর হয়েছিল। রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনরা প্রায়ই শত্রু হয়। আমি আই-এ পাশ ক'রে আর পড়লাম না, বাবা বললেন, আর পড়ে' সময় নষ্ট করছ কেন, দোকানে এসে বোসো, নিজের ব্যবসা দেখে-শুনে নাও। কেষ্ট গরীবের ছেলে ছিল, সে এম. এ. পাস করে' একজায়গায় চাকরি করতে লাগল। কেষ্ট দেখতে ভালো ছিল না। বেঁটে, কালো, রোগা। মাইনে পেত পঁচাত্তর টাকা। তবু তার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল অনেক। আমি তার সঙ্গে প্রায়ই মেয়ে দেখতে যেতাম। অনেক মেয়ে দেখার পর এঁকে দেখলাম। একেবারে যেন দেবীমূর্তি, লক্ষ্মীপ্রতিমা। অপছন্দর প্রশ্নই উঠল না, দেনা-পাওনাতেও আটকালো না, বিয়ে হ'য়ে গেল। আমি ওর বন্ধু, আমার আনন্দিত হওয়া উচিত, কিন্তু আনন্দ না হ'য়ে হিংসে হ'ল। আমার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমার বউও দেখতে নেহাত খারাপ ছিল না, বেঁচে থাকলে আপনি নিজের চোখেই দেখতে পেতেন। কিন্তু-

এ-দেবীপ্রতিমার কাছে তার রূপ ম্লান হ'য়ে গেল আমার চোখে। আমি বাইরে যদিও দেঁতো-হাসি হাসতে লাগলাম কিন্তু মনে মনে আমার ঈর্ষার আগুন জ্বলতে লাগল। কিন্তু মনের আগুন মনেই চেপে রাখতে হ'ল, উপায় কি। এইভাবে কাটল কিছুদিন। কেষ্টর বাড়িতে আমার অবাধ গতি ছিল। রোজ যেতাম। কেষ্টর বউ চা জলখাবার পান দেবার জন্যে আমার সামনে বেরুতও। কিন্তু তার মুখ কখনও দেখতে পাইনি। আলতা-রাঙা পা দুইটিই দেখতাম কেবল। বন্ধুর বউ, সুতরাং হাসি-ঠাট্টাও করতাম তার সঙ্গে। কিন্তু ও-তরফ থেকে কোনরকম সাড়া পাইনি কোনদিন। ঘোমটা-টানা সেই নীরব মূর্তি আজও আমি দেখতে পাই চোখের সামনে। কেষ্ট তার বউকে ভালবাসত খুব। অমন বউকে ভালো না বাসাটাই আশ্চর্য। আমিও ভালবাসতুম। যাকে বলে—লভ্ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট—তাই হয়েছিল। মনে মনে দুরভিসন্ধিও ছিল কিছু। বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসা যখন আমার হাতে এলো তখন আমার ব্যাঙ্কে পাঁচশ লক্ষ টাকা মজুত। মাথা তখন গগনচুম্বী হয়েছে। ধারণা হয়েছে, টাকার জোরে সব করতে পারি। কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী মারা গেল বিনয়কে রেখে। তখন দড়ি-ছেঁড়া ষাঁড়ের মতো আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম চতুর্দিকে। অনেক বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল, অনেক সুন্দরী ধনী-কন্যা এসেছিল, অনেক লেখাপড়া-জানা কালচার্ড মেয়ে এসেছিল এই প্রৌঢ় কুদর্শন লোকটির গলায় মালা দেবে বলে'। কিন্তু আমি কাউকে আমোল দিইনি। মনের অন্তরীক্ষে দেবীর মতো দাঁড়িয়ে ছিল কেষ্টর বউ। আমি তার হাতে একটা মালাও কল্পনা করেছিলাম। ওই ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের অঙ্ক আমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছিল—"

চুপ করলেন ভবতোষবাবু। ভৃত্য আর-এক কলকে তামাক দিয়ে গেল। তিনি ধীরে ধীরে টান দিতে লাগলেন গড়গড়ায়। অনেকক্ষণ চুপ করে' রইলেন। মনে হল অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছেন।

তারপর হঠাৎ বললেন—"কেষ্টর বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা বরাবরই অব্যাহত ছিল। আমার মনে যে দুরভিসন্ধি আছে তা ওরা কল্পনাও করতে পারত না। আমি যেতাম বটে, কিন্তু কেষ্টর বউ পারতপক্ষে আমার সামনে আসত না। কি রকম ক'রে সে যেন বুঝতে পেরেছিল আমি নর-রূপী রাবণ একটি। মেয়েরা এটা বুঝতে পারে। যেসব মেয়ে খারাপ হয় তারা রাবণটির সামনে শাড়ির এবং দেহের বাহার ফলিয়ে ঘুর-ঘুর করে, আর যারা ভালো হয় তারা দূরে সরে' থাকে। আমার মধ্যে যে একটা লোলুপ 'রাবণ' আছে, কেষ্টর

বউ সেটা টের পেয়েছিল। রাবণ বীর ছিল, জোর করে' সীতাহরণ করেছিল। কিন্তু আমি ছিলাম ভীতু। আড়ালে-আবডালে যেন ফাঁক খুঁজছিলাম। কিন্তু ফাঁক পাচ্ছিলাম না। ওদের দাম্পত্য-প্রণয় ছিল একেবারে রেকৃতার গাঁথুনিতে গাঁথা! ছুঁচ প্রবেশের উপায় ছিল না। আমি ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে, ফাল হ'য়ে বেরুব ভেবেছিলাম। কিন্তু ঢোকবারই রাস্তা ছিল না। কেষ্টর কোনও ছেলে-পুলে হয়নি। কেষ্টর বউ কেষ্টকে নিয়েই দিনরাত থাকত। নিজে হাতে তার কাপড় জামা কাচত, নিজে হাতে তার জন্যে রান্না করত, নিজে তাকে সাবান মাখিয়ে চান করাত, নিজে তার চিবুক ধরে' মাথার চুল আঁচড়ে দিত, নিজে পাখা নিয়ে বসে' থাকত তার খাবার সময়। দুপুরে কেষ্ট যখন আপিসে চ'লে যেত তখনও সে কেষ্টরই সেবা করত। হয় তার জামায় বোতাম লাগাচ্ছে, নয় তার কাপড়ের কোথায় খোঁচ লেগেছে সেটা সেলাই করছে, নয় তার জন্যে মোজা বা সোয়েটার বুনছে। কেষ্ট যেসব খাবার ভালবাসত তা-ও তৈরি করত দুপুরে ব'সে। আমসত্ত্ব দিত, বড়ি দিত, আচার তৈরি করত, মোরব্বা তৈরি করত। একেবারে নিশ্ছিদ্র ব্যাপার। কোনও দিক দিয়ে প্রবেশের উপায় ছিল না।

এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর ভগবান একদিন সুযোগ দিলেন আমাকে। সুযোগটা এই—কেষ্টর পদস্খলন হ'ল। খবর পেলাম যে রামবাগানে এক মাগীর ওখানে যাতায়াত করছে। প্রাণে একটু আশা হ'ল। একদিন রাত দশটার সময় কেষ্টর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম কেষ্ট তখনও ফেরেনি, তার বউ জানলার গরাদে ধরে' রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। দেখে চলে' এলাম। তারপর তাদের দাইকে হাত করলাম। তার কাজ হ'ল, কেষ্টর সঙ্গে বউয়ের সম্পর্কটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে তার খবর রাখা। দাইটি বেশ ঘাঘি, আড়ি পাততে ওস্তাদ। সে রোজ এসে খবর দিত—কই বাবু, কিছু তো বুঝতে পারি না। আগে যেমন ছিল, এখনও তো তেমনি আছে। তারপর একদিন এসে বললে—আজ ওরা ঘরে অনেকক্ষণ খিল দিয়ে ছিল। আমি বাইরে থেকে আড়ি পেতে সব শুনেছি। বাবু হাউ হাউ করে' কাঁদছিলেন, আর বলছিলেন, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি বিপথে গেছি। আর কখনও যাবো না, আমাকে ক্ষমা করো। আমি জিগ্যেস করলুম, কেষ্টর বউ কি বললে? না, কিছু বললেন না, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, তাই তো, এ কি হ'ল! একটিবার শুধু বললেন। তার পরদিন ঝিটা আবার এলো। বললে, আর বিশেষ কিছু হয়নি, মা খালি মাঝে মাঝে বলছেন, তাই তো, একি হ'ল! একা

www.boiRboi.blogspot.com

একা আপনমনেই এ-কথা বল্লেন। আমার মনে হ'ল এই সুযোগ। আমি দাইয়ের মারফত একটা চিঠি পাঠালাম সাহস করে'। তাতে শুধু লিখলাম—ওই পাপিষ্ঠের কাছে তুমি আর থেকো না। আমার বাড়িতে এসো, তোমাকে রাজরাজেশ্বরী করে রেখে দেবো। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো—

"আমি মহাপাপী, তাই আমার স্বামী বিপথে গেছেন। তাই আপনি (যাঁকে আমি এতকাল দাদার মতো শ্রদ্ধা করে' এসেছি) আমাকে এমন চিঠি লিখতে পারলেন। দোষ আপনাদের কারও নয়, দোষ আমার মধ্যেই আছে নিশ্চয়। তাই এসব ঘটছে। আমি আপনাদের পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবো।" তারপর দিনই আপিং খেলে। কেষ্ট মনে করলে, তারই পদস্খলনের কথা শুনে এই কাণ্ড ঘটল বুঝি। কিন্তু আমি জানতাম আসল কারণ কি। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসাপত্র করে' বাঁচিয়ে তুললাম তাকে, তারপর থেকে আর তাদের বাড়ি যাইনি। যাবার সাহস হয়নি। এ ঘটনার পর কেষ্ট কিন্তু ভেঙে পড়ল। খেতো না, কথা কইত না, বিমর্ষ হ'য়ে বসে' থাকত খালি। দিনকতক পরে শয্যা নিলে। দিনরাত কাঁদত খালি। চোখের জলের ধারায় তার নাকের দু'পাশ হেজে গেল। ডাক্তার এসে বললেন, মানসিক ব্যাধি। কেষ্টর বউ দিনরাত্রি তার মাথার শিয়রে বসে' সেবা করত। ডাক্তারী, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী—সবরকম চিকিৎসাই হ'ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেষ্ট বাঁচল না। কেষ্টকে যখন আমরা শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি, তখন কেষ্টর বউ তেতলার ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে চীৎকার করে' উঠল—না, না, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। বলেই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হ'ল তার। এক চিতায় দু'জনকে পোড়ানো হ'ল—"

ভবতোষবাবু নির্নিমেষে ছবিটার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর প্রণাম করলেন আর একবার।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রকাণ্ড একটি হল-ঘর। ছাদ পাকা নয়, খাপরার চাল। একটি বড় বরগা ঘরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে দেখা যাইতেছে। পর্দা টাঙাইয়া হলটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পর্দা একটি নয়, দুইটি—পাশাপাশি টাঙানো আছে। পর্দার ওপারে কি আছে তাহা দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু উভয় পর্দার সন্ধিস্থল ফাঁক করিয়া দিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে। ঘরের দুইদিকে দুইটি দরজা আছে। ঘরের মাঝামাঝি একটি গোল টেবিল এবং দেওয়াল ঘেঁষিয়া ছোট লম্বা গোছের আর একটি টেবিল রহিয়াছে। গোল টেবিলের চারিধারে কয়েকখানি দামী চেয়ার আছে। সুদৃশ্য ডোম-সমন্বিত একটি ইলেকট্রিক বাতি জ্বলিতেছে। একটি প্লেট হাতে করিয়া করিম খানসামা প্রবেশ করিল। করিম খানসামার নূর আছে, পরিধানে চেক-চেক লুঙ্গি, ফতুয়া এবং মলিন ফেজ। প্লেটটি ছোট লম্বা টেবিলে রাখিয়া করিম উৎসুক নয়নে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে ডাক দিল

করিম। কই রে শিবু, শিকগুলো নিয়ে আয়।

শিবু। [নেপথ্য হইতে] যাই।

করিম। [এদিক ওদিক চাহিয়া] সব ঘরগুলোর খাপরা নাবিয়েছে দেখছি। ঘরের মাঝামাঝি আবুর পর্দা টাঙিয়েছে কেন! শিবু, ওরে শিবু!

শিবু। [নেপথ্য হইতে] যাই—যাই।

শিবু প্রবেশ করিল। ঝানু চেহারা। তাহার কাঁধে ঝাড়ন, পরনে ফতুয়া এবং হাতে গোটা দুই লোহার শিক। শিবু আসিয়াই চোখ বড় বড় করিয়া ঠোঁকে আঙুল দিল

শিবু। আরে, চুপ চুপ করিম মিয়া, অত চেঁচায় না।

করিম। কেন?

শিবু। [পর্দা দেখাইয়া, চুপি চুপি] আরে, দেখছ না?

করিম। দেখছি তো, পর্দা টাঙালে যে হঠাৎ?

শিবু। [চুপি চুপি] ওপারে মেয়েমানুষ আছে।

করিম। [সবিস্ময়ে ও নিম্নকণ্ঠে] তাই নাকি?

শিবু। তা না হ'লে শুধু শুধু পর্দা টাঙাব কেন?

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

করিম। কর্তা তা হ'লে আর একটি উড়িয়ে এনেছেন ?

শিবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল

শিবু। তাই না শিক-কাবাব করবার জন্যে তোমার ডাক পড়েছে। তোমার হাতের শিক-কাবাব নইলে কর্তার ফুর্তিই জমে না যে।

করিম দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল

করিম। দাও তা হ'লে শিকগুলো, মাংসটা গেঁথে ফেলি চটপট।

শিবু শিক দিল, করিম মাংস গাঁথিতে লাগিল

শিবু। এখানে টেবিলটা ময়লা করবে কেন, চল না, রান্নাঘরে ব'সে গাঁথবে।

করিম। রান্নাঘরে যা ধোঁয়া করেছ তুমি!

শিবু। কয়লার আগুন দিয়েছি যে, যাই একটু হাওয়া করি গিয়ে, মদও আনা হয়নি এখনও। তুমি মাংসটা গেঁথে নিয়ে চটপট এস।

গমনোদ্যত

করিম। আরে আরে, শোন না—[বাম চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া] চিড়িয়া ফাঁসল কি ক'রে ?

শিবু। বাবুর ওই যে একটি নতুন মোসাহেব জুটেছে আজকাল—

করিম। কে, পান্নালালবাবু ?

শিবু। হ্যাঁ। উনিই উড়িয়ে এনেছেন আজ সন্ধ্যেবেলা।

করিম। [সাগ্রহে] কোথা থেকে ?

শিবু। আমাকে জিজ্ঞেস করো না, আমি কিছু জানি-টানি না।

করিম। তুমি বাবা পুরানো ঘুঘু, তুমি জান না!

শিবু মুচকি হাসিল

শিবু। মাইরি বলছি, কালীর কসম। আমি চাকর মনিষ্যি, সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না।

করিম। তবু—

শিবু। যেটুকু জানি, সেটুকু হচ্ছে এই—সকালে বৈঠকখানা ঝাড়পোঁছ করি, এমন সময় এক টেলিগেরাপ এল। জীবনধনবাবু তখন সেখানে ব'সে। টেলিগেরাপ প'ড়ে বাবু আমাকে বললেন, ওরে, পালকির বেয়ারাগুলিকে ব'লে দে, সন্ধ্যের সময় যেন তারা পালকি নিয়ে ইষ্টিশানে থাকে, জেনানি সোয়ারি আসবে। আর তুই বাগানবাড়িটা পরিষ্কার ক'রে রাখিস।

শিবু একবার পর্দার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া
নিম্নকণ্ঠে পুনরায় শুরু করিল

আমি বললাম বাগানবাড়িতে তো জেনানি রাখবার মত ঘর নেই, মাঝের হল-ঘরটি ছাড়া সব ঘরের খাপরা নাবানো হয়েছে। বাবু ধমকে উঠলেন, বললেন, ওই হল-ঘরেই ফরাসের চাদর টাঙিয়ে একটা পর্দার ব্যবস্থা ক'রে রাখ।

পুনরায় পর্দার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিল।

করিম। [মাংস গাঁথিতে গাঁথিতে] তারপর?

শিবু। তারপর আর কি, সন্ধ্যের সময় পালকি এসে ওই পেছনের দরজাটায় লাগল, পান্নালালবাবু এসে কি একটু ফুসফুস গুজগুজ করলেন, চিড়িয়া এসে খাঁচায় ঢুকল। আমি ঝি-মাগীকে দিয়ে এক বালতি জল, একটা ঘটি আর কিছু জলখাবার পাঠিয়ে দিলাম। [হাত উল্টাইয়া] কত্তার ইচ্ছেয় কম্ম। যেমন যেমন বলেছিলেন, তেমনই তেমনই করেছি; তোমাকেও খবর দিতে বলেছিলেন, তুমিও এসে গেছ; যাই এবার, দেখি আঁচটার কতদূর।

গমনোদ্যত

করিম। আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আসল খবরটাই তো বললে না।

শিবু। [সবিস্ময়ে] আবার কি! যা জানি তা তো বললাম।

করিম। [ভুরু নাচাইয়া] মানে, চিড়িয়াটি কি রকম? বুলবুল, না ছাতারে?

শিবু। [মাথা নাড়িয়া] জানি না ভাই।

করিম। [অবিশ্বাসভরে] আরে যাও যাও।

শিবু। সত্যি বলছি, কালীর কসম। তবে পর্দার ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, বাগ্দী-ক্যাওড়া নয়, ভদ্রলোকের মেয়ে।

করিম। [লুব্ধ আগ্রহে] বল কি?

শিবু। তাই তো মনে হয়।

ভুট্টা নামক বালক-ভৃত্য প্রবেশ করিল

ভুট্টা। এই পেঁপে-বাটাটা মাংসে পড়ে নি!

করিম। সেকি, কোথায় ছিল ওটা এতক্ষণ?

ভুট্টা। রান্নাঘরের কোণের দিকটায় ছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

করিম। একটা শিক তো গাঁথা হয়ে গেছে। আচ্ছা দে, বাকি মাংসটায় মিশিয়ে দিই।

মিশাইয়া দিল

শিবু। তুই উহুনটায় হাওয়া কর গিয়ে, আমি যাচ্ছি।

ভুট্টা চলিয়া গেল

করিম। বাগ্দীই হোক, ক্যাওড়াই হোক, আর ভদ্দরলোকই হোক, শেষ পর্যন্ত তো আমাদের ভোগেই লাগবে।

হঠাৎ ক্যাঁক ক্যাঁক করিয়া হাসিয়া উঠিল

শিবু। [নিম্নকণ্ঠে] আরে, চুপ, চুপ, শুনতে পাবে যে, পাশেই রয়েছে।

পর্দার ওপাশে চেয়ার সরানোর শব্দ পাওয়া গেল। উভয়েই সেদিকে সচকিত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ

করিম। নিস্তারিণীটাকে আজকাল দেখলে কিন্তু কষ্ট হয়। দেখেছ ইদানীং তাকে তুমি ?

শিবু। দেখেছি।

করিম। গায়ে চাকা চাকা কি বেরিয়েছে বল দিকি ?

শিবু। [নির্বিকারভাবে] কি আবার, কুট।

করিম। ক্যাওড়ার মেয়ে হ'লে কি হয়, রূপ ছিল বটে এককালে। প্রথম বাবুর কাছে এল—ওরে ব্বাস রে—চোখ-ঝলসান রূপ !

শিবু। হ'লে কি হয়, শেষ পর্যন্ত যে ওরা গিয়ে ব্যবসা খোলে ! ব্যবসা খাঁহাতক খুলেছে কি মরেছে !

করিম। কি করবে বল, বাবু তো আর চিরকাল পোষে না। পেট চালাতে হবে বেচারীদের !

শিবু। [দরজার পানে চাহিয়া] ওই কত্তা এসে পড়লেন, এখনও মদ আনা হয় নি। চল্ চল, যেটুকু বাকী আছে রান্নাঘরে বসেই গেঁথো।

উভয়ে চলিয়া চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে শিবু ঝাড়ন দিয়া টেবিলটা ঝাড়িয়া দিল। কথা কহিতে কহিতে জমিদার এবং মোসাহেব পান্নালাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পান্নালাল একটু রোগা-গোছের, ছিমছাম, চোখে চশমা, গোঁফদাড়ি কামানো। জমিদারটি খুব মোটা বর্তুলাকার ব্যক্তি। তিন থাক চিবুকের উপর কটা

www.boiRboi.blogspot.com

রঙের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথার সামনের
দিকটায় টাক

জমিদার। ওসব কবিত্ব-টবিত্ব রাখ তুমি, মনে ঘাঁটা পড়ে গেছে বাবা। আগে ইতিহাসটা শুনি।

পান্নালাল। ইতিহাস তো বললাম সংক্ষেপে।

জমিদার। সংক্ষেপে-টংক্ষেপে চলবে না, বিশদভাবে শুনতে চাই। ইতিহাসটা পুরোপুরি না শুনে আমি ছুঁচ্ছি না ওসব। সেবারে মনে নেই, এক পুলিস-কেসেই ফেঁসে গেলাম বাবা, হাজারখানেক টাকা লম্বা হয়ে গেল ঘুষঘাষ দিতেই। এস, বসা যাক, ভাল ক'রে সব গুছিয়ে বল দিকি শুনি। হ্যাংলার মতো হামলে পড়বার বয়স গেছে—হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ [হাসিলেন]।

পান্নালাল। বেশ শুনুন তা হ'লে।

চেয়ার টানিয়া দুজনে উপবেশন করিলেন

জমিদার। দাঁড়াও, সিগার বার করি।

পকেট হইতে সিগার-কেস বাহির করিলেন

দেশালাইটা কোথা গেল ?

এ পকেট ও পকেট খুঁজিতে লাগিলেন

ঠিক ফেলে এসেছি, এমন ভুলো মন হয়েছে আজকাল। ওরে শিবে!

পান্নালাল পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিলেন

পান্নালাল। এই যে আমার কাছে কাছে।

জমিদার। দাও। এইবার আনুপূর্বিক সব কাহিনীটি বল দিকি বাবা। ভদ্দরলোকের মেয়ে তোমার খপ্পরে পড়ল কি ক'রে ?

পান্নালাল। ওই যে বললাম, শেয়ালদা স্টেশনে পুলিসের হাতে ধরা প'ড়ে কাঁদছিল। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল আর কি।

জমিদার। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল ? তুমি জানলে কি ক'রে ?

পান্নালাল। পুলিসের কাছে শুনলাম, রেল-লাইনে মাথা দিয়েছিল।

জমিদার। তারপর ?

পান্নালাল। তারপর আমি পুলিসকে কিছু দিয়ে-টিয়ে উদ্ধার করলাম। একটা হোটেলে নিয়ে খাওয়ালাম বোঝালাম—

জমিদার। [সকৌতুকে] কি বোঝালে ?

পান্নালাল। বোঝালাম যে, এত অল্প বয়সে মরবার দরকার কি! চল, আমি তোমাকে একটি চাকরি জুটিয়ে দিচ্ছি আমার এক জমিদার বন্ধুর বাড়ীতে।

জমিদার। আরে এটা তো শেষের ঘটনা। গোড়া থেকে সব বল না, শুনি। শেয়ালদা স্টেশনেই বা এল কি ক'রে, তার আগেই বা কোথা ছিল? দাঁড়াও, এটা আগে ধরিয়ে নিই, তুমি নাও একটা।

জমিদারবাবু সিগার ধরাইতে লাগিলেন। দেখা গেল Alcoholic tremor আছে, হাত কাঁপে। পান্নালালও একটি সিগার লইয়া ধরাইলেন

পান্নালাল। [ধোঁয়া ছাড়িয়া] সেই মামুলি কাহিনী আর কি।

জমিদার। কি?

পান্নালাল। মেয়ের বয়স হ'ল, কিন্তু পাত্র জুটল না, বাপ মা বিয়ের জন্যে ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগল—

জমিদারবাবুর সিগারটা ঠিকমত ধরিতেছিল না। তিনি তাহা ধরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন

জমিদার। কি বললে, ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগল, আই সি, তারপর?

পান্নালাল। তারপর যা হয়। কেউ চাইলে টাকা, কেউ চাইলে রূপ, কেউ চাইলে গান, কেউ চাইলে বাজনা, কেউ চাইলে নাচ, কেউ চাইলে লেখাপড়া, কেউ চাইলে সব—

জমিদারের সিগার ঠিক ধরে নাই, নিবিয়া গেল। তিনি কম্পমান হস্তে পুনরায় তাহা ধরাইতে ধরাইতে গল্পে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন

অর্থাৎ বরপক্ষের চাহিদা সবই প্লাসের কোঠায় আর মেয়েপক্ষের দিকে সবই মাইনাস। সুতরাং বিয়ে হ'ল না, বয়স বাড়তে লাগল।

জমিদার। [এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া] এইবার ধরেছে। কি বললে, বয়স বাড়তে লাগল, আই সি। [সহসা] মেয়েটি দেখতে কেমন?

পান্নালাল। এস না, দেখবে?

জমিদার। না, এখন থাক। এই অপেক্ষা করে থাকার মধ্যেই একটা কিক আছে হে, দেখলেই তো সব ফুরিয়ে গেল—হঁ হঁ হঁ হঁ। যাক, ইতিহাসটা আগে শুনে নিই। ভাল কথা, ওকে ওখানে বসতে-টসতে দিয়েছ তো ভাল ক'রে?

পর্দার দিকে চাহিলেন

পান্নালাল। একটা চেয়ার দিয়েছি।

জমিদার। বেশ, এইবার বল শুনি। তারপর কি হ'ল ?

পান্নালাল। তারপর একটু রোমাণ্টিক ব্যাপার ঘটল।

জমিদার। কি রকম ?

পান্নালাল। স্বাভাবিক নিয়মে মেয়েটি একটি প্রতিবেশী যুবকের প্রেমে পড়ল।

জমিদার। [হাসিলেন] হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ।

পান্নালাল। তারপরই কিন্তু হ'ল মুশকিল, মনে মিলল, কিন্তু জাতে মিলল না।

জমিদারবাবু এ কথায় অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন। হাস্যবেগ দমন করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইতে পারিলেন না—এঃ হে হে হে হে হে করিয়া উচ্চকণ্ঠে ফাটিয়া পড়িলেন। শিবু এক বোতল হুইস্কি ও কয়েকটি গ্লাস লম্বা টেবিলটিতে রাখিয়া গেল।

জমিদার। [সিগারের ছাই ঝাড়িয়া] বেড়ে বলেছ কথাটা হে, মনে মিলল, কিন্তু জাতে মিলল না, অ্যাঁ! তারপর ?

পান্নালাল। উধাও হ'ল একদিন দুজনে।

জমিদার। উধাও হ'ল! বল কি ?

পান্নালাল। হ্যাঁ।

জমিদারবাবু বার্তাটি উপভোগ করিলেন এবং মৃদু হাসিয়া বলিলেন

জমিদার। ঠেকল গিয়ে কোথায় ?

পান্নালাল। কাশীতে।

জমিদার। পুণ্য বারাণসী তীর্থে। [সহসা চক্ষু দুইটি বড় করিয়া] খান জায়গায় গিয়ে পড়ল বল।

পান্নালাল। [মুচকি হাসিয়া] সে কথা আর বলতে! খান খান হয়েও গেল।

জমিদার। কি রকম! এ যে রীতিমত উপন্যাস ক'রে তুললে তুমি বাবা? থাম থাম, এটা আবার নিবে গেল, ধরিয়ে নিই, আর গলাটাও একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক, কি বল অ্যাঁ? ওরে শিবু!

কম্পমান হস্তে সিগার ধরাইতে লাগিলেন। কয়েক বোতল সোডা লইয়া হন্তদন্তভাবে শিবু প্রবেশ করিল

তুই সোডা আনতে গেছলি বুঝি? ব্যাটা আগে থাকতে কিছু এনে রাখবে না। বোতলটা খোল্।

শিবু। খোলাই আছে হুজুর।

শিবু হুইস্কির বোতল এবং তিনটি গ্লাস আনিয়া গোল টেবিলটাতে রাখিল।

জমিদারবাবু দুইটি গ্লাসে মদ ঢালিলেন। শিবু সোডা খুলিল।

জমিদার। [তৃতীয় গ্লাসটি দেখাইয়া] এটা আবার কার জন্যে?

শিবু। জীবনধনবাবুর আসবার কথা ছিল।

জমিদার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তো, সে এখনও এল না কেন? নে, ঢাল।

শিবু সোডা ঢালিয়া চলিয়া গেল। দুইজনে দুইটি গ্লাস তুলিয়া 'সিপ' করিতে লাগিলেন

এইবার বল শুনি। খান খান হয়ে গেল কি রকম?

পান্নালাল। মানে, কাশীর পাণ্ডার হাতে পড়ল আর কি। পাণ্ডাগুলো তো গুণ্ডারই নামান্তর।

জমিদার। আর সেই ছোকরা?

পান্নালাল। ছোকরা আর কি করবে, তার না ছিল ট্যাঁকের জোর, না ছিল গায়ের জোর।

জমিদার। প্রেমের জোর তো ছিল। কাশী পর্যন্ত টেনে তো নিয়ে গেছল বাবা—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—তারপর?

পান্নালাল। মেয়েটি পাণ্ডাদেরই আশ্রয়ে রইল দিনকতক।

জমিদার। আশ্রয়ে—অ্যাঁ!

মুচকি হাসিলেন। চর্ব্বিস্ফীত গাল দুইটি আরও স্ফীত হইয়া উঠিল

পান্নালাল। দিন দশেক ছিল সেখানে। তারপরে অসহ্য হওয়াতে পালাল একদিন।

জমিদার। পালাল! এবার কার সঙ্গে?

পান্নালাল। এবার একা, রাত্রে চুপি চুপি দরজা খুলে—

জমিদার পুনরায় সিগার ধরাইতেছিলেন

জমিদার। মেয়েটির তা হ'লে খুব ইয়ে আছে বল। [সহসা] আচ্ছা, এত সব খবর তুমি পেলে কি করে?

পান্নালাল। মেয়েটি সব বলেছে আমাকে।

জমিদার। মেয়েটির বাপ-মা কোন খোঁজ করেনি?

পান্নালাল। করেছিল কি না মেয়েটি জানে না।

জমিদার। মেয়েটিও বাপ-মাকে কিছু জানায় নি?

পান্নালাল। জানাবে কি ক'রে? নিরক্ষর পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, নিঃসম্বল। তা ছাড়া অত বড় কলঙ্কের পর—

জমিদার। যাক্, তারপর?

পান্নালাল। পালিয়ে যাবার পর সন্তোষবাবু ব'লে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল।

জমিদার। ছোক্‌রা, না বুড়ো?

পান্নালাল। বুড়ো।

জমিদার। বুড়ো! তারপর?

পান্নালাল। বুড়ো আশ্রয় দিলে।

জমিদার। আশ্রয় দিলে মানে? খোলসা ক'রে বল না বাবা!

পান্নালাল। মানে চাকরাণী হিসাবে বাহাল করলে।

জমিদার। [সহাস্যে] পাটরাণী না ক'রে চাকরাণী করবার মানে? ধার্মিক ব্যক্তি, না মেয়েটা কুৎসিত?

পান্নালাল। ধার্মিক ব্যক্তি। কিন্তু—

হাসিলেন

জমিদার। আবার 'কিন্তু' কেন বাবা? মুখোসের তলা থেকে লেলিহান জি-উ-হ্বা দেখা গেল নাকি, অ্যাঁ?

পান্নালাল। না, ধার্মিক কিছু করবার ফুরসুতই পেলেন না, তাঁর এক গোঁফ-ছাঁটা ভাগ্নে ছিল, সেই ব্যাটাই খেলতে লাগল।

জমিদার। গোঁফ-ছাঁটা? দেখেছ নাকি তাকে?

পান্নালাল। ফোটো দেখেছি। ওর কাছে তার একখানা ফোটো আছে।

জমিদার। ওরে ব্বাবা! ফোটো পর্যন্ত রয়েছে—ভাগ্নের সঙ্গে ব্যাপার তা হ'লে বেশ ঘনীভূত হয়েছিল বল।

পান্নালাল। খুব। বিয়ে করবে আশ্বাস দিয়ে ছোকরা ওকে নিয়ে কলকাতায় ভেগেছিল।

জমিদার। [চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া] বটে! তারপর? [সহসা] ওরে শিবু!

পর্দার ওপারে ঘট করিয়া একটা শব্দ হইল। শিবু আসিয়া প্রবেশ করিল।

শিবু। কি বলছেন হুজুর ?

জমিদার। শিক-কাবাবের কতদূর ?

শিবু। আজ্ঞে দেখি।

চলিয়া গেল

জমিদার। জীবনধনের এখনও পর্যন্ত কোন পাত্তা নেই, কেন বুঝতে পারছি না! মেয়েমানুষের গন্ধ পেয়েছে, তার এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।

পান্নালাল। জীবনধন জানে নাকি ?

জমিদার। জানে বৈকি। তোমার টেলিগ্রাম যখন এল, তখন তো সে আমার কাছে বসে। ঝানু লোক—মালটাল টানতে গেছে বোধ হয়। আসবে ঠিক। সে থাকলে আরও জমত। তারপর কি হ'ল ?

পান্নালাল শূন্য গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া দিলেন

পান্নালাল। ভাগ্নে তো ভাগলেন কলকাতায়। সঙ্গে সঙ্গে মামাও ছুটলেন তার পিছু-পিছু।

জমিদার। সেই ধার্মিক মামা ?

পান্নালাল। হ্যাঁ।

জমিদার। তাঁর ছোটবার হেতুটা ?

পান্নালাল। ধার্মিক ব'লেই। তিনি ছুটলেন ভাগ্নেকে ফিরিয়ে আনতে, পাছে সে বিয়ে ক'রে ফেলে।

জমিদার। আই সি।

শূন্য গ্লাসটি রাখিয়া দিলেন

ভাগ্নে ফিরে এল ?

পান্নালাল। নিশ্চয়। অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে।

জমিদার। [হাসিলেন] হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ তারপর ?

পান্নালাল। মেয়েটা রইল কলকাতায়।

জমিদার। কার কাছে ?

পান্নালাল। সন্তোষবাবু তাকে এক অবলা-আশ্রমে ভর্তি করে দিয়ে এলেন।

শিবু আসিয়া প্রবেশ করিল

শিবু। শিক-কাবাবের এখনও একটু দেরি আছে বাবু, এখনও ঠিক নরম হয়নি।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

জমিদার। (ধমকাইয়া) নবম্ম আবার কোন্ জন্মে হবে? মদ ফুরিয়ে গেলে ও গুষ্টির পিণ্ডি নিয়ে কি করব আমি? সেবারেও ঠিক এই কাণ্ড হ'ল।

গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিলেন

নে, সোডা দে। তুমি আর একটু নেবে নাকি পান্নালাল?

পান্নালাল। না থাক, পরে নোব।

শিবু সোডা ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল

জমিদার। [বেশ বড় এক চুমুক পান করিয়া] হ্যাঁ, তারপর? অবলা-আশ্রমে ভর্তি করে দিলে, তারপর?

পান্নালাল সিগার ধরাইল

পান্নালাল। তারপর আর কি, তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিকুণ্ডে। সেখানে এক ব্যাটা রাঘব-বোয়াল ম্যানেজার ছিল—

জমিদার মদ 'সিপ' করিতেছিলেন, এ কথা শুনিয়া আনন্দে 'বিষম' খাইলেন

জমিদার। হে হে হে হে হে—রাঘব-বোয়াল—অ্যাঁ—বেড়ে উপমাটা দিয়েছ তো হে—না চিবিয়েই গেলে, অ্যাঁ?

পান্নালাল উপমা-প্রয়োগের কৃতিত্বটা স্মিতমুখে উপভোগ করিতে লাগিলেন

ম্যানেজার রসিক ব্যক্তি বল। চিবিয়ে সব জিনিস যে গলাধঃকরণ করা যায় না, সেটা জানে, অ্যাঁ?

টলিতে টলিতে অসম্বৃত-বেশবাস মুক্তকচ্ছ জীবনধন প্রবেশ করিলেন।

বদলে বোতাল, কণ্ঠে গান

জীবনধন। [সুরে] গয়লা দিদিলো, তোর ময়লা বড় প্রাণ—

জমিদার। এস এস, জীবনধন এস, তোমাকেই খুঁজছিলাম এতক্ষণ। ভয় হচ্ছিল কোথাও আটকেই গেলে বুঝি।

জীবনধন। [জড়িত কণ্ঠে] যৌবন-জলতরঙ্গ রুধিবে কে—

জমিদার। ব'স ব'স।

জীবনধন চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন

জীবনধন। সাড়া পেয়েই কোথায় সরালে বাবা পানু?

পান্নালাল মুচকি হাসিলেন

জমিদার। আরে, ব'স না আগে।

জীবনধন ধপাস করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন

জীবনধন। হুকুম তা তামিল করলাম ইন্দ্রদেব, এইবার অপ্সরাটিকে আসতে বলুন।

জমিদার। হচ্ছে হচ্ছে, সব হচ্ছে! ততক্ষণ এক আধ পেগ চালাও না।

জীবনধন। তথাস্তু।

জমিদার। শিবু তোমার জন্য আলাদা একটা গেলাস রেখে গেছে। এই নাও।

তৃতীয় গ্লাসে মদ ঢালিলেন

সোডা চাই?

জীবনধন। না। স্বয়ং সুজলা ধান্যেশ্বরী উদরে বিরাজ করছেন—জলের অভাব নেই। নির্জলাই দিন।

নির্জলা পান করিয়া মুখবিকৃতি করিলেন

জমিদার। হঁ্যা, অবলা-আশ্রমে কি হ'ল তারপর? রাঘব-বোয়াল করলে কি?

পান্নালাল। রাঘব-বোয়াল আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, আমাকে যদি না গিলতে দাও, পাঞ্জাবীর কাছে বিক্রি ক'রে দোব।

জমিদার। [সবিস্ময়ে] পাঞ্জাবীর কাছে?

জীবনধন। [জড়িত কণ্ঠে বিড় বিড় করিয়া বলিল] পাঞ্জাবীরা গুড ট্যাক্সি-ড্রাইভার—বেপরোয়া হাঁকায় বাবা—

জমিদার মুচকি হাসিলেন

জমিদার। পাঞ্জাবী মানে?

পান্নালাল। অবলা আশ্রমগুলো থেকে পাঞ্জাবীরা মেয়ে কিনে নিয়ে যায় যে, বিয়ে করবে ব'লে। বেশ দাম দিয়ে কেনে, এক হাজার দেড় হাজার পর্যন্ত দাম দেয়।

জমিদার। তাই নাকি? জানতাম না তো এ কথা। তুমি জানতে জীবনধন?

জীবনধন। [হাতজোড় করিয়া] যদি অভয় দেন, একটি কথা নিবেদন করি।

জমিদার। কি?

জীবনধন। অত্যন্ত বাজে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে হুজুর। পাঞ্জাবী প্রসঙ্গে আলোচনা চলবে জানলে কোন্ শালা—

www.boiRboi.blogspot.com

জমিদার। আহা, আর এক পেগ চড়াও না, ততক্ষণ আমরা গল্পটা শেষ করি।

জীবনধনকে আরও খানিকটা নির্জলা হুইস্কি ঢালিয়া দিলেন

আর কতটা বাকী পান্নালাল ?

পান্নালাল। আর বেশি নেই।

জীবনধন। [সানুনয়ে] তাড়াতাড়ি শেষ কর পানু, লক্ষ্মী ধন আমার।

করিম শিক-কাবাব লইয়া প্রবেশ করিল

করিম। একটা শিক নিয়ে এপুম, হুজুররা একটু চেখে দেখুন তো। ওরে শিবু, প্লেট নিয়ে আয় তিনখানা।

শিবু তিনখানি প্লেট দিয়া চলিয়া গেল, করিম তিনটি প্লেটে শিক-কাবাব ভাগ করিয়া দিল

জীবনধন। [এক কামড় দিয়া] উঃ, বড় গরম যে! উঃ উঃ, এ যে নেশা ছুটিয়ে দিলে বাবা—উঃ।

পান্নালাল। [সামান্য ভাঙ্গিয়া লইয়া চিবাইতে চিবাইতে] এখনও একটু কসর আছে হে।

জমিদার বাম হাত দিয়া খানিকটা তুলিয়া ডান হাত দিয়া টানিয়া দেখিলেন

জমিদার। হ্যাঁ, বেশ কসর আছে এখনও। নিয়ে যা, আরও খানিকটা হবে।

পান্নালাল ও জমিদার প্লেট ঠেলিয়া দিলেন। জীবনধন কিন্তু প্লেট ছাড়িলেন না।

জীবনধন। আমার এই বেশ লাগছে বাবা, বেড়ে ছাল ঝাল হয়েছে। করিমের মসলার হাতটি একেবারে নিখুঁত।

চক্ষু বুজিয়া চিবাইতে লাগিলেন। করিম দুইটি প্লেট লইয়া চলিয়া গেল

জমিদার। [পান্নালালকে] তারপর ?

পান্নালাল। গতিক খারাপ দেখে মেয়েটি একদিন অবলা-আশ্রমের পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাল।

জমিদার। আবার পালাল? এ তো খুব তুখোড় মেয়ে দেখছি হে! পাঁচিল ডিঙিয়ে, অ্যাঁ ?

পান্নালাল। পাঁচিল ডিঙিয়ে।

জীবনধন। [সানুনয়ে] সংক্ষেপ কর বাপ পানু।

www.boiRboi.blogspot.com

জমিদার। তারপর ?

পান্নালাল। তারপর কলকাতার জনসমুদ্রে ঘোলটান খেতে খেতে শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে হাজির এবং সেখানে—

জমিদার। এবং সেখানে চারিচক্ষের মিলন, আর অমনই আমাকে টেলিগ্রাম—এহ্ এহ্ এহ্ এহ্ ! বুদ্ধিকে তোমার বলিহারি !

পান্নালাল স্মিতমুখে সিগার ধরাইতে লাগিলেন

পান্নালাল। ইতিহাস তো শুনলে, এইবার একটু আলাপ-পরিচয় হোক।

জমিদার। আলাপ-পরিচয় করতে পারি, কিন্তু আর কিছু নয়। আজই সরিয়ে ফেল ওকে। [সহসা] তুমি আমাকে কি ঠাউরেছ বল দিকি ?

পান্নালাল একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন

পান্নালাল। তুমি একদিন বলেছিলে কিনা যে, যদি ভাল জিনিস কখনও চোখে পড়ে—

জমিদার। এর নাম ভাল জিনিস ! সাত ঘাটের জল খাওয়া রাবিশ দাগী মাল। ছি ছি ছি ছি।

জীবনধন। আরে বাবা, বারই কর না, দেখি জিনিসটা।

পর্দার ওপার হইতে চেয়ার সরানোর একটা শব্দ হইল। পর্দাটা একটু নড়িয়া উঠিল

জমিদার। [চর্বিস্ফীত হাসিয়া হাসিয়া] অধীর আগ্রহে ছটফট করছে ব'লে মনে হচ্ছে যেন !

সহসা জীবনধনের পানে চাহিলেন

আরে, ছি ছি জীবনধন, তুমি করছ কি, কাঁচা মাংসগুলো চিবুচ্ছ ? রক্ত বেরুচ্ছে যে ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে।

জীবনধন। বড় মিঠে লাগছে কিন্তু।

আর একটা শিক লইয়া করিম পুনরায় প্রবেশ করিল

করিম। আগেকার শিকটায় পেঁপে দেওয়া হয় নি, এই শিকটা দেখুন তো হুজুর। শিবু, প্লেট আন।

শিবু প্লেট দিয়া চলিয়া গেল। করিম প্লেটে কাবাব পরিবেশন করিতে লাগিল। জমিদারবাবু তিনটি গ্লাসে আবার খানিকটা করিয়া মদ ঢালিয়া লইলেন

www.boiRboi.blogspot.com

জমিদার। ওরে শিবু।

শিবু। [নেপথ্য হইতে] আজ্ঞে যাই।

কয়েক বোতল সোডা লইয়া প্রবেশ করিল

জমিদার। সোডা ভাঙ।

শিবু সোডা ভাঙিয়া জমিদারবাবুর হাতে দিল, তিনি নিজের গ্লাসে ও পান্নালালবাবুর গ্লাসে পরিমাণমত সোডা ঢালিয়া লইলেন

পান্নালাল। [শিক-কাবাব খাইয়া] এইবার ঠিক হয়েছে।

জমিদার। [একটু চাখিয়া] হুঁ।

জীবনধন। [বেশ খানিকটা মুখে পুরিয়া, নিমীলিত চক্ষে] দীর্ঘজীবী হও বাপ করিম, তুমি ছদ্মবেশী অন্নপূর্ণা বাপ।

করিম ও শিবু চলিয়া গেল। তিনজনে জমাইয়া শিক-কাবাব সহযোগে মদ্যপান করিতে লাগিলেন

পান্নালাল। এইবার ডাকব ?

জীবনধন। ডাক না বাপ। [সুর করিয়া] সময় বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়—

জমিদার। ডাকতে পার, তবে আমি ওসবের মধ্যে নেই। ওসব দশ-হাত-ঘোরা জিনিস টাচ করি না আমি।

পান্নালাল। [হাসিয়া] আলাপ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি ?

জীবনধন। কিস্সু ক্ষতি নেই।

পান্নালাল। ডাকি তা হ'লে ?

জমিদার। ডাক।

পান্নালাল। সৌদামিনী !

পর্দার ওপার হইতে কোন উত্তর আসিল না

সৌদামিনী !

কোনও উত্তর নাই

ঘুমিয়ে পড়ল নাকি !

পান্নালাল উঠিয়া গেলেন ও পর্দা ফাঁক করিয়া চীৎকার করিলেন

একি !

জমিদার। কি ?

www.boiRboi.blogspot.com

তিনিও উঠিয়া গেলেন ও অন্য পর্দাটা ফাঁক করিয়া ধরিলেন। দেখা গেল, শূন্যে শেমিজ-পরা একটি নারীদেহ বরগা হইতে ঝুলিতেছে। পরনের শাড়ি খুলিয়া সৌদামিনী গলায় দড়ি দিয়াছে। জীবনধনও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রক্তাক্ত মুখে ভীত বিস্মিত নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন

জীবনধন। গলায় দড়ি দিয়েছে—অ্যাঁ, সেকি!

যবনিকা

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

কবিতা : প্রবন্ধ

www.boiRboi.blogspot.com

নূতন বাঁকে

www.amarboi.blogspot.com

নূতন আকাশে যবে কল্পনা আমার
ফুটেছিল আকাশ-কুসুমে,
তোমারও ময়ূরপঙ্খী গিয়েছিল ভাসিয়া ভাসিয়া
নূতন সাগরে
(হয়তো সুনীল তাহা, হয়তো ফেনিল)
জানি না তা ঠিক।

শুধু জানি,
ঝাউবনে জাগায়ে মর্মর
আনন্দিত গন্ধবহ
সেদিন যে বার্তা এনেছিল,
মেঘে মেঘে অনির্দিষ্ট বর্ণ-বীথিকায়
হয়তো বা ছিল তার ছবি,
কিম্বা ছিল কমল-কোরকে
আমরা তা শুনি নাই।

তুমি একা বসেছিলে ময়ূরপঙ্খীর বাতায়নে আনমনা,
(হয়তো শুনিতেছিলে সেই নব সাগরের নীবন কল্লোল)
আমি ছিনু কল্পনা-ফানুসে
অকস্মাৎ-আবিষ্কৃত নূতন আকাশে।
আমাদের কথা
মূর্ত হ'ত একদা যা পার্থিব ভাষায়
দেখিলাম উড়িয়া চলেছে দূরে দূরে
অপার্থিব কোন এক মহা উৎক্রোশের
আন্দোলিত ডানায় ডানায়
নব সুরে, নব ছন্দে।

ললিতা ঘাট

www.banglabooks.blogspot.com

আলো-ছায়া-জাফরির আড়ালে
কে তুমি আসিয়া বল দাঁড়ালে
ওগো, চঞ্চলা মৃদুহাসিনী
ওই তব অভিনব গুণ্ঠন
জানি জানি নহে অবগুণ্ঠন
নহ তুমি কারাগারবাসিনী।

আজি সখি, জানি না কি মায়াতে
আলো-আঁধারির ধূপছায়াতে
লভিলে কি অপরূপ কায়া গো
কি যে তুমি পারি না তা বলিতে
ওগো আলো-ছায়াময়ী ললিতে
নহ আলো নহ তুমি ছায়া গো।

আলো-ছায়া উভয়েরই মহিমা
দিয়েছে তোমারে সীমা-অসীমা
আকাশ নেমেছে এসে গলিতে
অধরার নন্দিনী ললিতা
হ'লে আলো-ছায়া সঙ্কলিতা
নেমে এলে কবি-মন ছলিতে।

পাথরে-বাঁধানো বট-গাছেতে
যোগ দিলে কিশলয় নাচেতে
সুর দিল কাকলির ছন্দে
পাথরকে মনে হল শিবই তো
প্রস্তর হ'ল সঞ্জীবিত
হৃদয় ভরিল মহানন্দে।

নর-নারী বানর বা ষণ্ড
যোগী ভোগী আসল বা ভণ্ড
সবারে দেখিছে চেয়ে ললিতা
চোখে-মুখে হাসি ওঠে ফুটিয়া
অঞ্চল পড়ে যেন লুটিয়া
মৃদু সমীরণ সঞ্চলিতা।

www.boiRboi.blogspot.com

পঁচিশে বৈশাখ

আকাশে আকাশে নিত্যকালের যে অভিযান
কুসুমে কুসুমে যাহার স্বপন গন্ধ-ভরা,
যে মহাগান
সূর্য তারার ছন্দ ভরা
স্মরণ-সভায় জানি না তাহার কোথায় স্থান
হায় রে, ব্যাকুল বসুন্ধরা!

তোমার চোখের জলেতে লেগেছে তাহারই রং,
তোমার শোকের ভাষায় শুনি যে ছন্দ তার,
সেই সারং
কাঁপায় রৌদ্র অন্ধকার,
উজ্জ্বল রবি উজ্জ্বলতর হয় বরং,
হয়নি যাত্রা বন্ধ তার।

গঙ্গার কূলে জ্বলেনি জ্বলেনি তাহার চিতা,
সন্ধ্যার বুকে জ্বলে ছিল শুধু সূর্য জ্বালা,
রূপের গীতা
শেষ করেছে যে একটি পালা
নিত্যকালের আকাশে ওই যে দীপান্বিতা
সাজায় তাহার দীপালি মালা।

নিত্যকালের মাটিতে ওই যে শ্যামলী বালা
তাহারই পথেতে পাতিয়া রেখেছে চোখের চাওয়া,
ফুলের মালা
দুলায় বুকেতে দখিন হাওয়া,
তাহারি লাগিয়া গভীর নিশীথে প্রদীপ জ্বালা
নিবিড় ছায়াতে দিবস হাওয়া।

গান্ধীজী

অনেক বড় অনেক উঁচু পাহাড়
চূড়া তাহার নাই
বেড়ায় খুঁজে কোথায় সীমা তাহার
অসীম নিজে তাই।

নীল আকাশে তাহার মালা দোলে
সে সব ফেলে কোথায় গেছে চলে'
কোথায় গেছে উঠে
অন্তহীনের নাগাল পাবে বলে'
আলোক মরে ছুটে।

আকাশ-ভরা মনি-মানিক জ্বলে
জয়-ধ্বনি ওঠে ভূমণ্ডলে।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি ভিড়ে
দেখি তিনি আমার ভাঙা নীড়ে!
কিসের আশ্বাসে?
অতি তুচ্ছ ফাটা কাচের চিড়ে
ইন্দ্রধনু হাসে।

ঢাকছে ধূলি শ্যামল তৃণ-দলে
জয়-ধ্বনি ওঠে জলে স্থলে।

www.boiRboi.blogspot.com

মহাপুরুষ ?   প্রশ্ন করি কা'কে !
হয়তো হবে তাই
ইচ্ছে করে প্রণাম করি তাঁকে
সাহস নাহি পাই।

www.boiRboi.blogspot.com

রাজপথ

সূর্যালোকে দীপ্ত কভু—সূচীভেদ্য কভু অন্ধকার,
আলোক-আঁধার-দ্বন্দ্বে অস্বচ্ছন্দ কভু তার সুর,
সভ্যতা নির্মিত আলো পরাইলে কভু অলঙ্কার,
জ্যোৎস্নার কিরণ পাতে রাজপথ কভু স্বপ্নাতুর।

রাজা-প্রজা উচ্চ-নীচ সুখী-দুঃখী উদাসী-উন্মুখ,
দৃশ্য ও অদৃশ্য ধারা বহিতেছে নিত্য নিরন্তর,
চলে পদাতিক রথী অর্থী প্রার্থী ধনী ও ভিক্ষুক,
লক্ষ লক্ষ পদচিহ্ন বিলুপ্ত করিতে পরস্পর।

কত যে আসিল গেল সীমাবদ্ধ করিবে কে তাঁয়।
কত যে আসিবে যাবে কে করিবে গণনা তাহার
কত হর্ম্য ওঠে পড়ে কত ধর্ম মিলিল হেথায়
শোভাযাত্রা শবযাত্রা রাজপথে সবই একাকার।

নির্বিকার রাজপথ চলিয়াছে যে সুদূর পানে,
আকাশের ছায়াপথ বুঝি শুধু সে ঠিকানা জানে।

বিভূতি

অতি কাছাকাছি ছিল সে যখন
দেখি নি তখন কে সে
এখন বহিয়া গিয়াছে লগন
তরণী গিয়াছে ভেসে

এখন তাহারে খুঁজি সব ঠাঁই
আকুল নয়নে কাঁদিছে সবাই
বৃন্দাবনেতে কানু আর নাই
মথুরায় গেছে শেষে।

রাজার দুলাল মোদের কুটিরে
রাখাল সাজিয়া ছিল
সে কথা হায় রে কে যেন মোদের
সহসা বুঝায়ে দিল
আকাশের চাঁদ গ্রামের পুকুরে
হাসিতেছিল যে মায়ার মুকুরে
স্বপন-মরীচি চ'লে গেল দূরে
কে যেন হরিয়া নিল।

মোদের বিভূতি মিশিয়া গিয়াছে
শিবের বিভূতি সনে
এ কথা ভাবিয়া কোনও সান্ত্বনা
পাই না খুঁজিয়া মনে
শুধু মনে পড়ে তার সেই মুখ
সেই আঁখি দুটি চির-উৎসুক
সদা-জাগ্রত সদা-উন্মুখ
আনন্দ-আহরণে।

তাহারে ঘিরিয়া হবে এবে জানি
বহুবিধ বাচালতা
বিজ্ঞ জনের বহু কপচানি
বহু গাথা, বহু কথা
তবু সে ফিরিয়া আসিবে না আর
শূন্যে মিলাবে কথা-ফুৎকার
কমিবে না তাহে হৃদয়ের ভার
ঘুচিবে না তাহে ব্যথা।

www.boiRboi.blogspot.com

তাহার তরণী আসিবে না আর
কখনও মোদের তীরে
এই কথাটাই জাগে বার বার
নানা সুরে ঘুরে ফিরে
চেনার আড়ালে ছিল যে অচেনা
নিজেরে চেনাতে আর ফিরিবে না
শুধিতে হইবে জানি তার দেনা
গোপন নয়ন-নীরে।

www.boiRboi.blogspot.com

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন-কাহিনী পৃথিবীর সুধিসমাজে সুবিদিত। তাঁহার জীবনের তথ্যমূলক ঘটনাবলী সকলেই জানেন। কিন্তু এ কথাটা হয়তো অনেকে জানেন না ঐতিহাসিক তথ্যই জীবনের তত্ত্ব নয়, সেগুলি সংবাদমাত্র। সংবাদের নেপথ্যে যে সংঘাত-প্রতিসংঘাত থাকে, যে আবেগ যে প্রতিভা যে প্রেরণা থাকে তাহার রহস্যই জীবন-রহস্য। সামান্য মানুষের জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটনও সহজ নহে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো বিরাট জীবনের রহস্য উপলব্ধি করা আরও দুরূহ। তাঁহাকে অনেকটা চিনিয়াছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ। পরমহংসদেবের পূর্ণ রূপ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োজন তাহা আমার নাই। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে যতটুকু যেভাবে বুঝিয়াছি তাহাই কেবল আপনাদের নিকট আজ নিবেদন করিব। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। একদল অন্ধ একবার একটি হাতী দেখিতে গিয়াছিল। হাতীটিকে ঘিরিয়া হাত দিয়া দিয়া তাহারা হাতীর স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহারা হাতীর পা-টাই স্পর্শ করিল তাহারা বলিল হাতী থামের মতন, যাহারা কানটা স্পর্শ করিল তাহারা বলিল হাতী কুলার মতন, যাহারা শুঁড়টা স্পর্শ করিল তাহাদের ধারণা হইল হাতী সাপের মতন। আমাদের মতো অল্পবুদ্ধি লোকেরা যখন মহাপুরুষ-জীবন আলোচনা করিতে যায় তখন এইরূপ হাস্যকর ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। তবু যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলিব, নিজের স্বার্থের জন্যই বলিব, কারণ মহাপুরুষের নামকীর্তনই হয়তো আমার অন্ধত্বমোচন করিয়া দিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষ ছিলেন। মনুষ্যত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলি তাঁহার জীবনে, আচরণে ও উপদেশে বিধৃত হইয়া আছে বলিয়াই আমরা তাঁহাকে অবতার বলি।

মনুষ্যত্বের লক্ষণ কি? প্রাণি-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে মানুষও একপ্রকার পশু। পশু হইলেও তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কি সে বৈশিষ্ট্য? কেহ বলেন মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব, কেহ বলেন সে বিবেকী, কাহারও মতে মানুষ সামাজিক। Burke বলিয়াছেন—"Man is an animal that cooks his victuals." Adam Smith মানুষের আরও বৈষয়িক সংজ্ঞা দিয়াছেন—"Man is an animal that makes bargains." কবি বায়রণের ভাষায়—"Man is half dust, half deity, alike unfit to sink or soar, a pendulum betwixt a smile and tear." শেক্স্‌পীয়রের ভাষায়—"What a piece of work is man! How noble in reason! How infinite in faculties!" কিন্তু গীতায় বিশ্বরূপদর্শন অধ্যায়ে মনুষ্যরূপী শ্রীভগবান এবং দেবীসূক্তে অম্ভৃণ-মহর্ষির কন্যা বাক্ মানুষের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মানুষ স্রষ্টা। অন্যান্য প্রাণীরাও সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তাহাদের সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য নাই। উই পোকা উই ঢিপি ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না, যুগযুগান্ত ধরিয়া সে উহাই করিতেছে। এক জাতীয় পাখী এক জাতীয় নীড় নির্মাণ করিতেই দক্ষ। অতি স্থূল আধিভৌতিক দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে মানুষের সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। মানবসভ্যতা স্রষ্টা মানবের কীর্তি নব নব সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। সৃষ্টিই মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, নিত্য নূতন সৃষ্টিতে সে নিজেকে আবিষ্কার করিতেছে, তাহাতেই তাহার আনন্দ, পুরাতনের শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। তাহার মনীষা নিত্য নূতন লোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য উন্মুখ, এজন্য যুগে যুগে বহু বিপদকে সে বরণ করিয়াছে—সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছে, পর্বত লঙ্ঘন করিয়াছে, ব্যাধজীবনের অবসান করিয়া কৃষিসভ্যতার পত্তন করিয়াছে, অরণ্য কাটিয়া পল্লী বসাইয়াছে, পল্লীকে নগরে রূপান্তরিত করিয়াছে। সৃষ্টি করিয়াছে নবতর সৃষ্টির প্রেরণায়। বিশ্বপ্রকৃতির মতো তাহার প্রকৃতিও যেন সতত সংগ্রামশীল। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন—

"তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।

জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণ-রঙ্গ-ভূমি
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজলী প্রাণের বিজয়বার্তা"
তাহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সম্বন্ধেও সমান সত্য।

মানব পশু বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহী পশু। প্রকৃতির প্রতিভাবান দুরন্ত অশান্ত সন্তান সে। প্রকৃতির কোনও শাসনকেই সে মানিয়া লয় নাই। সে রাত্রির অন্ধকারে আলো জ্বালিয়াছে, দিবসের প্রখর আলোকে রুদ্ধঘরে বসিয়া কৃত্রিম অন্ধকার উপভোগ করিয়াছে। আহারে নিদ্রায় প্রজননে প্রকৃতির কোনও বিধান, কোনও সীমা, কোনও গণ্ডীকে সে মানে নাই। ইহার জন্য শাস্তিভোগ করিয়াছে তবু মানে নাই। নানাবিধ আবিষ্কারের সাহায্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতাকে দূর করার প্রচেষ্টাই যেন তাহার সভ্যতার পরিচয়। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, বেতার, বিমানপোত, টেলিভিশন, পুস্তক, মুদ্রাযন্ত্র, বিজ্ঞানের নিত্য নব আবিষ্কারে তাহাকে নিত্য নূতন দেশে লইয়া চলিয়াছে। নব নব সৃষ্টিতে সে নিজেকেই যেন অতিক্রম করিতে চাহিতেছে। পথ দুর্গম, কিন্তু তবু সে আনন্দিত। এই আনন্দের প্রেরণাই তাহার পাথেয়। নিত্য নব আনন্দের সন্ধানে বস্তুজগতে নিত্য নব আবিষ্কার করিতে করিতে মানুষ অবশেষে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করিল যাহা তাহার সমস্ত পূর্ব-আবিষ্কারকে ম্লান করিয়া দিল, যাহার নিকট সমস্ত বস্তু-মহিমা তুচ্ছ হইয়া গেল। এতকাল যে পশু-মানুষ আহার-নিদ্রাদির বৈচিত্র্যসাধনে তৎপর ছিল সহসা সে আত্ম-আবিষ্কার করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-আলেয়াকে অনুসরণ করিতে করিতে মানবের সৃষ্টিপ্রতিভা যখন তমসাচ্ছন্ন লোকে বিভ্রান্ত তখন সহসা ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ", ধ্বনিত হইল যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা—নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্, তাহা—অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, তাহা—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্। তাহার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল। সুখের সন্ধানেই তাহার যাত্রা শুরু হইয়াছিল, সহসা সে আবিষ্কার করিল—ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। এই আত্মআবিষ্কার এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানব-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আধ্যাত্মজগতের নূতন আলোক তাহার আধিভৌতিক জগৎ স্বপ্নের মতো অলীক হইয়া গেল। তাহার মনে নূতন চিন্তা জাগিল কি শ্রেয় এবং কি প্রেয় এবং এই চিন্তাধারা তাহার প্রগতির রূপ পরিবর্তন করিয়া দিন। উপনিষদের ঋষি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।"

শ্রেয় এবং প্রেয়—ধবুদ্ধি এবং বিষয়বুদ্ধি—সম্মিলিত ভাবে প্রত্যেক মানুষকেই আশ্রয় করে। বুদ্ধিমান লোক শ্রেয়কে এবং অল্পবুদ্ধি লোক প্রেয়কে বরণ করিয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য অল্পবুদ্ধি লোকের সংখ্যাই পৃথিবীতে চিরকাল বেশি। বস্তু-জগতে প্রাধান্যলাভ করিবার জন্য অধিকাংশ মানুষ তখনও যুদ্ধ করিত, এখনও করিতেছে। বন্যমানবের নখদন্ত সভ্যমানবের নানা অস্ত্রশস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। পৌরাণিক যুগের অসি, গদা, মুষল, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, তোমর, অঙ্কুশ, ক্ষুরপ্র, নারাচ, পরশু, পট্টিশ, ভল্ল, চক্র, লাঙ্গল, ভুশুণ্ডী, চর্ম প্রভৃতি বর্তমানে গুলি গোলা বন্দুক কামান শ্র্যাপ্‌নেল, আণবিক বোমা, উদ্‌বোমায় পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ মানুষই জীবনটাকে যুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারবিন জীবনযাত্রার নামকরণই করিয়াছেন struggle for existence. আমাদের পুরাণের গল্পের অধিকাংশ গল্পও যুদ্ধের গল্প। দেব-অসুর, রাম-রাবণ, কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী সংগ্রামেরই কাহিনী। আমাদের চণ্ডী রণরঙ্গিণী, আমাদের দেবতারা কেহ ত্রিপুরারি, কেহ কংসারি, কেহ বৃত্রনিসূদন। শুধু আমাদের পুরাণেই নয়, মিশরীয় পুরাণের রা এবং আইসিসের গল্প, ব্যাবিলনের ইয়া এবং তিয়াম্মতের কাহিনী, প্রাগৈতিহাসিক আমেরিকার ওবেলিথের গল্প, সবই দ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের ইতিহাস, অল্পবুদ্ধি প্রেয়কামী মানব-মানসের প্রতিচ্ছবি। আমাদের আধুনিক ইতিহাসও তাই। ব্যক্তির বা জাতির অতি স্থূল বৈষয়িক জয়-পরাজয়ই তাহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রেয়কামীর সংখ্যা এখনও অল্প। অধিকাংশ মানবই প্রেয়কামী একথা সত্য, কিন্তু একথাও সত্য সমস্ত মানবজাতি ওই মুষ্টিমেয় শ্রেয়কামী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভাবান মানুষদের দিকেই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে—যাহারা জীবনকে 'যুদ্ধ' না বলিয়া 'লীলা' বলিয়াছেন। মাঝে মাঝে ইঁহাদের পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা যে করা হয় নাই তাহা নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানবসমাজের অন্তরোৎসারিত শ্রদ্ধা ইঁহাদেরই চরণে সমর্পিত হইয়াছে। ঘৃণ্যতম ভোগীও অবশেষে ত্যাগীর চরণেই শির অবনত করিয়াছে।

www.boiRboi.blogspot.com

অধিকাংশ মানুষই লুণ্ঠনকারী দস্যু, কিন্তু মনে হয় সেজন্য তাহারা যেন মনে মনে লজ্জিত, তাই লুণ্ঠন করিবার সময় তাহারা ধর্মের মুখোশ পরিয়া লুণ্ঠন করে। এই ভণ্ডামি দেখিয়া আমরা অনেক সময় ক্ষুব্ধ হই বটে, কিন্তু ক্ষুব্ধ হইবার প্রয়োজন নাই, ওটা সুলক্ষণ, ওই মুখোশের দ্বারাই তাহারা বাঁকা পথে সত্য শিব সুন্দরকে অভিনন্দন করিতেছে।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

এই মহাবাণীর নিগূঢ় সত্য নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই প্রকাশ্যভাবে লুণ্ঠন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে।

ইহারা সংখ্যায় বেশি বলিয়া হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। ধূলিকণা অসংখ্য, কিন্তু সূর্য এক। সেই একটি সূর্যের ভাস্বরতায় অসংখ্য ধূলিকণা তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। বস্তুজগতে বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্কার যেমন পূর্বতন আবিষ্কারকে ম্লান করিয়া দিয়াছে—বিমানপোতের নিকট গরুর গাড়ি আজ যেমন অকিঞ্চিৎকর, হাইড্রোজেন বোমার কাছে বন্দুক যেমন হাস্যকর—মানবজাতির অগ্রগতিতে অধ্যাত্ম-জগতের আবিষ্কারের কাছে আধিভৌতিক জগতের ঐশ্বর্য আজ তেমনি হীনপ্রভ। শ্রেষ্ঠ মানবমনীষা আর অনিত্য বস্তুতে নিবদ্ধ নাই, নিত্যবস্তুর সন্ধানে সে উৎসুক। তাহাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বন্ধনের বিরুদ্ধে নয়, আসক্তি-বন্ধনের বিরুদ্ধে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গুণাতীত হইতে চান—

"সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥"

যাঁহার কাছে সুখদুঃখ সমান, যিনি আত্মস্থ, যাঁহার কাছে মাটি পাথর সোনা তুল্যমূল্য, প্রিয়-অপ্রিয়, মান-অপমান, শত্রুমিত্র, স্তুতিনিন্দা যাঁহার দৃষ্টিতে সমান, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষী নন—তিনিই গুণাতীত।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতেই সমুৎসুক। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু তথাপি তাঁহাদেরই সাধনা সংখ্যাগরিষ্ঠ পশুর দলকে ধীরে ধীরে পশুত্বের স্তর লইতে মুক্ত করিতেছে। অধ্যাত্মজগতে সংখ্যাগরিষ্ঠরাই জয়ী নয়।

অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগা অসম্ভব নয় যে পশুমানবের মনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হইল কি প্রকারে? তাহার উত্তর মৃত্যু এবং মানবমনের অন্তহীন কৌতুহল। সে চিরকালই প্রকৃতিকে জানিতে চাহিয়াছে, বুঝিতে চাহিয়াছে, তাহার অমোঘ বিধানকে অতিক্রম করিবার সাধনা করিয়াছে। এজন্য তাহার কৌশল ও তপস্যার অন্ত নাই। এই পথেই তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছে যে যাহা কিছু বস্তুসংশ্লিষ্ট তাহাই ক্ষণভঙ্গুর। জীবন, যৌবন, পুত্র, কলত্র, মান, বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার পরিণাম সমস্তই কালক্রমে বিনষ্ট হয়। এ সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যক্ষ মৃত্যুই মানবের প্রথম ধর্মগুরু। তাই বোধ হয় কঠোপনিষদের ঋষি মানবসন্তান নচিকেতাকে যমের সম্মুখীন করিয়া যমের মুখ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মৃত্যুই—এই অনিত্য-বিধ্বংসী মহাকালই—শেষে তাহার নিকট দেবতা-রূপ ধারণ করিয়াছে। পুরুষরূপে যিনি মহাকাল, স্ত্রীরূপে তিনিই মহাকালী। নানারূপে নানা মূর্তিতে নানা প্রতিমায় মহাকাল ও মহাকালীর পূজা মানবসমাজে প্রচলিত। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর শুভঙ্কর রূপও তাহার নিকট ক্রমশঃ প্রতিভাত হইয়াছে। মৃত্যুই যে নবজীবনের সূচনা করে, ধ্বংসের মধ্যেই যে নবসৃষ্টির বীজ নিহিত আছে এ সত্য মানবকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছে। ধ্বংসকর্তা মহেশ্বরের সহিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং পালনকর্তা বিষ্ণুও তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। মহাকালীর হস্তে কেবল খড়্গ এবং ছিন্নমুণ্ডই নাই, বরাভয়ও আছে।

এই পথেই—জীবনের সমস্ত কিছু নশ্বর এই উপলব্ধির ফলস্বরূপই—সে আর একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করিয়াছে—ভালবাসা। যাহা থাকিবে না, একটু পরেই চলিয়া যাইবে তাহাকে ঘিরিয়া যে মোহ যে মায়া তাহাই ভালবাসার আদি রূপ, তাহাই পরিশুদ্ধ হইয়া বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছে। পরমহংসদেবের বিচিত্র অধ্যাত্মজীবনের দিগ্‌দর্শনও এই দুইটি জিনিস—মহাকালী এবং প্রেম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্মজগতের একজন দিকপাল। বস্তুজগতের দিকপালেরা যেমন বিশিষ্ট প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের কীর্তিকলাপ যেমন সৃষ্টিধর্মী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তেমনি বিশেষ একটি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিক কীর্তিকলাপ তেমনি সৃষ্টিধর্মী। প্রথম জীবনে তাঁহার যে রূপ আমরা দেখিতে পাই তাহা কবি ও ভক্তের রূপ। তাঁহার কবিকল্পনা ও ভক্তি, তাঁহার সৌন্দর্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যয় তাঁহাকে অনন্য করিয়াছে। তাঁহার যদি কেবলমাত্র কবি-কল্পনা থাকিত তাহা হইলে

www.boiRboi.blogspot.com

তিনি আর পাঁচজন সাধারণ কবির মতো কবিতাই রচনা করিতেন, আমরা সাধক রামকৃষ্ণকে পাইতাম না। তিনি যদি কেবলমাত্র ভক্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা একজন সাধক পাইতাম বটে কিন্তু 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র কবি রামকৃষ্ণকে পাইতাম না।

যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে-ভরা
বসন্তের এই সঙ্গীতে !"

সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাল্যকাল হইতেই তিনি রোমাঞ্চিত হইয়া ভাবিয়াছেন—এই কি তিনি, এই কি তিনি! তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, প্রত্যক্ষও করিয়াছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের পল্লবগ্রাহীরা হয়তো ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না। অনেক তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহাই তো প্রত্যাশিত। শফরীরা গণ্ডুষমাত্র জলেই তো ফরফর করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে কেবল বুদ্ধিপ্রভাবেই বুঝি বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়। এ যুগের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Dr. Alexis Carrel কিন্তু বলিতেছেন—"Intelligence alone is not capable of engendering science." তিনি আরও বলিতেছেন—"Certainty derived from seience is very different from that derived from faith. The later is more profound."

এই profound (গভীর) বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে profound দৃষ্টিভঙ্গীও প্রয়োজন। কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল প্রান্তরে কৃষ্ণমেঘের পটভূমিকায় সাদা বকের সারি যে বালককে অভিভূত করিয়াছিল, যাত্রার শিব সাজিয়া শৈশবেই যিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের কালীপ্রতিমার স্পর্শমাত্র যাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল, ম্যাডোনার ছবি দেখিয়া যিনি শিশুখৃষ্ট-মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, পাষাণ-প্রতিমাকে সজীব দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় যিনি আহার নিদ্রা বস্ত্র উপবীত সমস্ত ত্যাগ করিয়া মাতৃহারা শিশুর ন্যায় অশ্রুপাত করিতে করিতে দিনের পর দিন কাটাইয়াছিলেন, অবশেষে যাঁহার অদর্শনে অধীর হইয়া

আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যিনি কালী দুর্গা শিব সীতা রাম হনুমানকে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রেষ্ঠ ভক্তের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ভক্ত কবিমানসের সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অবিশ্বাসীর নাই। যাহা অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় তাহা খালি চোখে দেখা যেমন সম্ভব নহে, বেরসিক ব্যক্তি যেমন কাব্যরস উপভোগ করিতে পারে না, অবিশ্বাসীর পক্ষেও তেমনি ভক্তের মর্মোদ্ভেদ করা অসম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার এই যে তাঁহার কবিমানসের কল্পনা ভক্তহৃদয়ের আকুলতায় বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার মানসদেবতাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। এই অসাধ্যসাধন করিবার জন্য তিনি কোথাও যান নাই, কোন শাস্ত্রচর্চা করেন নাই, কাহারও নিকট উপদেশভিক্ষা করেন নাই। তাঁহার কবিমানস অগাধ বিশ্বাস লইয়া যাহাই কল্পনা করিয়াছেন তাহাই সফল হইয়াছে। Plato-র Utopian স্বপ্ন সফল হয় নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুধু জড় প্রতিমাই সজীব হইয়া ওঠে নাই, তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে সাধনমার্গের সুকঠিন দুর্গম পথ অতি সহজে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সবিকল্প সমাধিলাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার গুরুরা স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্তও হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সাধারণতঃ শিষ্যই গুরুর সন্ধান করে, কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতই ঘটিয়াছে—প্রথমে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং পরে তোতাপুরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন এবং নিজেদের তাগিদেই যেন তাঁহাকে সাধনমার্গে আগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ভৈরবী আসিয়া তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি তোমাকেই খুঁজিতেছি। প্রত্যাদেশ পাইয়া আমি তোমারই কাছে আসিয়াছি।'

শুধু যে তাঁহার গুরুরা আসিয়াছিলেন তাহাই নয়, বাংলাদেশের তদানীন্তন মনীষিবৃন্দ—গৌরী পণ্ডিত, পদ্মলোচন, বৈষ্ণবচরণ, শশধর তর্কচূড়ামণি, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নাগ মহাশয়, তখনকার ইয়ং বেঙ্গলের দল, খৃষ্টান, মুসলমান, শিখ—দলে দলে সকলেই তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দ ও তাঁহার অনাগত শিষ্যদের জন্য তিনি মাঝে মাঝে কেবল ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন—ছাদের উপর উঠিয়া তাহাদের ডাক দিতেন—"ওরে কোথায় তোরা, আয়, আমি যে আর তোদের ছেড়ে থাকতে পাচ্ছি না।" তাঁহারা একে একে আসিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী দেশে

দেশান্তরে ছড়াইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কোথাও যান নাই। তাঁহার কল্পনা, বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও সাধনা লইয়া অটল হিমাদ্রির মতো একস্থানেই তিনি বসিয়া ছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুগচেতনার মর্মমূলে আজও বোধ হয় আছেন এবং ভবিষ্যতে নূতন যুগের নূতন আলোকে নূতন পৃথিবীতে যে নূতন ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইবে তাহার প্রাণকেন্দ্রেও তিনি তেমনই ভাবে বসিয়া থাকিবেন।

এই ধর্মরাজ্য-প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হইতেছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

অনেকেই বলেন—পাপে তো পৃথিবী ভরিয়া গেল, পাপীরাই তো বিজয়-পতাকা উড়াইয়া সদম্ভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সাধুদের কষ্টের অবধি নাই, পরিত্রাতা ভগবান কবে, কি ভাবে, কোথায় আসিয়া ধর্ম-সংস্থাপন করিবেন ?

ভারতের ঋষি বলিয়াছেন—ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। ভগবান কখন কি ভাবে আসিয়া যে ধর্মসংস্থাপন করিবেন, প্রতি মুহূর্তেই তাঁহার সে প্রয়াস চলিতেছে কি না, তাহা সম্যকরূপে নির্ণয় করা সহজ নহে। সর্বযুগেই যে তিনি শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণরূপেই জন্মগ্রহণ করিবেন এমন না-ও হইতে পারে। তিনি যে নিশ্চিন্ত নাই তাহার কিছু আভাস আমাদের ইতিহাসেই আছে। ভারতে যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, কিংবা তাহার সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হইয়াছে, তখনই একজন করিয়া মহাপুরুষ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যদিও শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের হুবহু নকল নন কিন্তু উক্ত দুই অবতারের বাণী এবং আদর্শ তাঁহাদের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈদিক ধর্মের অধঃপতনে সমস্ত আর্যাবর্ত যখন কর্মকাণ্ডের প্রাণহীন নিষ্ঠুরতায় কাতর, তখন প্রথমে মহাবীর, তাহার পর বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মও যখন কালক্রমে গ্লানিপূর্ণ হইয়া উঠিল তখন ধর্মজগতে জন্মগ্রহণ করিলেন শঙ্করাচার্য এবং রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করিলেন মুসলমান। অধঃপতিত বৌদ্ধেরা অনেকেই মুসলমান হইতেছিল, সুলতান মাহমুদ যখন ভারত লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছেন তখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রামানুজ। তাহার পর বাংলাদেশে পাঠানদের হিন্দুবিদ্বেষ যখন চরমে উঠিয়াছে তখন নিষ্ঠুর হিন্দুবিদ্বেষী সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে বাঙলার মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন চৈতন্য এবং পাঞ্জাবের মাটিতে নানক। তাহার পর প্রায় তিন শত বৎসর অন্ধকার।

www.boiRboi.blogspot.com

মোগলযুগই ভারতবর্ষের ধর্মজগতে অন্ধকারময় যুগ। তবু এই অন্ধকারময় যুগের শেষভাগেও যখন ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম বিপন্ন, তখন যে বীরের কণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল তিনি রামভক্ত রামদাসের শিষ্য শিবাজী। তাহার পর আসিলেন ইংরেজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ যখন বাংলাদেশে শাসনের নামে যথেচ্ছাচারিতা করিতেছেন তখন ভারতবর্ষের যে আত্মচেতনা ভবিষ্যতে ইংরেজ-রাজত্বের অবসান ঘটাইবে সেই শক্তির প্রথম উদ্বোধক রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে। ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের যখন ফাঁসি হয় তখন রামমোহন চারি বৎসরের শিশু। তাহার পর ইংরেজের হস্তে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে ভারতের শেষ হিন্দুশক্তি যখন বিধ্বস্ত হইতেছে তখন ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে—জন্মগ্রহণ করিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বাঙলা দেশে নব্য হিন্দুধর্মের প্রথম উদ্গাতা, এবং তাহার কিছুদিন পরেই—১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে—দয়ানন্দ সরস্বতী, আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মোহ এবং নূতন ধরনের পাশ্চাত্ত্য গোঁড়ামির বিষ আমাদের সমাজদেহে প্রবেশ করিয়া আমাদের বিভ্রান্ত করিয়াছে সেই ইংরেজী ভাষা অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য হয় ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে। যাঁহার জীবন ভবিষ্যতে সকল প্রকার মোহ ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ করিবে সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিলেন ঠিক তাহার এক বৎসর পরে—১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে। তাহার দুই বৎসর পরেই জন্মিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি। দশ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথ—সেই মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা। ইহার কিছুকাল পরে—১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে—ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ—ইংরেজ ঐতিহাসিক যাহার নাম দিয়াছেন 'সিপাহী-বিদ্রোহ'। সে যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিতে পারি নাই, ভারতসন্তানের রক্তেই সেদিন ভারতভূমি সিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে রক্ত শুকাইতে না শুকাইতেই যে কয়জন ভারতসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেন তাঁহাদের প্রয়াস বিফল হয় নাই। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে বিবেকানন্দ, ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে মহাত্মা গান্ধী, ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এই সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতে একটা কথা স্বতঃই মনে হয় যে শ্রীভগবান নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই, তিনি সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের দমন করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। কিন্তু সমস্ত সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের দমন করিতে শ্রীরামচন্দ্রও পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণও পারেন নাই—দুই-একটা রাবণ কংস জরাসন্ধ দুর্যোধন বিনষ্ট হইয়াছে মাত্র। এত বড়

বিরাট একটা কাজ—পাপে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং পুণ্যের সার্বভৌম প্রবর্তন—সহজে অল্প সময়ে হয় না। বহু কল্প প্রয়োজন। পৃথিবী এককালে জলময় ছিল—বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে স্থলের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্মরাজ্যও একদিন সংস্থাপিত হইবে; নিগূঢ় অন্তরালে তাহার আয়োজন চলিতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো মহাপুরুষের আবির্ভাবেই কি তাহার ইঙ্গিত নাই? যে মানব একদিন বর্বর বন্য পশু ছিল তাহাদেরই মধ্যে এমন লোক কেন জন্মিল যাঁহার চরিত্রে শঙ্করের প্রতিভা, বুদ্ধের অহিংসা, যীশুখ্রীষ্টের ক্ষমা, ইসলামের মহত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যের প্রেম একই সঙ্গে বিরাজমান, যিনি ভয়ঙ্করী কালীপ্রতিমার মধ্যে শুধু করুণাময়ী জননীকেই প্রত্যক্ষ করেন নাই, 'শুক্র অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্' ব্রহ্মকে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন, যিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন কোনও ধর্মের সহিত কোনও ধর্মের বিরোধ নাই, যাঁহার দৃষ্টিতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ একই তত্ত্বের বিভিন্ন স্তরমাত্র, যিনি জানিয়াছিলেন কিছুর সহিতই কোনও কিছুর মূলতঃ প্রভেদ নাই—কারণ সমস্ত কিছুর সেই বিরাট ঊর্ধ্বমূল নিম্নশাখ ক্ষণস্থায়ী অশ্বত্থবৃক্ষের শাখাপ্রশাখা মাত্র—সমস্ত কিছুরই মূল ঊর্ধ্বে শাশ্বত ব্রহ্মে। এরূপ লোকের মানবসমাজে আবির্ভাবের কি কোনও অর্থ নাই?

অর্থ যে আছে তাহা আমরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বকে যে সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন সেই সমন্বয়ের স্থর যেন আজ পৃথিবীর মানসক্ষেত্রে ধ্বনিত হইতে শুরু করিয়াছে। হয়তো ক্ষীণভাবে, কিন্তু শুরু যে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বস্তুজগতের বৈজ্ঞানিকদের যেন নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের চক্ষে জড় ও জীবের সীমারেখা আজ অস্পষ্ট। বিভিন্ন বস্তুর বৈষম্যের যে কারণ আজ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাহাও সমন্বয়ধর্মী, সমস্ত বস্তুরই বাহিরের স্থূলরূপ যে পরমাণু-নিহিত বৈদ্যুতিক শক্তিকণার নানাবিধ সমাবেশ ও স্পন্দনের উপরই নির্ভরশীল একথা আজ তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইতেছে। স্বর্ণ ও লৌহের বৈষম্য আপাতবৈষম্য—আসলে তাহারা ইলেক্ট্রন-প্রোটনের বিভিন্ন লীলামাত্র একথা আজ সর্বস্বীকৃত সত্য।

রাজনৈতিক জগতেও আজ এই সমন্বয়দৃষ্টি দেখা দিয়াছে। সর্বদেশের মনীষীরাই আজ সমন্বয়ের আলোকে রাজনীতির জটিল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে

চাহিতেছেন। বস্তুতান্ত্রিক আমেরিকার Wendel Wilkie তৎপ্রণীত One World পুস্তকে বলিয়াছেন—পৃথিবীর মানসিক ভারকেন্দ্র ধীরে ধীরে স্থান-পরিবর্তন করিতেছে। Aldous Huxley এবং Maugham-রা বেদান্ত-উপনিষদের বাণীতে মুগ্ধ হইয়াছেন, রম্যাঁ রলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজীবনী লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন। হাওয়া বদলাইতেছে সন্দেহ নাই। League of Nations অথবা United Nations এর ব্যর্থতায় হতাশ হইলে চলিবে না, হয়তো আরও দুই-একটা মহাযুদ্ধ আমাদের বিভ্রান্ত করিবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিলনের পথ মিলিবেই। মানুষকে শান্তির পথ, মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। যুগে যুগে যে সকল মহাপুরুষ সেই পথ-প্রস্তুতির আয়োজন করিয়া গিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের অন্যতম।

আজ আমরা নিকটে আছি বলিয়া তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু আমাদের পরবর্তীরা সুদূর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত এই বিরাট হিমালয়ের অভ্রভেদী বিরাটরূপ দেখিতে পাইবে। সম্রাট অশোকের সমসাময়িক ব্যক্তিরা অশোককে চিনিতে পারেন নাই, আজ আমরা অশোককে চিনিয়াছি।

আজ আমাদের ঘোর দুর্দিন সন্দেহ নাই। দুঃখের কারণ শুধু বাহিরেই নাই, আমাদের ভিতরেও আছে। যে ধর্ম ভারতের প্রাণ-স্বরূপ আজ আমরা সেই ধর্মচ্যুত হইয়াছি। আমাদের মনের সমস্ত ঝোঁকটা গিয়া পড়িয়াছে রাজনীতির উপর—যে রাজনীতির মূল লক্ষ্য স্বার্থপরতা। আমরা সকলেই ক্রমশঃ স্বার্থপর পশু হইয়া পড়িতেছি। পাশব শক্তির আপাত-উন্নতি আমাদের সকলকেই পশুত্বের স্তরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাই সর্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ। আমরা বিপদে পড়িলে আজকাল ভগবানের কাছে আর প্রার্থনা করি না, সভায় বা সংবাদপত্রে আন্দোলন করি। দুর্দিন পুরাকালেও বহুবার আসিয়াছিল। তখন আর্ত মানব ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। কংসের অত্যাচারে যখন সকলে সন্ত্রস্ত তখন আর্ত মানবমানবী যে প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা নিষ্ফল হয় নাই। আসুন আমাদের এই দুর্দিনে পুরাণকারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলি—

"হে দেবতা, জাগ্রত হও। বিভীষিকাময়ী রজনী সমুপস্থিত। অবিশ্রান্ত বারিপাতে কর্দম-পিচ্ছিল পথ; মুহুর্মুহু বিদ্যুতে ও মেঘ-গর্জনে আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে মনে হইতেছে যেন প্রিয়পরিজনের কাঁচা মাংস ও তপ্তরক্তের উপর দিয়া চলিতেছি। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি আতঙ্কে স্তব্ধ

www.boiRboi.blogspot.com

হইয়া আছে। সকলেরই নিজেকে বড় একা, বড় অসহায় মনে হইতেছে, যেন আর কেহ নাই। অন্ধকারে আমারই মতো আর যাহারা চলিতেছে তাহাদের সহিত মুখামুখি হইলেই হিংস্র পশুর মতো পরস্পর চাহিয়া দেখিতেছি, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার বাসনা, যেন পরস্পরকে হনন না করিয়া চলিবার উপায় নাই। রাক্ষস কংসের অনুচরেরা অন্ধকারে পাগলের মতো ঘুরিতেছে, তাহাদের চোখেও ঘুম নাই। আমরা তাহাদের বন্দী, আমাদের লাঞ্ছনার সীমা নাই। তোমাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিতেছি না। রুদ্ধনিশ্বাসে ভীত শঙ্কিত প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি—হে দেবতা, জাগ্রত হও। পাপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, জননীর বক্ষে স্তন্য নাই, ক্ষুধিত শিশুরা ধুলায় লুটিয়া কাঁদিতেছে। অসহায়া নারীদের আর্তনাদে কর্ণ বধির হইয়া গেল। এত আঘাত সহ্য করিয়াও আমরা বাঁচিয়া আছি। তোমার প্রতীক্ষায় থাকিতে থাকিতে অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষু অন্ধ হইতে বসিয়াছে। শাসনে পীড়নে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে। হে অন্ধকারের দেবতা, হে কৃষ্ণ, তুমি জাগ্রত হও।

তাঁহাদের প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নাই। আমরাও যদি তেমনি করিয়া প্রার্থনা করি ভগবান আবার আবির্ভূত হইবেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য-জীবন আলোচনা করিয়া এই শিক্ষাই যেন আমরা লাভ করি।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

বুদ্ধদেবের জীবনে নারী

ধর্মজগতের মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিলে একটি কৌতুকজনক ব্যাপার প্রায়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহাদের অনেকেই নারীসঙ্গ পরিহার করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু নারীরা কিছুতেই তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই। ঘটনাচক্রে পাকে-প্রকারে তাঁহাদের জীবনে নারীর ছায়া অনিবার্যভাবে পড়িয়াছে। ইহার বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

যীশুখ্রীষ্ট—মেরী মডলিন, প্যাপ্‌নুশিয়াস—থেয়া, এবলার্ড—হেলাইস্‌ প্রভৃতির কাহিনী সুপরিচিত। এদেশে চৈতন্যদেব তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবীদের এবং বন্ধুপত্নীদের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বিবাহিত পত্নীর সহিত

আজীবন বাস করিয়াছেন, একজন ভৈরবীর নিকট তাঁহাকে বহুদিন ধরিয়া আধ্যাত্মিক শিক্ষাও লাভ করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার অবাধ্য দেবতাও ছিলেন নারী—মহাকালী।

আজন্মব্রহ্মচারী স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নে হয়তো প্রবেশাধিকারই পাইতেন না যদি একজন মহিলা তাঁহাকে প্রফেসার রাইটের সহিত পরিচয় করাইয়া না দিতেন। প্রফেসার রাইটের সুপারিশ পত্র পাইয়াও তাঁহার সুবিধা হয় নাই—শিকাগো শহরের রাস্তায় রাস্তায় তিনি বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন আর একজন মহিলা Mrs. G. W. Hale তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পার্লামেণ্টে লইয়া যান। এই দুইজন নারীর সাহায্য না পাইলে নারীসঙ্গ-বিরোধী বিবেকানন্দের দিগ্বিজয় হয়তো সম্ভবপরই হইত না। ইহারা ছাড়াও স্বামীজীর জীবনে আরও অনেক নারী আসিয়াছিলেন। Miss. Macleod, Mrs. Ole Bull, Sister Nivedita প্রভৃতির নাম বিবেকানন্দের নামের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত।

ভগবান বুদ্ধের জীবনেও নানা সময়ে নানা বেশে নারী-সমাগম হইয়াছিল—বর্তমান প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব।

ভগবান বুদ্ধ আজন্মব্রহ্মচারী ছিলেন না। তাঁহার বাল্যকাল ও যৌবনের অধিকাংশ সময় বিলাসেই অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে তিনটি বাড়ি তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। একটি গ্রীষ্মকালের জন্য, একটি বর্ষাকালের জন্য এবং একটি শীতকালের জন্য। এইসব বাড়িতে তিনি একা থাকিতেন না, নৃত্যগীতবাদ্যরতা সুন্দরী কামিনীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। বর্ষাকালে দোতলা হইতে নামিতেনই না—এসকল কথা বুদ্ধ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

ষোল বৎসর বয়সের সময় তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি নিজেই একটি রূপসী নানা সদ্‌গুণভূষিতা শাক্যকুমারীকে নির্বাচন করিয়া বিবাহ করেন। পালি শাস্ত্রে "রাহুলমাতা" নামে এই মহিমার উল্লেখ আছে। সংস্কৃত, তিব্বতী, সিংহলী প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে কিন্তু সিদ্ধার্থের পত্নীর অনেক নাম পাওয়া যায়—গোপা, যশোধরা, উৎপলবর্ণা, ভদ্রা, বিম্বা ইত্যাদি। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে তাঁহার একাধিক পত্নী ছিল, কারণ সেকালে একাধিক বিবাহ করাই সামাজিক নিয়ম ছিল, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে। তাঁহার একাধিক পত্নী ছিল কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে একাধিক নারীর সংস্রবে আসিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। সিদ্ধার্থকে বিলাসে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য

শুদ্ধোদনের অনেক সুন্দরী কামিনী নিয়োগের কথা অনেক গ্রন্থে আছে। কৃশা গৌতমী নামে একজন তন্বী শাক্যযুবতী সিদ্ধার্থের রূপের প্রশংসা করেন। ইহাতে সিদ্ধার্থ তাঁহাকে নিজের গলার মুক্তাহার খুলিয়া উপহার দিয়াছিলেন। ইহার অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনেকে করিয়াছেন—কিন্তু ইহাকে সাধারণ মানবোচিত দৌর্বল্য বলিয়া স্বীকার করিলেও বুদ্ধমহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি তো সাধারণ রাজপুত্রের জীবনই যাপন করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি গৃহত্যাগ করেন।

গভীর রাত্রে নিদ্রিত নর্তকীদের স্রস্ত বসন, আলুথালু কেশপাশ, বিসদৃশ অঙ্গবিক্ষেপ প্রভৃতি নাকি তাঁহার মনে ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছিল। রমণীদের প্রতি বিতৃষ্ণার এই প্রথম বর্ণনা তাঁহার জীবনচরিতে পাওয়া যায়।

গৃহত্যাগের পূর্বে শিশুপুত্রকে তাঁহার একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। সন্তর্পণে পত্নীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন পত্নীর বাহুতে শিশুর মুখ ঢাকা। বাহু সরাইতে গিয়া পাছে পত্নী জাগ্রত হইয়া গমনে বাধা দেন এই ভয়ে তিনি পত্নীকে আর জাগান নাই, নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি তপস্যা আরম্ভ করেন। প্রথমে গয়ার নিকটবর্তী এক পাহাড়ে এবং পরে নৈরঞ্জনা তীরে উরুবিল্ব নামক এক গ্রামে। তাঁহার তপস্বি-জীবনের প্রথমভাগে রক্তমাংসময়ী কোন রমণীর আবির্ভাবের কথা কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। মায়াময়ী "মার" অবশ্য নানা বেশে আসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সফল যে হয় নাই তাহার প্রমাণ তিনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তপস্বি-জীবনের শেষভাগে বুদ্ধত্বলাভের অব্যবহিত পূর্বে—নিদারুণ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া যখন তিনি মৃতপ্রায় তখন তাঁহার জীবনে একটি করুণাময়ী রমণীর আবির্ভাব দেখিতে পাই—গোপকন্যা সুজাতা। সুজাতা-হস্তের পায়সান্ন তাঁহার তপস্যাশীর্ণ দেহে বলসঞ্চার করিয়াছিল। বৌদ্ধসাহিত্যে এই সরলা গ্রাম্য নারীর বহু যশ কীর্তিত হইয়াছে।

ইহার পর তিনি বোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হইলেন এবং সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি এই আর্য-আষ্টাঙ্গিক মার্গ জনসমাজে প্রচার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রচার-জীবনে তিনি ঋষিপত্তনে আসিয়া প্রথম বর্ষাযাপন (বস্সো) করিয়াছিলেন। সেকালে সন্ন্যাসীরা সারা বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন,

কিন্তু বর্ষার কয় মাস কোথাও যাইতে পারিতেন না, পথঘাট জলে কাদায় দুর্গম হইয়া পড়িত বলিয়া তাঁহারা একস্থানে বাস করিতেন। বর্ষার পর বুদ্ধ যখন ঋষিপত্তন হইতে উরুবিল্বের দিকে যাত্রা করিয়াছেন সেই সময়কার একটি ঘটনা হইতে নারীদের সম্বন্ধে বুদ্ধের তদানীন্তন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একটি বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন কয়েকটি যুবা কয়েকটি স্ত্রীলোকসহ আমোদ-প্রমোদে মত্ত আছে। তাহাদের মধ্যে একজন বারাঙ্গনাও ছিল। একটু পরে বারাঙ্গনাটি তাহাদের জিনিসপত্র চুরি করিয়া পলাইয়া গেল। যুবকরা তাহাকে খুঁজিতে লাগিল। বুদ্ধদেবকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তিনি কোন স্ত্রীলোককে যাইতে দেখিয়াছেন কি না। বুদ্ধ প্রশ্ন করিলেন—স্ত্রীলোকে তাহাদের কি প্রয়োজন? তাহারা চুরির ব্যাপার জানাইলে তিনি তাহাদের বলিলেন—আচ্ছা, কি ভাল বল দেখি, স্ত্রীলোকদের খোঁজ করা, না নিজেদের খোঁজ করা?

আত্মানুসন্ধানের পথে স্ত্রীলোকেরা যে বিঘ্নস্বরূপ ইহাই তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকদের তিনি কিছুতেই এড়াইতে পারেন না।

অল্প কিছুদিন পরেই স্বদেশে ফিরিয়া দুইটি স্ত্রীলোকের কাণ্ড দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি যখন কপিলাবাস্তুতে প্রত্যাবর্তন করিলেন—যেখানে একদা রাজপুত্র ছিলেন, সেখানে ভিক্ষুকবেশে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে করিতে যখন পিতৃভবনের সম্মুখে সমাগত হইলেন তখন রাজা শুদ্ধোদন, পাত্র, মিত্র, অমাত্য, প্রজাবর্গ সকলে ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন—কিন্তু আর একজনও আসিলেন যাঁহাকে বুদ্ধদেব এই জনতার মধ্যে দেখিবেন বলিয়া প্রত্যাশা করেন নাই—তাঁহার পালিকা মাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী। রাণীর সমস্ত মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া আলুলায়িত বেশে দীর্ঘ আট বৎসর পরে গৃহ-প্রত্যাগত সন্ন্যাসী পুত্রকে দেখিবার জন্য বহির্ভবনে ছুটিয়া আসিয়াছেন স্বয়ং মহাপ্রজাবতী!

বুদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন—আত্মীয়স্বজন প্রিয়পরিজন দলে দলে সকলে আসিল: কেহ প্রণাম করিল, কেহ চুম্বন করিল, কেহ আলিঙ্গন করিল—সকলেই আসিল—আসিল না কেবল একজন—তিনি তাঁহার পত্নী রাহুলমাতা। তিনি নিজের ঘরে বসিয়া রহিলেন।

পুরনারীরা তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর দিলেন—আমার যদি কোন মূল্য থাকে তবে আমার স্বামী নিজেই আমার নিকটে আসিবেন।

বুদ্ধকে যাইতে হইয়াছিল। রাহুলমাতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আসনে বসিতেই তিনি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধোদন বুদ্ধকে বলিলেন যে যেদিন সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন সেইদিন হইতে রাহুলমাতা সকল প্রকার আমোদ ও বিলাস ত্যাগ করিয়াছেন, যেদিন শুনিলেন স্বামী কেশচ্ছেদন করিয়াছেন, ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, সেইদিন হইতে তিনিও অনুরূপ কার্য করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছেন।

বুদ্ধ এতটা প্রত্যাশা করেন নাই।

মহাপ্রজাবতীর আত্মবিস্মৃতি ও রাহুলমাতার আত্মসম্মানবোধ দুই-ই তাঁহাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছিল।

ইহার পর তাঁহার সঙ্ঘজীবন।

বৌদ্ধ ধর্মানুমোদিত জীবনযাপনের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য তিনি সঙ্ঘ স্থাপন করিতে লাগিলেন। নারীদের সঙ্ঘ-প্রবেশের নিয়ম ছিল না। নারীদের সঙ্গ তিনি সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন এবং শিষ্যদেরও চলিতে উপদেশ দিতেন। একদিন কিন্তু অঘটন ঘটিয়া গেল। বুদ্ধ বৈশালীতে মহাবনের কুঠাগারশালায় বাস করিতেছিলেন, সহসা আনন্দ আসিয়া খবর দিল যে কুঠাগারশালার দ্বারদেশে বহু নারী-সমাগম হইয়াছে। স্বয়ং মহাপ্রজাবতী আসিয়াছেন। তিনি চীবর-পরিহিতা ও ছিন্নকেশা। তাঁহার সঙ্গে অভিজাত-বংশীয়া অনেক শাক্যরমণীও আছেন। তাঁহারা সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার অনুমতি চান। বুদ্ধ বলিলেন—না আনন্দ, তাহা হইতে পারে না। শুনিয়া সমস্ত রমণীরা রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কপিলাবাস্তু হইতে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন, মহাপ্রজাবতীর পা ফুলিয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত, অভিজাতবংশীয়া শাক্যনারীরাও শ্রান্তক্লান্ত, বিক্ষতপদ—তাঁহারা এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন শুধু সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি-আশায়। অনুমতি মিলিবে না? সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। সকলের আগ্রহাতিশয্যে বুদ্ধকে অবশেষে অনুমতি দিতে হইয়াছিল। নারীরা সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছিলেন। অনুমতি দিয়াই কিন্তু বুদ্ধের মনে হইয়াছিল যে ভুল করিলাম। আনন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন—স্ত্রীলোকেরা যখন সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি পাইল তখন এই সদ্ধর্ম ৫০০ বৎসরের বেশি স্থায়ী হইবে না। যেমন উত্তম ধান্যক্ষেত্রে ছাতাপড়া, সেতট্ঠিকা রোগ লাগিলে সে ক্ষেত্র চিরস্থায়ী হয় না, যেমন উত্তম ইক্ষুক্ষেত্রে মঞ্জেট্ঠিকা নামক রোগ লাগিলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না, সেইরূপ যে

ধর্মনিয়মে স্ত্রীলোকদের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় তাহাও চিরস্থায়ী হয় না।

অনুমতি দিবার পর কিন্তু নারীদের সংস্রব তিনি আর পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ব্যাধকন্যা চাঁপা হইতে শুরু করিয়া, শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কন্যা বিশাখা, অনাথপিণ্ডদস্থতা সুপ্রিয়া, চুল্ল সুভদ্রা, কৃশা গৌতমী, সুজাতা, চৌরবধূ ভদ্রা, কুণ্ডলকেশা, বৈশালীর গণিকা আম্রপালী (বা অম্বপালী), বাগ্মিনী নন্দুত্তরা প্রভৃতি অনেক রমণীই তাহার পর ভগবান বুদ্ধের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন গৃহস্থ রমণী নিমন্ত্রণ করিলেও বুদ্ধ তাহা আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার এরূপ বহু কাহিনী উল্লিখিত আছে। রাজগৃহের দাসী পুণ্যার পোড়া রুটিও তিনি সানন্দে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্মের পবিত্রমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া বহু নারী যে আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার অজস্র প্রমাণ আমরা "থেরীগাথা" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই। সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি দিয়া বুদ্ধ সে যুগের সভ্য নারীসমাজে একটা আন্দোলনই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আজকাল "কমরেড" হওয়া যেমন একটা গৌরবজনক ফ্যাসান, ইয়োরোপে 'Nun' এবং 'Sister' হওয়া যেমন এককালে মহীয়সী মহিলাদের সদ্গতি ছিল, বৌদ্ধযুগেও ঠিক তেমনি 'ভিক্ষুণী' হওয়া নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে আদৃত হইত। বহু পুণ্যাত্মা রমণীর সংস্পর্শ বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্মকে যে অলঙ্কৃত করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু স্ত্রীলোকদের হাতে বুদ্ধকে লাঞ্ছিতও হইতে হইয়াছিল অনেক। দুই-একটা উদাহরণ দিতেছি। বুদ্ধের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য একবার চিঞ্চা মানবিকা নাম্নী এক ভ্রষ্টা যুবতীকে নিযুক্ত করে। সে বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে যাইবার ছুতায় প্রায়ই জেতবনে যাইত। কিছুদিন পরে তাহার সহিত বুদ্ধের নাম যুক্ত করিয়া তাহারা নানা কলঙ্ক রটাইতে আরম্ভ করিল। চিঞ্চা নিজেই বুদ্ধের মিথ্যাবাদী ধর্মধ্বজী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইত। সুন্দরী নাম্নী আর একটি ব্রাহ্মণকন্যার সহিতও বুদ্ধের নাম অনুরূপ ভাবে জড়িত। সত্যকথা অবশ্য কিছুদিন পরেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। মাগন্দিরা নাম্নী আর এক ব্রাহ্মণকন্যাও বুদ্ধকে অনেক নির্যাতন করিয়াছিল। বসন-ভূষণে সাজিয়া সে বুদ্ধকে জয় করিতে গিয়াছিল—কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা হইয়া ফিরিয়া আসিল। এ অপমান সে ভোলে নাই। পরে যখন

www.boiRboi.blogspot.com

কেশাম্বীর রাজা উদয়ন তাহাকে বিবাহ করে তখন রাজরাণী পদে অধিষ্ঠিতা মাগন্দিরা গুণ্ডা লাগাইয়া প্রকাশ্য রাজপথে ভগবান বুদ্ধকে অপমান করিয়াছিল।

সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি পাইয়া অনেক নারীই যে সেখানে গিয়া স্বেচ্ছাচার করিত তাহারও অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে গিয়া তাহারা গোপনে সুরাপান পর্যন্ত করিত। বিশাখার অনুরোধে একবার সমাগতা কয়েকটি মহিলাকে উপদেশ দিতে গিয়া বুদ্ধদেব লক্ষ্য করিলেন যে তাহাদের এমন মত্তাবস্থা যে তাহারা টলিয়া পড়িতেছে।

সঙ্ঘে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনের নানা কুফলও তিনি জীবিতকালেই দেখিয়া গিয়াছেন।

উৎপলবর্ণার কাহিনী, সুন্দর-সমুদ্রের গল্প, অনাথপিণ্ডদের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেমের ক্রিয়াকলাপ, সিরিমার আখ্যান প্রভৃতি পড়িলে মনে হয় নারীদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ জীবনে অনেক অশান্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

রূপসী জনপদ কল্যাণীর সম্মুখে একটি মায়াময়ী সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহাকে এক সন্তানের মাতা, মধ্যবয়স্কা, বৃদ্ধা ও ব্যাধিগ্রস্তাতে পরিণত করিয়া রূপযৌবনের অসারত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছিলেন তাহাতে যেন তাঁহার বৃক্ষের মূলোচ্ছেদন করিয়া আগায় জল ঢালার মতো ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।

অবশেষে তিনি ভিক্ষুণীদের রক্ষার জন্য নগরের মধ্যে ভিক্ষুণীবিহার বানাইয়া দিতে রাজা প্রসেনজিৎকে অনুরোধ করেন।

কুশীনগরের নিকটবর্তী শালবনে অন্তিমশয্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধ যখন আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন তখন হঠাৎ আনন্দ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন—
“স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?”

“আনন্দ, স্ত্রীলোকদের দিকে তাকাইও না।”

“যদি তাকাইতে হয় তবে আমরা কি করিব?”

“বাক্যালাপ করিও না।”

“যদি বাক্যালাপ করিতেই হয় কি করিব?”

“সাবধানে করিবে।”

স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে ইহাই বুদ্ধের শেষ উপদেশ।

www.pathagar.blogspot.com

তবু একথা আমরা কিছুতে ভুলিতে পারি না যে অজাতশত্রুর মতো দুর্ধর্ষ রাজার বিরুদ্ধাচরণকে উপেক্ষা করিয়া বুদ্ধপূজা করিতে গিয়া আপনার জীবন যে বিসর্জন দিয়াছিল সে একজন নারী—তাহার নাম শ্রীমতী।

ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বুদ্ধপূর্ণিমা-সম্মেলন সভায় পঠিত।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

শিশু সাহিত্য

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

যুগল যাত্রী

নিতাই মণ্ডল তেমন চটপটে লোক নন। কোথাও যেতে হ'লে তিনি তাই বড় বিব্রত হ'য়ে পড়েন। গ্রাম থেকে স্টেশনটি প্রায় মাইল তিনেক দূরে। গরুর গাড়ি করে' যেতে হয়। শহরে যাবার ট্রেনও মাত্র একটি—সকাল আটটায় ছেড়ে যায়। এই সব কারণে শহরে তাঁর যাওয়াই হয় না বড় একটা। সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরোনো অসম্ভব তাঁর পক্ষে। ছ'টার আগে ঘুমই ভাঙতে চায় না। উঠে পায়খানা সেরে হাত-মুখ ধুতেই প্রায় একঘণ্টা বেরিয়ে যায়। একটি বড় নিমের দাঁতনকে চিবিয়ে ছিন্নভিন্ন না করলে তাঁর তৃপ্তি হয় না। এরপর স্নান। তেল মাখতেই তো আধঘণ্টা লেগে যায়। তারপর পুজো আছে। ঝাড়া একটি ঘণ্টা লাগে। পুজো সেরে জলখাবার নিয়ে বসেন। শুক্‌নো চিঁড়ে আর নারকোল তাঁর প্রিয় খাদ্য। ভাল করে' চিবিয়ে এক বাটি চিঁড়ে খেতে খানিকটা সময় লাগে বই কি। এর পর কাপড়-জামা পরা আছে। কাপড়ের কাছা-কোঁচা ঠিকই হতে চায় না সহজে। জামার বোতাম লাগাতেও সময় লাগে। দর্জি গর্তগুলো এমন ছোট ছোট করেছে যে বোতামগুলো ঢুকতেই চায় না। তারপর জুতো পরা, ফিতে বাঁধা, তারপর চুল আঁচড়ানো—মানে, ভদ্রভাবে কোথাও বেরুতে গেলে এ সব অপরিহার্য। নিতাই চট্ করে' গুছিয়ে নিতে পারেন না সব, দেরি হয়ে যায়। তিনি বলেন, মানুষ তো আর পাখি নয় যে ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে! এই সব হাঙ্গামার জন্যে বেরুতে চান না তিনি কোথাও। ট্রেন ফেল করে' যে ওয়েটিং রুমে বসে' থাকবেন, সে ধাতেরও লোক তিনি নন। কোথায় বসে' থাকবেন ওই তেপান্তর মাঠের মাঝখানে!

এবারে কিন্তু যেতেই হবে। একটা জরুরি মোকদ্দমা লেগেছে, না গিয়ে উপায় নেই। আগেই যাওয়া উচিত ছিল। তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলছিলেন কিন্তু আর এড়ানো যাবে না, যেতেই হবে। তাঁর উকীল বিশ্বম্ভর চৌধুরী জরুরি তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখেছেন। চিন্তিত হয়ে পড়লেন নিতাই। পুজো সারতেই তো সাতটা বেজে যাবে। তারপর ওই গরুর গাড়ি।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি শেষে ঠিক করলেন যে কিছুদিন আগে থেকেই শুরু করতে হবে। পনরোই মোকদ্দমার দিন। আট তারিখ থেকেই ট্রেন ধরবার

চেষ্টা করতে থাকবেন, যেদিন পেয়ে যান। তাছাড়া আর একটা মুশকিল, ঘড়ি নেই। সূর্য দেখে আন্দাজে সময় ঠিক করতে হবে।

প্রথম দিন তো বাড়ি থেকে বেরুতেই সূর্যঠাকুর শিমুলগাছের মাথায় উঠে পড়লেন অর্থাৎ আটটা বেজে গেল। দ্বিতীয় দিন আর একটু সকাল সকাল বেরিয়ে গেলেন; কিন্তু গ্রাম ছাড়াতে না ছাড়াতেই হরু ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনি ওই আটটার ট্রেনে এসেছেন। সুতরাং সেদিনও ট্রেন পাওয়ার আশা নেই। ফিরতেই হলো। নিতাই মণ্ডল গাড়ির বলদ দুটোর পানে এমনভাবে চাইলেন যেন যত দোষ তাদেরই। তৃতীয় দিন আর একটু ভোরে উঠলেন। এমনি ভাবে চলতে লাগল।

ত্রৈলোক্য তরফদার বেশ চটপটে লোক। তাঁর কাজ হাতে-পায়ে লাগে না। কোনও কাজ ফেলে রাখা তাঁর স্বভাব নয়। যা করতে হবে তা আগে থাকতেই করে' নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকতে চান তিনি। মনে কর, বাড়িতে লোক খাওয়াতে হবে, সন্ধ্যা আটটার সময় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের আসবার কথা; ত্রৈলোক্য তরফদার তাড়াহুড়ো করে' ছ'টার মধ্যেই রান্নাবান্না প্রস্তুত করিয়ে ফেলবেন। তাঁর চরিত্রে 'হচ্ছে-হবে' বা 'গয়ংগচ্ছ' ভাব মোটেই নেই। তেমন লোক তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। যা করতে হবে তা আগে থাকতেই চটপট সেরে নাও, কাজ সেরে সময় থাকলে দু'দণ্ড না হয় গল্প কর—এই তাঁর আদর্শ।

তাঁকেও ওই দিন ওই আটটার ট্রেন ধরতে হবে। যদিও নিতাই মণ্ডলের গ্রামে তাঁর বাড়ি নয়, কিন্তু তাঁর গ্রামও স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে।

তিনি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শুলেন। বাইক আছে, সুতরাং ভয় নেই। নিতাই মণ্ডলের মতো নিড়বিড়ে লোক নন তিনি। তাছাড়া পুজো-ফুজোর অত হাঙ্গামাও নেই তাঁর! তিনি উঠবেন আর সুট করে' বাইকে চড়ে' বেরিয়ে যাবেন।

নির্দিষ্ট দিনে নিতাই মণ্ডলের গরুর গাড়ি যখন স্টেশনের গুমটির কাছে এসেছে, তখন ট্রেনটি হুস হুস করে' ছেড়ে গেল। নিতাই অসহায় ভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তাঁর। মুখে তুবড়ি ছুটতে লাগল। গাড়োয়ানটাকে গাল দিতে লাগলেন। গাড়োয়ান বেচারী কি আর বলবে! সে তো যথাসাধ্য জোরেই হাঁকিয়ে এনেছে। কিন্তু মনিবের সঙ্গে তো তর্ক করা যায় না—ঘাড় নিচু করে' বসে রইল সে। কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করার পর মণ্ডল-

www.boiRboi.blogspot.com

মশায় অনুভব করলেন ভয়ঙ্কর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। আজ না খেয়েই বেরিয়েছিলেন তিনি। চিঁড়ে আর নারকোল পুঁটুলিতে বেঁধে এনেছিলেন।

গাড়োয়ানকে বললেন—জিনিসপত্তর নিয়ে ওয়েটিং রুমে চ। আগে খেয়ে নি, তারপর যা হয় করা যাবে। তোদের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি আমার।

জিনিসপত্র নিয়ে ওয়েটিং রুমের দিকে রওনা হলেন তিনি।

নিতাই মণ্ডলের পদশব্দে ত্রৈলোক্য তরফদারের ঘুম ভাঙল। ওয়েটিং রুমের বেঞ্চির উপর ধড়মড় করে' উঠে বসলেন তিনি।

তিনি স্টেশনে এসে পৌঁছেছিলেন ভোর পাঁচটায়। পৌঁছে ওয়েটিং রুমের বেঞ্চিতে শুয়ে ট্রেনের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন, হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, খেয়াল নেই।

করুণা

অনেকদিন আগেকার কথা। তখনও আমাদের পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়নি, জনক সূর্যের অগ্নি তখনও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রদীপ্ত হ'য়ে রয়েছে, চতুর্দিক উত্তপ্ত, সবুজের লেশমাত্র নেই কোথাও। কোনও প্রাণীর জন্ম হয়নি তখনও। কোথাও কোন নদী নেই, ঝরনা নেই, হ্রদ নেই, সমুদ্র নেই। পৃথিবী তখন বিশাল একটা উত্তপ্ত গোলকের মতো ঘুরে চলেছে সূর্যের চারিদিকে। যুগ-যুগান্তের অবসান হচ্ছে কল্প-কল্পান্তে। কোথাও শান্তি নেই, স্নিগ্ধতা নেই, আনন্দ নেই, জীবনের বৈচিত্র্য নেই। জন্ম-সময়ে সূর্য তার কানে-কানে বলে' দিয়েছিলেন—তোমার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে, তোমার মধ্যে অনেক স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে। তপস্যা করো, তপস্যা করো।

পৃথিবী বুঝতেই পারেনি, তপস্যা মানে কি। কি করতে হবে তাকে। সে কেবল ঘুরে চলেছিল সূর্যের চারিদিকে। না ঘুরে উপায়ও ছিল না, একটা অদৃশ্য শক্তি ঘোরাচ্ছিলো তাকে। একটা-জিনিস কিন্তু বুঝেছিল পৃথিবী। বুঝেছিল সে অসহায়। তাই হতাশা ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিলো তার বুকের মধ্যে, মাঝে-মাঝে তা প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরিতে মূর্তও হচ্ছিলো বুক ফেটে, তার আকাশ-বাতাসকে প্রকম্পিত করে'। কিন্তু তাতে কোনও ফল হচ্ছিলো না। যে অদৃশ্য বন্ধন তাকে বন্দী করেছে তা একটুও শিথিল হচ্ছিলো না, জ্বালা একটুও কমছিল না,

www.boiRboi.blogspot.com

তার উত্তপ্ত ঊষরতায় শ্যামলতার লেশমাত্রও জাগছিল না। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, আসছিল আর যাচ্ছিলো, কিন্তু তার অন্তরের দাহ কম ছিল না একটুও। অবশেষে হঠাৎ একদিন তা কান্নায় রূপান্তরিত হলো। অতি তীক্ষ্ণ, অতি তীব্র সে ক্রন্দন, মহাশূন্য ভেদ করে' ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে তা কোথায় হারিয়ে যেতে লাগতো তা কেউ জানতো না, সে নিজেও না। তার অন্তরের জ্বালা যে কান্নায় রূপান্তরিত হয়েছে তা-ও সে জানতো না। এই কান্নাই যে তপস্যা, এও তার কল্পনাতীত ছিল। এ-তপস্যার ফল ফলেছিল। কেমন করে' ফলেছিল সেই গল্পই তোমাদের আজ বলবো।

দেবকন্যা করুণা স্বর্গের নন্দনকাননে আনমনা হ'য়ে বসেছিল সেদিন। নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গ-সুখ তার ভাল লাগছিল না। স্বর্গে কোন দুঃখ নেই, তাই সুখের কোনও স্বাদ নেই। কোনও বৈচিত্র্য নেই স্বর্গের জীবনে। পারিজাতের রূপ, মন্দাকিনীর কলধ্বনি, অপ্সরার নৃত্য, ইন্দ্রের সভা, দেবদেবীর আমোদ-প্রমোদ—সবই ছিল, কিন্তু করুণার মনে তারা আর সাড়া জাগাতে পারছিল না। করুণা কিছু একটা করতে চাইছিল, কিন্তু স্বর্গে করবার মতো কিছু তো নেই, স্বর্গে সব করা হয়ে গেছে, নূতন কাজ নেই, নূতন প্রেরণাও নেই। স্বর্গের জীবন—একঘেয়ে বিস্বাদজীবন। করুণা নন্দনকাননে আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, তার অন্তরের নিগূঢ়-লোকে ভাষাহীন একটা আগ্রহ, কিছু একা করবার আগ্রহ ধীরে-ধীরে জাগছিল কেবল। সেই ভাষাহীন ভাবকে কেমন করে' রূপ দেবে সে তাই ভাবছিল একা-একা। ভাবতে-ভাবতে মনে পড়লো বান্ধবী বিজলীর কথা। বিজলী হাসি-খুশীতে ভরা, সারা মুখখানিতে তার হাসি চিকমিক করছে সর্বদা। স্বর্গের সবাই ভালবাসে ওকে ওর এই হাসির জন্য। হাসি নয়—যেন আলো। ফিক-ফিক করে' যখন হাসে, মনে হয়, আলো জ্বলে উঠলো যেন চোখের ভিতর। এই হাসির জন্যই গম্ভীর দেবতারাও ওকে ভালবাসে। করুণার কেমন যেন আশ্চর্য লাগে। ও ভেবেই পায় না, কি করে' বিজলী এই একঘেয়ে স্বর্গলোকে এমন আনন্দে আছে। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো তার পিতা বরুণের কথা। তার মা নেই, কোনদিন ছিল কি না তাও সে জানে না। জ্ঞান হয়ে থেকে সে বাবাকেই দেখছে। বাবাকেও সে ক্বচিৎ দেখতে পায়। সৃষ্টির কাজে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত। একদিন হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন; "করুণা, তুমি নূতন ধরনের কিছু শুনতে পেয়েছো কি ?"

করুণা অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। নূতন ধরনের কি আবার শুনবে সে! স্বর্গের

পাখিদের একঘেয়ে কাকলী, মন্দাকিনীর একঘেয়ে কলতান, নন্দনকাননের একঘেয়ে মর্মরধ্বনি আর অপ্সরীদের একঘেয়ে নূপুর-নিক্কণ, এ ছাড়া আর তো কিছুই শোনা যায় না এখানে। তাই সে উত্তর দিয়েছিল, "না, নূতন ধরনের কিছুই শুনিনি তো—"

"শুনবে..."

আর বেশী কিছু বলেননি তিনি। করুণা কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি শুনবো ?"

"কি শুনবে তা আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, তোমার সেই শোনার উপর আমার ছুটি নির্ভর করছে। পিতামহ ব্রহ্মা এইটুকু শুধু বলেছেন আমাকে। দিবারাত্র খেটে-খেটে আমি পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি, সৃষ্টির এ বিশাল ভার আমার উপর দিয়ে পিতামহ নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন। তাঁর কাছে ছুটি চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, "সেটা তোমার মেয়ে করুণার উপর নির্ভর করছে। সে একদিন নূতন একটা কিছু শুনবে, আর তখনই তোমার ছুটির ব্যবস্থা হবে। এর আগে তোমার ছুটি নেই। তুমি কান পেতে রাখো, শুনবেই নিশ্চয় নূতন কিছু একটা..."

এইটুকু বলেই বরুণ চলে গিয়েছিলেন। কোন্ মহাশূন্যে কোন্ জ্যোতির্ময়লোক সৃষ্টি হচ্ছিলো নাকি। ব্রহ্মা, অগ্নি, বরুণ, মিত্র সকলেই তাই নিয়ে ব্যস্ত। বরুণা ভাবতে লাগলো, কি সে শুনবে...কবে শুনবে...

"কি ভাবছো ভাই একা বসে' ?"

হাসতে-হাসতে বিজলী এসে বসলো।

"জানি না।"

আর একটু হেসে বিজলী বললে, "কি ভাবছো তা জানো না ?"

"ঠিক জানি না...তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না।"

বিজলী এর উত্তরে কিছু বললে না, কেবল তার চোখদুটি হাসতে লাগলো।

"অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি একটা আজ। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে চলে' এলাম তোর কাছে।"

"স্বপ্ন দেখে আমার কাছে ছুটে চলে' আসবার মানে ?"

"স্বপ্নটা শোন্ আগে, তাহলেই মানে বুঝতে পারবি।"

"বল।"

"স্বপ্নে দেখলাম, আমার বর যেন তোর আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে তোর সঙ্গে-সঙ্গে

ঘুরছে। বর যখন ঘুরছে তখন আমাকেও ঘুরতে হচ্ছে। আমরা দু'জনেই যেন তোকে নিয়েই আছি।"

"তোর বর? বিয়ে হলো কবে তোর?"

"বিয়ে হয়নি। কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম হয়েছে। বরটির চেহারা—যমদূতের মতো। একটি পাথর যেন মনুষ্যমূর্তি ধরেছে। গলার স্বর শুনলে মনে হয়, পাথরটি বুঝি ফাটছে। তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হলে তোমার কোন ভয় থাকবে না, কিন্তু আমার দশাটা কি হবে ভাবো তো!"

বিজলীর চোখে-মুখে হাসি ঝিকমিক করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সে করুণার গলা জড়িয়ে বললে, "কি ভাবছিলি, বলবি না?"

"তেমন কিছু ভাবছিলাম না। শোনবার চেষ্টা করছিলাম···"

"উর্বশীর মেয়েটা বেশ বীণা বাজায় আজকাল।···বাজাচ্ছে নাকি কোথাও বসে'?"

"না।"

"তবে কি শোনবার চেষ্টা করছিলি? আসবার সময় দেখলাম, মেনকা দেবী কি একটা সুর সাধছেন। এতদূর থেকে তা তো শোনা যাবে না!"

"না, ওসব কিছু নয়।"

"তবে?"

"নূতন ধরনের কিছু একটা। ঠিক জানি না আমি।"

"অদ্ভুত মেয়ে তুই। চল্, মন্দার গাছে একটা দোল্না টাঙিয়ে এসেছি, দুল্বি চল্। নূতন ধরনের কিছুর জন্য এমন করে' কান পেতে রাখলে তা শোনা যাবে না। যখন শোনবার তখন আপনি শুনবি। চল্, এখন দোলা যাক্!"

অবশেষে একদিন শোনা গেল। কান্নার শব্দ! তীক্ষ্ণ তীব্র মর্মভেদী কান্নার শব্দ! করুণা বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলো। তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো সে। কান পেতে শুনলে খানিকক্ষণ। না, এরকম সে আগে কখনও শোনেনি। কিন্তু কি অদ্ভুত শব্দ! বুকের ভিতরটা যেন মুচড়ে-মুচড়ে উঠতে লাগলো তার। মনে হতে লাগলো, যেন একটা অদৃশ্য ছুঁচ তার কানের ভিতর দিয়ে ঢুকে, মাথা ভেদ করে' অন্তরের অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে। মনে হতে লাগলো, সে আর সহ্য করতে পারছে না। দু'কানে আঙুল দিয়ে বসে' রইলো সে। কিন্তু তবু শোনা যেতে লাগলো। কিসের শব্দ এ? এ শব্দ

www.boiRboi.blogspot.com

বেশীক্ষণ শুনলে পাগল হয়ে যাবে সে। ছুটে ঘর থেকে সে বেরিয়ে পড়লো। বেরিয়েই দেখা হলো বিজলীর সঙ্গে।

"তুই শুনতে পাচ্ছিস ?"

"কি ?"

"কি অদ্ভুত শব্দ! পাচ্ছিস না? এত জোরে-জোরে হচ্ছে তবু পাচ্ছিস না? ওই যে, ওই যে..."

বিজলী অবাক্ হ'য়ে করুণার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। করুণার চোখের দৃষ্টি কেমন হ'য়ে গেছে।

"পাচ্ছিস না ?"

"না।"

"শোন্, ভালো করে শোন্।...ওই যে, ওই যে। উঃ, কি করি আমি..."

আবার ছুটে চলে গেল সে। স্বর্গের পথে ফুলের পরাগ, সোনার রেণু ছড়ানো। তারই উপর দিয়ে পাগলিনীর মতো ছুটে চললো করুণা। মহাশূন্য ভেদ করে' পৃথিবীর যে কান্না এসে তার মর্মভেদ করছিল, সে কান্নার তীব্রতা অস্থির করে' তুললে তাকে। তার মনে হতে লাগলো, এই রোদনের শব্দ যদি বন্ধ না করতে পারে তাহলে সে পাগল হয়ে যাবে।

দেব-দেবীরা নন্দনকাননে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করতে লাগলো—"শুনতে পাচ্ছো না, শুনতে পাচ্ছো না তোমরা ?"

"কি ? পাখির গান ?"

"না, না..."

"তবে, তরুর মর্মর ?"

"না, ওই যে...ওই যে! থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও ওটাকে...আমি আর শুনতে পাচ্ছি না..."

ছুটতে-ছুটতে আবার চলে গেল সে।

অবাক্ হয়ে গেলেন দেব-দেবীরা।

পারিজাতের কুঞ্জে গিয়ে পারিজাতকে সে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি শুনতে পাচ্ছো না ?"

পারিজাত কোনও উত্তর দিলে না, তার পাতাগুলি হাওয়ায় দুলতে লাগলো কেবল, করুণার মনে হ'লো, তারা যেন বলছে—"না, কিছু শুনতে পাচ্ছি না।"

রাগে ক্ষোভে পারিজাতের কুঞ্জ ছিন্নভিন্ন করে' চলে গেল করুণা।

শেষে সত্যিই পাগল হয়ে গেল সে। দেবকন্যা পাগল হ'য়ে যাওয়াতে দেব-দেবীরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ইন্দ্র বললেন, "করুণা হবে বরুণের মানস-কন্যা। বরুণ ফিরে না-আসা পর্যন্ত ওকে একটা ঘরে বন্ধ করে' রাখা হোক। তারপর বরুণ ফিরে এসে যা ভালো বিবেচনা করবেন তাই করা হবে।"

করুণা বন্দিনী হ'য়ে রইলো একটি নির্জন ঘরে।

কান্নার শব্দটি কিন্তু একটুও কমেনি। বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। করুণা পাগল হয়ে গিয়েছিল সত্যি। সত্যি সে দেয়ালে মাথা খুঁড়ছিল, মাথার চুল ছিঁড়ছিল, কানে আঙ্গুল দিয়ে চীৎকার করছিল—"থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও ওই কান্না! আমি আর শুনতে পাচ্ছি না···পাচ্ছি না!"

কান্না কিন্তু থামছিল না। দগ্ধ-পৃথিবীর অন্তরের বাণী কান্নার রূপ ধরে' বিরাট আকাশ পার হ'য়ে স্বর্গে এসে পৌঁছোচ্ছিলো। তপস্যা অহরহ চলছিল। কান্নার শব্দ তাই থামছিল না। করুণার চীৎকার থামছিল না। সে ক্রমাগত চীৎকার করছিল—থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও, আমি আর সহ্য করতে পাচ্ছি না।

দেব-দেবীরা কেউ করুণার ঘরের দিকে যেতেন না। পাগলিনীর হাহাকার সহ্য করতে পারতেন না তাঁরা। করুণার হাহাকার স্বর্গের সৌন্দর্যকে ম্লান করে' দিয়েছিল। একজন কিন্তু রোজই তার খবর নিতে যেতো ঃ সে হচ্ছে—বিজলী। বদ্ধঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রোজই সে এসে প্রশ্ন করতো—"কেমন আছিস ভাই?"

"আমি ওই শব্দ কিছুতেই আর সহ্য করতে পাচ্ছি না। স্বর্গের দেবতারা প্রত্যেকেই শুনেছি শক্তিশালী। তাঁরা কেউ এই শব্দ বন্ধ করতে পারছেন না? এর প্রতিকার করতেই হবে, করতেই হবে, যেমন করে' হোক্ করতেই হবে···"

"পারলে তুই নিজেই পারবি, আর কেউ পারবে না। দেবতাদের দৌড় কতদূর তা জানা আছে।"

বিজলীর চোখে-মুখে হাসি ঝিকমিক করে' উঠতো।

তারপর একদিন অসম্ভব কাণ্ড ঘটলো একটা। করুণার চীৎকার থেমে গেল। বিজলী এসে দেখলে, তার ঘরের জানালা বন্ধ। করুণার নাম ধরে' ডাকলে কয়েকবার, কোন সাড়া এলো না। কি হলো? স্বর্গে মৃত্যু নেই। করুণা যে মরে' গেছে এ-কথা বিজলী ভাবতেই পারলে না। দ্বারে করাঘাত করে' বারবার সে ডাকতে লাগলো। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বিজলী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। তারপর আবার ডাকতে লাগলো।

কোন ফল হলো না। বিজলী ছাড়বার পাত্রী নয়, ক্রমাগত ডাকতে লাগলো সে। বহুবার ডেকেও যখন কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, তখন তার ভয় হলো। সে ছুটে গিয়ে খবর দিলে সকলকে। ইন্দ্রের আদেশে ঘরের কপাট ভেঙ্গে ফেলা হলো। তারপর যা দেখা গেল তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অপ্রত্যাশিত। প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। সমস্ত ঘর তুষারশুভ্র-বাষ্পে পরিপূর্ণ, আর কিছু নেই—করুণা নেই। ঘরের কপাট খোলবার সঙ্গে-সঙ্গে সেই তুষারশুভ্র বাষ্প ধীরে ধীরে বেরুতে লাগলো। দেব-দেবীরা অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে ঘর খালি হয়ে গেল। সবাই ঘরে ঢুকে দেখলেন, করুণা নেই। তারপর দেখলেন, সেই তুষারশুভ্র বাষ্পরাশি আকাশে ভাসতে ভাসতে নীচের দিকে নামছে ক্রমশ। তাঁরা তখন বুঝতে পারলেন না করুণাই মেঘ হ'য়ে পৃথিবীর দিকে নেমে যাচ্ছে।

হাজার হাজার বছর কেটে গেছে তারপর। উত্তপ্ত পৃথিবী শান্ত হয়েছে বিগলিত মেঘের শীতল স্পর্শ লাভ করে'। মেঘ—জল হ'য়ে নেমেছে পৃথিবী- বুকে, পৃথিবীর বুকের উত্তাপ আবার তাকে মেঘে পরিণত করেছে। ...বার বর্ষাধারায় নেমেছে সে, হাজার হাজার বছর এইভাবে কেটেছে। ...থিবী ঠাণ্ডা হয়েছে। পৃথিবীকে ঘিরে জলের জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এক- ...সমুদ্র, নদী, ঝরনা, উৎস, কত কি হয়েছে। তারপর এসেছে উদ্ভিদ-... । যে পৃথিবী উত্তপ্ত ঊষর ছিল, তার সর্বাঙ্গে শ্যাম কান্তি জেগেছে।

যে বন্ধ্যা ছিল সে হয়েছে জননী। প্রাণীদের জন্ম হয়েছে তারপর। ছোট-ছোট জীবজন্তু থেকে শুরু ক... বড়-বড় জীবজন্তু জন্মেছে। অনেক পরে এসেছে দানব, তারপর মা...। আরও কত কি হয়েছে। দানবের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছে। মানুষ সহায়তা করেছে দেবতাদের। বৃত্রাসুরকে বধ করবার জন্য মহামানব দধীচি নিজের অস্থি দিয়েছেন বজ্র নির্মাণের জন্য। ইতিহাসের পর ইতিহাস রচিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু করুণা যদি মেঘরূপে এসে উত্তপ্ত পৃথিবীর উপর বারিবর্ষণ না করতো এসব কিছুই হতো না।

পিতা বরুণ কিন্তু কন্যা করুণাকে ভোলেননি।

বিরাট সমুদ্রের বুকে সেদিন বর্ষার ধারা নেমেছে আকাশ থেকে। সমুদ্রের অধিপতি বরুণ, বর্ষাকে সম্বোধন করে' বললেন—"কন্যা, তুমি পৃথিবীর কান্না শুনে মেঘ হয়েছিলে বলে' সমুদ্রের জন্ম সম্ভব হয়েছে, আর আমি তাই সমুদ্রের আধিপত্য লাভ করে নির্বিঘ্নে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি। তোমাকে ভুলিনি আমি,

তোমাকে আমি নিত্য আশীর্বাদ করি। সূর্যের উত্তাপ যখন আমার সর্বাঙ্গে পড়ে তখন আমি আবার তোমাকে সৃষ্টি করি নবরূপে। তোমাকে আমি ভুলিনি…"

ঝরঝর শব্দে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের ঘনঘটায় আকাশ পরিপূর্ণ।

"আমরাও ভুলিনি তোমাকে। এই দেখ, আমার স্বামীটি তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে। অনেকদিন আগে ঠিক এই স্বপ্নই দেখেছিলাম, মনে নেই?"…বিজলী চকমক করে উঠলো। বজ্রের গর্জন শোনা গেল। বজ্রের সঙ্গে বিজলীর বিয়ে হয়েছিল। করুণা কোন উত্তর দিলেন না। অসংখ্য বৃষ্টিধারায় সে কেবল নিজেকে বিলিয়ে দিতে লাগলো।

অসম্ভব গল্প

অভয় হঠাৎ যখন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তখন তার বাড়ির লোকেরা ছাড়া আর সবাই যেন খুশীই হ'ল মনে মনে; পাড়ার থিয়েটার পার্টিতে অভয় অভিনয় ক᷊ তারা অবশ্য দুঃখিত হ'ল খুব। কারণ চমৎকার অভিনয় করত অভয়। নূতন এক৮. নাটকে গিয়াসুদ্দিন বলবনের ভূমিকা নিয়েছিল সে। পাড়ার অধিকাংশ লোকেং ন্তু ভাবলেন—ঠিক হয়েছে, যেমন বাহাদুরি করতে যাওয়া। পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা যখন দের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করছে, তখন উনি এখানকার মুসলমানদের ওপর দ দেখিয়ে তাদের সভায় খাবার বিলি করতে গেছেন। গভর্নমেণ্ট তো পুলিস পাহ৷ দিয়ে ওদের ষোড়শোপচারে পূজো করছেনই, তোর আবার বাহাদুরি করে' পুলি র চোখ এড়িয়ে সেখানে খাবার দিতে যাওয়া কেন? ওসমানের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়িস লই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে? পাগল না ক্ষ্যাপা। ওরা যে কি ভয়ানক জাত া' কি অজানা আছে কারও? পাড়ার অধিকাংশ লোকেই প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এই অভিমত ব্যক্ত করলেন। অভয় যেদিন বাড়ি ফিরল না সেদিন সবাই ভাবলে মুসলমান গুণ্ডার ছোরার ঘায়ে শেষ হয়ে গেছে ছোকরা! হয়তো পুঁতে ফেলেছে লাশটা, কিংবা ফেলে দিয়েছে কোথাও, ড্রেনে, পুকুরে, নয়তো গঙ্গায়।

…কাগজে কাগজে নিরুদ্দিষ্ট অভয়ের ছবি বেরুল যথারীতি। পুরস্কার ঘোষণা করে অভয়ের বাবা বেতারে আর কাগজের অফিসে ঘুরলেন, সন্ধান করলেন থানা এবং হাসপাতালে, কিন্তু অভয়ের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

অভয় আর ফিরল না। পাড়ার অভিজ্ঞ লোকেরা, বিশেষ করে কোটপ্যান্ট পরা সেই সব চাকুরের দল, যারা ইংরেজ আমলের পরাধীনতা মোহে এখনও মুগ্ধ, 'স্টেটসম্যান' ছাড়া অন্য কাগজ পছন্দ হয় না যাঁদের, বাইরে তাঁরা মনে মনে অভিজ্ঞ মুচকি হেসে বাইরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন অভয়ের বাবাকে।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের যে গ্রামে দারোগার সামনে হিন্দু নরনারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়ে গেছে, সেই গ্রামে যে ঘটনাটা ঘটল তার খবর কোন কাগজেই প্রকাশিত হল না। এসব খবর নাকি পাকিস্তানী খবরের কাগজে বেরোয়ও না।

মুসলমানের মুখোশ পরা সেই পিশাচ দারোগাটা রাত্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছিল বাইরের ঘরে। হ্যাঁ, বেশ নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে একাই শুয়েছিল লোকটা, ভয় আর কাকে করবে, সব কাজের তো শেষ হয়ে গেছে। রক্তের দাগ পর্যন্ত ধুয়ে ফেলা হয়েছে। চাঁদ হাসছিল আকাশে। গভীর রাত্রি। খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া ঢুকছে। আরামে নাক ডাকাচ্ছিল দারোগা।

জানালা দিয়ে টপ্ করে' ঘরে লাফিয়ে ঢুকল কে যেন। মুখে ঘন কালো গোঁকদাড়ি, হাতে শানিত ছোরা। ঘরে ঢুকেই সে নিমেষের মধ্যে সেই ঘুমন্ত দারোগার বুকে চড়ে বসল। টুঁটি চেপে ধরল বাঁ হাতের মুঠি দিয়ে।

আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল ভয়ার্ত দারোগা।

"কে, কে তুমি—"

"আমি দিল্লীর স্থলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন, ইসলাম ধর্মের মাথা হেঁট করেছ তুমি কাপুরুষ। তোমাকে শাস্তি দিতে এসেছি—"

পরমুহূর্তে শানিত ছোরা আমূল বসে গেল দারোগার বুকে। তারপরই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে, তার গোঁফদাড়ি খুলে গেল। ছুটে এল দারোগার রক্ষীরা।

অভয়ের মৃতদেহটাকেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল পিশাচেরা। ষোল বছরের ছেলে অভয়।......সত্যিই কি অভয় মরেছে?

খোকনের স্বপ্ন

রাত্রে খোকন ছাতে শুয়েছিল। অগণ্য নক্ষত্র উঠেছে আকাশে। অসংখ্য। ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে। কি অদ্ভুত সমারোহ! লক্ষ কোটি মণিমাণিক্য কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে কালো মখমলের উপর। অবাক্ হ'য়ে দেখছিল খোকন। পাশে শুয়েছিলেন তার কাকা। এম্. এস্. সি. পাস করেছেন সম্প্রতি। নামকরা ভাল ছেলে। খোকন কাকাকে জিজ্ঞাসা করলে—"কাকা, ওই নক্ষত্রগুলো কি?"

"ওরা প্রত্যেকটা এক একটা সূর্য।"

"তাই নাকি! প্রত্যেকটা?"

"চাঁদ মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো—এই কটা গ্রহ আমাদের পৃথিবীর মতো। বাকী সব সূর্য। অধিকাংশই আমাদের সূর্যের চেয়ে বড়।"

"ওই সাদা মতন চলে গেছে ওটা কি?"

"ছায়াপথ। ওতেও অনেক নক্ষত্র আছে, তাছাড়া আছে নেবুলা, যার বাংলা নাম নীহারিকা—

কাকা বলতে লাগল। খোকন শুনতে লাগল অবাক্ হয়ে। "আমাদের সূর্য নাকি পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। সূর্যের চেয়েও বড় বড় ওই নক্ষত্রগুলো, অত দূরে আছে বলে' ছোট দেখাচ্ছে। অনেক দূরে আছে। এত দূরে যে মাইল দিয়ে তা বলা যায় না। কার আলো কতক্ষণে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তাই দিয়ে ওদের দূরত্ব বলা হয়। আমাদের সূর্যের আলো আসে কয়েক মিনিটে। কোনও নক্ষত্রের আলো দু'বছরে কারও বা চল্লিশ বছরে, কারও বা তার চেয়ে বেশি! বিরাট বিরাট জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড সব মহাশূন্যে ছড়ানো রয়েছে অজস্র। দাউ দাউ করে' জ্বলছে কতদিন থেকে তা ঠিক কেউ জানে না! প্রত্যেকটাই জ্বলন্ত শিখা লক্ লক্ করছে।"

খোকনের ভয় করতে লাগল। সে ছাত থেকে নেবে গেল ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমাও শুয়েছিলেন আকাশের দিকে চেয়ে, তাঁর বিছানার পাশে যে খোলা জানালাটা ছিল তাই দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আকাশের খানিকটা।

"ওই নক্ষত্রগুলো কি জান ঠাকুমা? কাকা বললে—" কাকা যা যা বলেছিল সবিস্তারে বর্ণনা করে' গেল সে। সমস্ত শুনে ঠাকুমা মন্তব্য করলেন—"কাকা তো সব জানে!"

"কি তাহলে ওগুলো—"

ঠাকুর যা বললেন তা আরও বিস্ময়কর।

ওই ছায়াপথ দিয়ে আসবে নাকি রাজপুত্র। তাই আলো জালিয়ে রেখেছে দেবতারা।

গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল খোকন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে যা স্বপ্ন দেখলে তা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক।

……চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্ষত্রের মশাল জ্বলেছে। অসংখ্য জ্বলন্ত শিখার উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে চতুর্দিক। দূরে দূরে কালো মেঘের স্তূপ, তাতে আগুন লেগেছে যেন। বজ্রের বাজনা বাজছে। মেঘের পিছনে শোনা যাচ্ছে ঝড়ের গর্জন। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন লক্ষ লক্ষ শাঁখ বাজছে।…… ছায়াপথ দিয়ে রাজপুত্র আসছে…ওই যে…মাথায় সোনার মুকুট, হাতে তলোয়ার। নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে রাজপুত্র, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই…ওই আসছে…। কাছে এল যখন, তখন খোকন অবাক্ হয়ে গেল। রাজপুত্র অপর কেউ নয়, সে নিজেই। তারই মাথায় সোনার মুকুট, হাতে তলোয়ার, সে বেরিয়েছে দিগ্বিজয়ে।

পাখী

"এই, তোমার নাচ বন্ধ কর—"

সিংহ সগর্জনে আদেশ করলেন ময়ূরকে। কিন্তু ময়ূর নাচতেই লাগল, মনে হ'ল যেন পশুরাজের আদেশ শুনতেই পায়নি।

"বন্ধ কর তোমার নাচ। আমার রাজকার্যের বিঘ্ন হচ্ছে—"

ময়ূর নাচতে লাগল। কাছেই ময়ূরী রয়েছে, থামবে কি করে।

"বন্ধ কর।"

ময়ূর শোনে না।

সিংহের গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হ'য়ে উঠল।

"বন্ধ কর—বন্ধ কর—বন্ধ কর—"

ময়ূরের ভ্রূক্ষেপ নেই।

সিংহ এক লম্ফ দিয়ে তেড়ে গেল ময়ূরটাকে। ময়ূর ময়ূরী উড়ে গিয়ে বসল একটা উঁচু গাছের ডালে। ছোট একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছিল

সেখান থেকে। সেই দিকে উড়ে গেল তারা। সেখানে চমৎকার উপত্যকা ছিল একটা চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের সানুদেশে ঘন সবুজ মেঘ নেমেছে যেন। ময়ূর আবার নাচ শুরু করল। ময়ূরী ঘুরতে লাগল আশেপাশে।

সিংহের আত্মসম্মানে কিন্তু আঘাত লেগেছিল ভয়ানক। মন্ত্রী ব্যাঘ্রকে ডেকে তিনি বলিলেন—"আমি রাজা, কিন্তু আমার কথা ওই সামান্য ময়ূর গ্রাহ্যই করল না! এতে ভয়ানক অপমানিত হয়েছি আমি। ওকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা কর—"

"নিশ্চয় করব। ওই ময়ূর জাতটাই বড় খারাপ। আমি যখন শিকার করতে বেরুই, চীৎকার করে' করে' সব প্রাণীদের সাবধান করে' দেয়। রাজন, আপনি যখন আদেশ করেছেন তখন এর ব্যবস্থা করব আমি।"

দুই

দিন দুই পরে এক শৃগাল এসে ময়ূরকে নমস্কার করল। ময়ূর মাঠে চরছিল, শৃগালকে দেখে সে উড়ে গাছের ডালে বসল।

শৃগাল সবিনয়ে বলল, "আপনি গুণী লোক, আপনার গুণের সমাদর করবার সামর্থ্য আমার নেই। তবু আমার সঙ্গে আপনাকে একবার আমার বাসায় যেতে হবে।"

"কেন?"

"আমার গৃহিণীর সম্প্রতি সন্তান হয়েছে। সন্তান হবার পর কেমন যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার। কাক আমাদের চিকিৎসক। সে বললে ওকে যদি ময়ূরের নাচ দেখাতে পার তা হলে উনি সেরে উঠবেন।"

ময়ূর কেকারবে হেসে উঠল।

তারপর বলল, "শৃগাল মহাশয়, আপনাকে এই বনের কে না চেনে? আপনার গৃহিণী অসুস্থ শুনে দুঃখিত হলাম। কিন্তু আপনি একটা কথা বোধ হয় জানেন না, আমি নাচি কেবল আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করবার জন্য। অন্য কোন কারণে আমি নাচতে পারি না, আমার নাচ আসেই না।"

শৃগাল ফিরে গেল। তার গর্তের কাছে যে জঙ্গলটি ছিল সেই জঙ্গলে আত্মগোপন করে বসেছিল বাঘ সিংহ দু'জনেই। তারা ভেবেছিল ময়ূর যখন শৃগালের গর্তের সামনে পুচ্ছ বিস্তার করে নাচবে, তখন তারা লাফিয়ে পড়বে তার উপরে। কিন্তু তাদের এ ষড়যন্ত্র বিফল হ'য়ে গেল!

www.boiRboi.blogspot.com

তিন

তার পরদিন গেল একটা সাপ।

সাপ ময়ূরের খাদ্য। তাকে দেখেই ময়ূর উদ্যত-চঞ্চু-নখর হ'য়ে তেড়ে গেল। কিন্তু সাপটি ছিল ক্ষিপ্রগতি। সে ঘাসের ভিতর দিয়ে ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে আত্মগোপন করে' এগিয়ে যেতে লাগল। সোনার হরিণের পিছু পিছু রামচন্দ্র যেমন ছুটেছিলেন, সাপের পিছু পিছু তেমনি করে' ছুটতে লাগল ময়ূর। একটা বনের ধার দিয়ে একাগ্র মনে সে ছুটে চলেছে, এমন সময় হঠাৎ চতুর্দিকে প্রকম্পিত করে' গর্জন উঠল একটা। পরক্ষণেই সিংহ লাফিয়ে পড়ল ময়ূরের উপর। কিন্তু ধরতে পারল না ময়ূরকে। ময়ূর নিমেষের মধ্যে উড়ে গিয়ে বসল একটা গাছের উপর। তারপর সিংহকে সম্বোধন করে' বলল—"মহারাজ, আপনার এ রকম দুর্ব্যবহারের কারণ কি বলুন—"

"তুমি আমাকে অপমান করেছ—"

"আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করবার জন্যে আমি নেচে থাকি। এতে যদি আপনি অপমানিত বোধ করেন তা হলে তো আমি নাচার। আপনি সিংহিনীকে ভোলাবার জন্য যখন কেশর ফুলিয়ে, ল্যাজ নেড়ে গর গর গর্‌র্ শব্দ করেন—তখন তো আমি অপমানিত বোধ করি না।"

"আমি তোমাকে নাচতে মানা করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার মানা শোননি, তোমার রাজার আদেশ তুমি অমান্য করেছ, সে জন্যই আমি অপমানিত বোধ করছি—"

"কিন্তু মহারাজ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনি পশুদের রাজা। আমি পশু নই, পাখি—"

সিংহ স্তম্ভিত হ'য়ে রইল খানিকক্ষণ।

"তাহলে তুমি ভিন্ন দেশের প্রাণী আমার দেশে এসে রয়েছ? তোমার পাসপোর্ট কই, ভিসা কই?"

ময়ূর তার পাখা দুটি নেড়ে দেখাল।

তারপর বলল, "মহারাজ, আমাদের আপনি তাড়াতে পারবেন না। আমরা থাকবই। জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র বিচরণ করবার বিধিদত্ত অধিকার আমাদের আছে। এ কথা ভুলবেন না। আর একটা কথাও আপনাকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করছি। আপনি আজ আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন, এর প্রতিশোধ আমি নেব।"

www.boiRboi.blogspot.com

"সামান্য একটা পাখি, তুমি প্রতিশোধ নেবে? হা হা হা—"

সিংহের অট্টহাস্যে বনস্থল প্রকম্পিত হ'তে লাগল।

চার

কয়েকদিন পরে।

সিংহ একটি মেষশাবককে মেরে খাওয়ার যোগাড় করছে, এমন সময় আকাশ থেকে নেমে এল একটা প্রকাণ্ড ঝড়, ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল মেষশাবকটাকে। সিংহ সবিস্ময়ে দেখলে বিরাট এক ঈগল পক্ষ-বিস্তার করে স্থির হ'য়ে রয়েছে—আকাশ-পটে। তার পায়ের নখর থেকে ঝুলছে মেষশাবক।

ঈগল বলল, "পশুরাজ সিংহ, তোমরা স্থলচর জীব। অতিশয় সীমাবদ্ধ তোমাদের শক্তি। আমরা আকাশচারী, আমরা শিল্পী, আমরা কবি, আমরা যোদ্ধা। আমার একজন প্রজাকে অপমান করে' তুমি সমস্ত পক্ষীজাতিকে অপমান করেছ। তাই তোমাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আমি নীচ নই। পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খাই না। এই নাও তোমার খাবার—"

শূন্য থেকে মেষশাবকটা থপাস্ করে' এসে পড়ল বিস্মিত সিংহের সম্মুখে। সিংহ নির্বাক হ'য়ে বসে' রইল।

একালের রূপকথা

ছুটির দিন। রমেন একটা রূপকথার বই পড়ছিল শুয়ে শুয়ে। সেই পুরাতন চার বন্ধুর গল্পটা। পড়তে পড়তে তার মনে হচ্ছিল, "মন্তু, হাবুল, গণশা আর আমি, আমরাও তো চার বন্ধু, কিন্তু আমরা তো রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র আর পাত্রপুত্র নই! আমার বাবা কর্পোরেশনের ক্লার্ক, মন্তুর বাবা ডাক্তার, হাবুলের বাবা ওভারশিয়ার আর গণশার বাবা দালাল। আমাদের নিয়ে কি আর রূপকথা হয়? তাছাড়া আমরা অমন পক্ষিরাজই বা পাব কোথা? আকাশ-পথে অমন হু-হু করে উড়ে যাওয়া সে কি আর সম্ভব আমাদের পক্ষে? নাঃ, এ যুগে আর রূপকথা হয় না। হাবুলের ইচ্ছে এরোপ্লেনের পাইলট হবার, ও হয়তো কোন দিন আকাশ-পথে হু-হু করে উড়বে। কিন্তু সে ওড়া চাকরির ওড়া, তাতে কি আর রূপকথা হয়?"

এই সব ভাবতে ভাবতে রমেন ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুমের ভিতর রূপকথা এসে দেখা দিল স্বপ্ন হয়ে।

টেলিগ্রাম নয়, একটি ছোট্ট পরী এসে ঢুকল রমেনের পড়ার ঘরের কপাট ঠেলে।

"আপনিই রমেনবাবু?"

"হ্যাঁ।"

"হাবুলবাবু চিঠি দিয়েছেন একখানা। মন্টুবাবু আর গণেশবাবু থাকেন কোথায় বলুন তো, তাঁদের নামেও চিঠি আছে।"

মন্টু আর গণেশের ঠিকানাটা বলে দিলে রমেন।

প্রজাপতির মতো ডানা মেলে পরী উড়ে চলে গেল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, রমেন এতে আশ্চর্য হ'ল না একটুও। টেলিগ্রাম, টেলিফোন বা রেডিও দেখে সে কি আশ্চর্য হ'ত? এ দেখেই বা হবে কেন? পরীরা উড়ে উড়ে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেককে চিঠি দিয়ে আসবে এইটাই তো বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার।

হাবুল লিখেছে—"রমেন, ক'দিনের ছুটি পেয়েছি। প্লেন নিয়ে বেড়াতে বেরোব। তোমাদেরও যেতে হবে। পরশু দিন সকাল বেলা আমাদের বাড়ির ছাতে তৈরী হ'য়ে থেকো। মন্টু আর গণেশকেও খবর পাঠালাম। তুমিও তাদের বলে দিও নিজে গিয়ে। যেতেই হবে সক্কলকে। আমি কেমন প্লেন চালাতে শিখেছি, দেখিস্। হিমালয় থেকে কুমারিকা আর গুজরাট থেকে আসাম চক্কোর দিয়ে আসা যাবে।"

আনন্দে নেচে উঠল রমেনের মন। এরোপ্লেনে চড়ে' ভারত-ভ্রমণ!

নির্দিষ্ট দিনে সকাল বেলা তিনজনে গিয়ে হাবুলের বাড়ির ছাতে গিয়ে বসে রইল। আজকাল এরোপ্লেনে চড়বার জন্যে এরোড্রোমে যাবার দরকার হয় না। ছাত একটু বড় হলেই তাতে এরোপ্লেন নামাতে পারে। আকাশের দিকে চেয়ে বসে' রইল তিনজনে। ওটা কি চিল? চিল কি অত বড় হয়? বোঁ বোঁ করে' ছাতের দিকেই তো ছুটে আসছে! গুররর্, গুররম্···শব্দও পাওয়া গেল ক্রমশ। দেখতে দেখতে এসে পড়ল হাবুল। বাঃ, কি চমৎকার প্লেনটি ওর, যেন জীবন্ত একটি রাজহংস! টুক করে এসে নাবল ছাতের উপর। নাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজহংস ডানা দুটি তুলে ধরল। হাবুল বসে আছে। আর তিনটি খালি সীট।

"দেরি করিস্ না, চট্ করে' আয়!"

www.boiRboi.blogspot.com

উঠে বসল তারা। রাজহংস ডানা মেলে উড়ল আবার। মাঠ বন নদী পাহাড় সমুদ্র মরুভূমি পার হয়ে উড়ে চলল, কখনও ভোরের আলোয়, কখনও চাঁদের আলোয়, কখনও মেঘের ভিতর দিয়ে, কখনও রামধনুর ভিতর দিয়ে, নক্ষত্রালোকে, সূর্যালোকে—কতদিন কতরাত্রি যে চলল তার ঠিক নেই। রমেনের মনে হতে লাগল, যুগযুগান্ত পার হয়ে গেল বুঝি! কোথায় চলেছে হাবুল?

"কোথায় যাচ্ছি ভাই আমরা?"

"নিরুদ্দেশ যাত্রা আমাদের।"

সামনের দিকে চেয়ে স্টিয়ারিং ধরে চুপ করে বসে রইল হাবুল। রমেন চেয়ে দেখলে, একটু নীচে পেঁজা-তুলোর বিরাট একটা স্তূপ শূন্যে ঝুলছে যেন!

"এই রে—"

হঠাৎ চীৎকার করে' উঠল হাবুল।

"কি হল?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

হু-হু করে নীচের দিকে নামতে লাগল রাজহংস।

"ক্র্যাশ্ হ'ল নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল চারজনেই। কিন্তু কি আশ্চর্য, কেউ মরল না। রাজহংস কিছুদূর নেবেই খুব আস্তে আস্তে নাবতে লাগল। শেষে মনে হ'ল কে যেন তাকে কোলে করে' নাবিয়ে নিলে! একটু শব্দ পর্যন্ত হ'ল না।

নেবে পড়ল চারজনেই। নেবে আরও অবাক্ হ'য়ে গেল, চারিদিকে মখমল বিছানো! অবাক্ কাণ্ড! এ কোথায় এসে হাজির হ'ল তারা? চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল—কেবল মখমল আর মখমল! ঘাস নেই, সবুজ মখমলের গদি কেবল! চুমকি-বসানো, জরি-বসানো, কত রকমের!

হাবুল বললে—"একটা 'নাট্' আলগা হ'য়ে পড়ে' গেছে মনে হচ্ছে। এখানে কি পাওয়া যাবে? চল খোঁজ করা যাক।"

হাঁটতে লাগল চারজন।

মনু বলল—"মখমলের উপর দিয়েই হাঁটবি? যা ময়লা জুতো আমাদের—"

গণেশ বললে—"তাছাড়া হাঁটাই যে যাচ্ছে না ভাল করে'। মখমলের গদির উপর দিয়ে হাঁটা যায় কখনও? শক্ত মাটির উপর হাঁটা অভ্যেস আমাদের।"

হাবুল বললে—"তবু হাঁটতেই হবে। 'নাট্' চাই একটা।"

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। না হলে বাবা বকবে ভাই! আমি বাড়িতে কিছু বলে আসি নি"—রমেন বললে অপ্রস্তুত হাসি হেসে।

হাঁটতে লাগল তারা। হাঁটতে হাঁটতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল শেষে।

মন্টু বললে—"অনেক দিন আগে একবার বালির চড়া ভাঙতে হয়েছিল আমাকে। কষ্ট হয়েছিল খুব। কিন্তু এত হয় নি—বাপ্‌স্‌!"

মখমলের গদি মাড়িয়ে হেঁটে চলল তারা। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর একটা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড চোখে পড়ল তাদের। বড় বড় হীরের অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'টাকার দেশ'। কি উজ্জ্বল অক্ষরগুলো!

"দেখ দেখ ওটা কি"—মন্টু বলে উঠল হঠাৎ। সকলে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে আকাশচুম্বী বিরাট একটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত চকচক করছে যে চাওয়াই যায় না তার দিকে! মনে হচ্ছে বরফ, রুপো আর চাঁদের আলো গলিয়ে তৈরী হয়েছে সেটা। তার উপর পড়েছে সূর্যের কিরণ।

হাবুল বৈজ্ঞানিক লোক। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বললে—"প্ল্যাটিনামের তৈরী। চল, ওই দিকেই যাওয়া যাক। একটা গেটও আছে মনে হচ্ছে—"

"ওপাশে আরও একটা গেট আছে।"

"চল—"

আবার হাঁটতে শুরু করলে চারজনে।

সেই মখমলের তেপান্তর পার হ'য়ে প্ল্যাটিনামের প্রাচীরের কাছে পৌঁছতে যুগযুগান্ত কেটে গেল রমেনের মনে হ'ল। প্রাচীরের কাছে এসে তারা যখন পৌঁছল অবশেষে, তখন চারজনেই এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে যে আর কারো পা উঠছে না। মন্টু, গণেশ, রমেন তিনজনে বসেই পড়ল। হাবুলের বসতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সে কাজের লোক, ভাবলে একটা গেটের ভিতরে ঢুকে একটু খোঁজ করে' আসা যাক আগে। একটা 'নাটু' না পেলে তো ফেরাই যাবে না এখান থেকে।

"তোরা এখানে বোস, বুঝলি। আমি একবার ভিতরে ঢুকে একটু দেখে আসি কি ব্যাপার! 'নাটু' একটা যোগাড় করতেই হবে কোনও রকমে।"

"বেশী দেরি করিস না যেন!"

"আমরা আর পারছি না ভাই, একটু জিরিয়ে নিই।"

"বেশ, বোস তাহলে, আমি আসছি।"

হাবুল যখন যাচ্ছে তখন এক টুকরো আলো এসে পড়ল তার পায়ের কাছে।

কিন্তু সেটাকে লক্ষ্যই করলে না কেউ। হাবুল ডান দিকের গেটটা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

হাবুল ভিতরে ঢুকে অবাক্ হয়ে গেল। এটা এরোপ্লেনের কারখানা না কি? আশ্চর্য কারখানা! প্রকাণ্ড বড় বড় সোনার থালায় এরোপ্লেনের জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে রাস্তার দু'ধারে! অথচ মানুষ একটিও নেই!

একটু এগিয়ে সে দেখলে, যে 'নাট্' সে খুঁজছিল তা স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে একটা সোনার থালায়। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সে একটা তুলে নিলে। তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল একটা। হাবুল নিজেই 'নাট্' হয়ে সেই নাটের স্তূপে মিশে গেল!

অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও যখন হাবুল ফিরল না তখন মনু চিন্তিত হ'ল খুব। তার খুব পিপাসা পেয়েছিল। রমেন আর গণেশ মখমলের গদির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। গণেশের নাক ডাকছিল।

মনু ভাবলে, "ওদের আর ওঠাব না এখন, বেচারারা ঘুমুচ্ছে ঘুমুক। আমি দেখি ভেতরে যদি শরবত-টরবত পাওয়া যায়।"

মনু উঠে যখন যাচ্ছে তখনও তার পায়ের কাছে সেই আলোর টুকরোটা এসে পড়ল। কিন্তু সে গ্রাহ্য করলে না তত। সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল ডান দিকের গেটটায়, হাবুল একটু আগে যেটা দিয়ে ঢুকেছিল। ভেতরে ঢুকে সে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। তার মনে হ'ল এটা শরবতের দোকান না কি? বড় বড় সোনার থালায় স্ফটিকের গ্লাসে সারি সারি শরবত সাজানো রয়েছে। কি চমৎকার দেখতে, দেখলেই খেতে ইচ্ছা করে! কিন্তু লোকজন কোথাও কেউ নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আর সে স্থির থাকতে পারলে না। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল বেচারার। কিন্তু যেই সে একটি গ্লাসে হাত দিয়েছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে এক গ্লাস শরবত হয়ে গেল!

গণেশের ঘুম ভাঙল খিদের চোটে। সে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে—হাবুল, মনু নেই, রমেন ঘুমুচ্ছে।

"ওরে ওঠ, ওঠ, মনু আবার কোথায় গেল? হাবুলও এখনও ফেরেনি দেখছি!"

রমেন উঠে বসল।

গণেশ বলল, "বড্ড খিদে পেয়েছে ভাই! চল্, ওঠা যাক্। মনু কোথা গেল বলতো?"

"হাবুলকে খুঁজতে গেছে হয়তো।"

"চল, আমরাও যাই।"

দু'জনে উঠে পড়ল। একটু গিয়ে রমেন বলল, "আমাদের একজনের কিন্তু থাকা উচিত। ওরা যদি ফিরে আসে, আমাদের কাউকে না দেখতে পেলে আবার ভাবনায় পড়বে।"

"বেশ, তুই বোস তাহলে। আমি একটু ঘুরে আসি। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, দেখি যদি খাবার পাওয়া যায় কোথাও।"

"বেশ।"

গণেশ যখন যাচ্ছিল তখনও তার পায়ের কাছে সেই আলোর টুকরোটা এসে পড়ল, কিন্তু গণেশ সেটা দেখেও দেখলে না। গণেশ খাবারের স্বপ্ন দেখছে তখন। অন্য কিছু দেখবার তার অবসর কোথায়? ডানদিকের গেট লক্ষ্য করে' হন হন করে' এগিয়ে গেল সে।

গেটে ঢুকেই দেখলে কি আশ্চর্য, চারদিকেই যে খাবার! সোনার থালায় সাজানো নানা রকম খাবার। সন্দেশ রসগোল্লা তো আছেই, আরও কত রকম মিষ্টান্ন! যেমন রং তেমনি সুগন্ধ। শুধু কি মিষ্টান্ন? নিমকি কচুরি সিঙ্গাড়া চপ কাটলেট ডেভিল ফ্রাই—প্রচুর পরিমাণে থরে থরে সাজানো রয়েছে।

গণেশের মুখ লালায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু দোকানদার কই? কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গে টাকা রয়েছে, সামনে খাবার, কিন্তু…। যা থাকে কপালে বলে গণেশ রসগোল্লার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু যেই রসগোল্লায় হাত দিয়েছে আর অমনি সে নিজেই রসগোল্লা হয়ে গেল!

রমেন অনেকক্ষণ বসে রইল, কেউ আর ফেরে না। অন্ধকার হ'য়ে এল ক্রমশ। তার মনে হ'ল, আর তো এমন ভাবে অপেক্ষা করা উচিত নয়। খিদে পেয়েছে বেশ। উঠে পড়ল সে, ডান দিকের গেটের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল।

সেই আলোর টুকরোটাও আবার এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। অন্ধকার হয়েছিল বলেই হোক কিংবা যে কারণেই হোক, রমেন ভাল করে' চেয়ে দেখলে সেটার দিকে। টর্চ ফেলছে নাকি কেউ? চেয়ে দেখলে, একটা আলোর রেখা বাঁ-দিকের ভেতর থেকে আসছে।

আবার আলোর টুকরোটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে সে। এবার দেখতে পেলে, কি যেন লেখা রয়েছে আলোর অক্ষরে! ঝুঁকে দেখলে লেখা আছে—"ডান দিকের গেটে খবরদার ঢুকো না। বাঁ-দিকের গেটে এস।"

www.banglabooks.blogspot.com

রমেন ইতস্ততঃ করে' বাঁ-দিকের গেটে ঢুকল গিয়ে। গেটের ভিতর ঢুকে দেখে, সামনেই একটি চমৎকার বাড়ি। সেই বাড়ির ছাতে প্রকাণ্ড টর্চ হাতে করে' একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটিকে দেখেই ভাল লাগল রমেনের। যেমন চোখ মুখ নাক, তেমনি রং, প্রশস্ত ললাটে যেন মহিমা জ্বলজ্বল করছে!

রমেনকে দেখতে পেয়েই ছেলেটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। সে রমেনকে হাতছানি দিয়ে ডেকে ছাত থেকে নেমে এল। রমেন কাছে যেতে আবার সে হাতছানি দিয়ে ডাকল। একটু অবাক্ হ'ল রমেন। ছেলেটি বোবা নাকি?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিতরে ঢুকে রমেন দেখতে পেল, ছেলেটি একটি বাংলা টাইপরাইটারে বসে খটাখট্ করে' কি যেন লিখে চলেছে। রমেন ঢুকতেই মুচকি হেসে ইঙ্গিতে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললে। বিস্মিত রমেন বসল। ছেলেটি টাইপ করতে লাগল দ্রুতবেগে। টাইপ করা হ'য়ে গেলে কাগজখানা বার করে' এনে রমেনের সামনে ধরে' দিল সে।

রমেন পড়তে লাগল—"আমার নাম সুবুদ্ধি। আমি বোবা নই, কিন্তু এদেশে আমার কথা কইতে মানা। এ কামনা-যক্ষিণীর দেশ! আমাকে এরা বন্দী করে' রেখেছে। হয় তো মেরেই ফেলত, কিন্তু আমি অমর, আমাকে নিঃশেষ করা যায় না। আমাকে ধরে' এনে এরা নানা রকম যন্ত্রণা দিচ্ছিল। যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে শেষে আমি এদের বললাম—"আমাকে যন্ত্রণা দিও না, আমাকে কি করতে হ'বে বল।" এরা বললে, "তুমি শুধু চুপ করে' থাক, আর কিছু চাই না।" আমি বললাম, "বেশ, আমি চুপ করে' থাকতে রাজী আছি, যদি তোমরা আমাকে সময় কাটাবার জন্যে বই খাতা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এনে দাও। চুপ করে' বসে থাকব কি করে'?" তাতেই তারা রাজী হ'ল। এই বাড়িতে আমার ল্যাবরেটরি আছে। লাইব্রেরিও আছে। ল্যাবরেটরিতে আমি অনেক জিনিস তৈরি করেছি। যে টর্চের আলো ফেলে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি, সেটাও আমারই তৈরী। এ ভয়ানক দেশ, এখানে যে যা কামনা করে' আসে, তাই হ'য়ে যায়, মানুষ থাকে না আর। হাবুল 'নাটু' হ'য়ে গেছে, মনু হয়েছে শরবত, গণেশ রসগোল্লা। আলো ফেলে ফেলে ওদের সাবধান করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওরা কেউ আমার ইশারা বুঝলে না। যাক, তুমি যখন আমার ইঙ্গিত বুঝে এখানে এসে পড়েছ তখন

তোমার আর ভয় নেই। এমন কি, হয়তো তুমি এদের সকলকে উদ্ধারও করতে পারবে।"

রমেন কাগজ পড়া শেষ করে' সুবুদ্ধির দিকে চাইলে। দেখতে পেলে সে একটা পেন্সিল নিয়ে বসে আছে, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে। তার বিস্ময় যদিও সীমা অতিক্রম করে' গিয়েছিল তবু সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়নি!

সে বললে, সবাইকে না পারি, হাবুল, মন্টু আর গণেশকে তো উদ্ধার করতেই হবে। আমাকে কি করতে হবে বলুন।"

সুবুদ্ধি লিখে উত্তর দিলে—"দুঃসাধ্য সাধন করতে হবে। কিন্তু সকলে এ দুঃসাধ্য সাধন ত করতে পারবে না! যে মিথ্যুক, যে চোর, যে পরশ্রীকাতর, তার দ্বারা এ কাজ হবে না।"

"আমি মিথ্যুক নই, চোর নই, পরশ্রীকাতর নই। কি করতে হবে আমাকে বলুন না!"

"অন্যমনস্ক হলেও চলবে না।"

"আমি মোটেই অন্যমনস্ক নই।"

"সাহসীও হওয়া চাই।"

"কি করতে হবে বলেই দেখুন না, আমি পারি কি না।"

"সে খুব শক্ত কাজ—"

"বলুনই না।"

"কামনা-যক্ষিণীর মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে হবে। কোনও সত্যবাদী সচ্চরিত্র লোক যদি তার মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই যক্ষিণীর মৃত্যু হবে। আর তার মৃত্যু হ'লে সবাই বেঁচে উঠবে।"

"তার মুখের মধ্যে লাফাব কি করে'?"

"তার মুখ মোটেই ছোটখাটো নয়, বিরাট মুখ, বহু যোজন বিস্তৃত, আর সে মুখ থেকে লকলক করে' আগুনের শিখা বেরুচ্ছে!"

"বলুন কোন্ দিকে আছে, আমি এখনই লাফিয়ে পড়ছি তার মধ্যে—"

"তার কাছে যাওয়াও খুব সহজ নয়। খুব সরু একটা রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, ক্ষুরের ধারের মতো সরু! খুব একাগ্র না হ'লে সে রাস্তা দিয়ে চলতে পারবে না।"

"ঠিক পারব।"

www.boiRboi.blogspot.com

"বেশ, যাও তাহলে—"

সুবুদ্ধি টর্চের আলোটা আকাশের দিকে ফেললে। রমেন দেখতে পেল খুব সরু তারের মতো একটা পথ চলে' গেছে—টেলিগ্রাফের তারের মতো। চুলের চেয়ে পাতলা সরু তার।

"ওখানে উঠব কি করে?"

"সিঁড়ি আছে।"

"আগুনের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে তোমার ভয় হচ্ছে না? মারা যাও যদি—"

"গেলামই বা। সবাই যদি বেঁচে ওঠে আমি একলা না হয় মারাই গেলাম।"

"বাঃ, তুমি ঠিক পারবে মনে হচ্ছে। কিন্তু একটি কথা মনে রেখ। তোমাকে অন্যমনস্ক করে' দেবার জন্যে তোমার দুপাশে সিনেমা, ক্রিকেট ম্যাচ, রেডিওর গান, ভাল ভাল ম্যাজিক, বড় বড় নেতার গালভরা বক্তৃতা, ফুটবল ম্যাচ—এই সব নানারকম হবে, একটু অন্যমনস্ক হলেই পড়ে' যাবে কিন্তু।"

"না, আমি অন্যমনস্ক হ'ব না।"

সুবুদ্ধি টর্চের আলো ধরে রইল, রমেন এগিয়ে গেল নির্ভয়ে। একটু গিয়ে সিঁড়ি দেখতে পেলে।

সরু তারের উপর দিয়ে রমেন চলেছে। রমেন যেন আর রমেন নেই, সে যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে অশরীরী আগ্রহে! তার চারিদিকে যে তুমুল কোলাহল ঘটছে, তা সে শুনতেই পাচ্ছে না, সরু তারটা ছাড়া দেখতেও পাচ্ছে না কিছু। কিছুক্ষণ পরে সে কামনা-যক্ষিণীর মুখের কাছে হাজির হ'ল এসে।

দিগন্তবিস্তৃত বিরাট একটা গহ্বর থেকে লকলক করে' আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। কত রকমের কত রঙের শিখা! লাল নীল সবুজ হলুদ—শত শত ইন্দ্রধনু যেন শিখায় পরিণত হয়েছে। আর তাতে লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ উড়ে উড়ে পড়ছে এসে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

রমেন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তাকেও পুড়ে মরতে হবে। তা হোক। লাফিয়ে পড়ল সে।

লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। আগুন নিবে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

তারপর অসংখ্য লোকের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল। সবাই বেঁচে উঠেছে, ওই যে হাবুল মন্নু আর গণেশও আসছে তার দিকে ছুটে।

"রমেন, রমেন, ওঠ, এখনও ঘুমুচ্ছিস্? বি-টিমের সঙ্গে আজকে যে ম্যাচ আমাদের, মনে নেই? ওঠ্ ওঠ্।"

হাবুলের ডাকেই রমেনের ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে মন্নু আর গণেশও দাঁড়িয়ে আছে।

স্বাধীনতা

"স্বাধীনতা মানে কি?"—পণ্ডিতমশায় জিজ্ঞাসা করলেন সুবলকে।

সুবল উত্তর দিলে—"নিজের অধীনতা।"

নিজের অধীনতা বলতে কি বোঝ তুমি?"

ঈষৎ মাথা চুলকে সুবল বললে—"মানে, নিজে আমি যা খুশি করব তারই অধিকার।"

"তোমার নিজের যদি খুশি হয় চুরি করব, ডাকাতি করব, মাস্টার ঠ্যাঙাব, পড়াশোনা করব না, সকলের অবাধ্য হ'ব—তাহলে এইসব করবার অধিকার তোমাকে দেওয়ার নামই স্বাধীনতা?"

"না সার!"

"তাহলে?"

সুবল চুপ করে রইল। পণ্ডিতমশাই একে একে সব ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ সদুত্তর দিতে পারলে না। সুবলই ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে, সে-ই যখন পারলে না তখন আর কে পারবে?

পণ্ডিতমশায় বললেন—"এখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এখন আমাদের ভাল করে' বুঝতে হবে কথাটার মানে কি! সুবল, তুমি ঠিকই বলেছ, কথায় কথায় মানে করলে স্বাধীনতা মানে নিজের অধীনতাই বোঝায়। 'নিজের' কথাটার বিশেষ অর্থ আছে একটা। নিজের বলতে কি বোঝায়? তোমাকে যদি দুটো আম দেওয়া হয়, একটা পচা আর একটা ভালো, আর যদি বলা হয় ওর মধ্যে একটা তুমি নিজের করে' নাও, তাহলে কোন্‌টা তুমি নেবে? ভালোটাই নেবে নিশ্চয়! পশুরাও চায় যেটা ভালো সেটা নিজের হোক। মানুষ পশুর চেয়ে অনেক বড়, তাই সে শুধু নিজের ভালো চায় না, নিজেদের

ভালো চায়। সকলের ভালো হোক এইটাই সভ্য মানুষের কাম্য এবং সকলের ভালো করবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে। যারা পরাধীন জাতি, তারা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা সাহস করে' একটা ভালো কথা পর্যন্ত বলতে পারে না, যদি সেটা শাসক জাতির স্বার্থ-বিরোধী হয়। তাই স্বাধীনতা যাদের থাকে না, ভালো হবার অধিকারই তাদের থাকে না, কারণ সকলের ভালো হোক—কোনও বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের এ অভিপ্রায় কখনও হতে পারে না। দেশের ভালো হোক, দশের ভালো হোক, সকলের ভালো হোক, এই-ই হলো স্বাধীনতার লক্ষ্য। যখন তোমরা আর একটু বড় হবে তখন বুঝতে পারবে আমাদের সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন, 'স্ব' মানে ভগবান, তাই স্বাধীনতা মানে ভগবানের অধীনতা, যা মঙ্গলময় তারই অধীনতা।"

পণ্ডিতমশায়ের কথা মন দিয়ে সবাই শুনল, কিন্তু তাঁর কথার সমস্তটা বুঝতে পারল না সবাই।

স্কুলের ছুটি হ'য়ে গেল। সুবল পণ্ডিতমশায়ের কথাগুলোই ভাবতে ভাবতে বাড়ি যাচ্ছিল। পণ্ডিতমশায় যা বললেন, তা যেন বড্ড বেশী ঘোরালো গোছের। ভগবান-টগবান এনে এমন একটা ব্যাপার করলেন যে ঠিক বোঝা গেল না সবটা। সে স্বাধীনতার একটা সোজা মানে খুঁজছিল মনে মনে।

একটু পরেই হঠাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল তার কাছে। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সুবলের মা বেড়াতে যাচ্ছিলেন একজনের বাড়িতে। দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হ'ন তাঁরা, তাঁদের বাড়িতে কার যেন অসুখ করেছে। বেরোবার আগে মা সুবলকে বললেন—"ওরে, ভাঁড়ার ঘরের তাকে দুটো আম আছে। যদি খিদে পায় তো তুই একটা নিস্ আর মনুকে একটা দিস্।"

মনুও তাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়—মা-মরা ছেলে—তাদের আশ্রিত।

মা চলে' গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খিদে পেয়ে গেল সুবলের। পড়ছিল, তড়াক করে' উঠে ভাঁড়ার ঘরে চলে' গেল সে। গিয়ে দেখলে দুটো আম রয়েছে বটে, কিন্তু একটা ভালো, আর একটা একটু পচা। পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে পড়ল। তিনি এই আমেরই উদাহরণ দিয়েছিলেন। যা ভালো সেটাকেই নিজের করে' নেওয়া উচিত এবং সেইটে নেবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। পচা আমটা মনুকে দিতে

কিছুতেই মন সরছিল না তার। ওকে দিলে ও নেবে ; কারণ, ও আশ্রিত। কিন্তু সেটা দেওয়া কি উচিত ?

পচা আমটাই নিলে সে, ভালোটা মনুকে দিলে।

একটা অদ্ভুত আনন্দে সমস্ত মনটা ভরে' উঠল সুবলের। পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি সুবলের বাড়ির কাছে। এক ছুটে সে চলে গেল পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি।

পণ্ডিতমশায় শোওয়ার আয়োজন করছিলেন।

"পণ্ডিতমশায়, স্বাধীনতার আর একটা মানে খুঁজে পেয়েছি। যা করলে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায় তাই করবার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে।" সুবলের মুখ উদ্ভাসিত।

পণ্ডিতমশায় হেসে বললেন—"ঠিক বলেছ।"

ফুলদানীর একটি ফুল

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে, ট্রেনের আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকী, মনে মনে বেশ উত্তেজিত হ'য়ে আছি, ফুলদানীর কথা মনেও ছিল না, এমন সময় হঠাৎ কার্তিক এসে ঢুকল। হাতে তার ফুলদানী।

'এই যে বৌদি, যাচ্ছেন তাহলে, একেবারে রেডি—'

গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন—'ফুলদানীটা কিনলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ। আপনি সেদিন আমাদের ফুলদানীটা দেখে বললেন না, যে আমিও যাবার সময় এই রকম একটা কিনে নিয়ে যাব। আমি জগুর কাছে খবর পেয়েছি আপনি কিনতে পারেন নি, কিনতে পারতেনও না, যা ভিড়, তাই আমি বেরিয়ে কিনে ফেললাম। আয়োডিন আছে ?"

'আছে। কেন, আয়োডিন নিয়ে কি করবেন—'

'হাতীবাগানে যা ভিড়। পা-টা মাড়িয়ে দিলে একজন'।

'জুতো খুলুন দেখি—' জুতো খুলল কার্তিক।

'ইস, আঙ্গুলটা থেঁতলে গেছে ! কী দরকার ছিল আপনার ভিড়ে গিয়ে ফুলদানী কেনবার ! এঃ, কাপড়টাও ছিঁড়েছেন দেখছি—'

কার্তিক হে হে করে' হাসতে লাগল।

'ফুলদানীটা কোথায় নেবেন ? বাক্সের মধ্যে ?'

'না, বাক্স তো শাড়ি কাপড়ে ঠাসা ?'

'তাহলে—'

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

'ওই বালতিটার মধ্যে নিতে হবে। ওতেও তো জিনিসপত্র ভর্তি একেবারে।'

'আমি দিচ্ছি ঠিক ক'রে।'

বালতির মধ্যে নানা রকম খুঁটিনাটি বিচিত্র আকারের জিনিস। গৃহিণী সমস্ত দুপুর চেষ্টা করে' নানা কৌশলে ভরেছেন সেগুলি বালতিতে।

'আপনি আবার ওসব বার করবেন? তার চেয়ে দিন, হাতে করেই নিয়ে যাব ওটা।'

তারপরই সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল।

'এই তো খালি নতুন কমোডটা যাচ্ছে। ওর ভিতর কাপড় মুড়ে বসিয়ে দেওয়া যাক—'

'সেই ভালো।'

কার্তিকই একটা কাপড় দিয়ে মুড়ে কমোডের প্যানে ভালভাবে বসিয়ে দিলে সেটা। তারই দায় যেন।

বাড়ি পৌঁছে দেখি বাগানে নানারকম গোলাপ ফুল ফুটেছে। লাল, সাদা, গোলাপী, হলদে, বাদামি। রংয়ের হাট বসে' গেছে যেন। নতুন ফুলদানী আমার মেয়ে মহা উৎসাহে সাজাতে বসল।

বললাম, 'খাবার ঘরের টেবিলে রেখে আয়। আমি আসছি—'

খাবার ঘরের টেবিলের সামনে বসে ফুলদানীর দিকে চেয়ে আমি কিন্তু ভয় খেয়ে গেলাম। চোখে আমার হেমারেজ হ'ল না কি? হওয়া বিচিত্র নয়, আমি ডায়াবিটিক লোক, খাওয়া-দাওয়ার কোনও মানা মানি না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ফুলগুলোর দিকে। ফুলগুলোর মাঝখানে কালো মতন ওটা কি? কাউকে কিছু বললাম না। সোজা চলে গেলাম চোখের ডাক্তারের কাছে। সে ভাল করে' পরীক্ষা করে' বললে, 'না, চোখ ত আপনার ঠিক আছে।'

'তবে কালো মতো ওটা কি দেখলাম?'

চশমায় ময়লা ছিল বোধ হয়।'

বাড়ি ফিরে এসে চশমাটা ভাল করে' পরিষ্কার করে' আবার দেখলাম। কিছু পরিবর্তন হয় নি। গোলাপফুলগুলোর মাঝখানে ঠিক সেইরকম একটা কালো জিনিস রয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে' বসে' রইলাম। হঠাৎ সেই কালো জিনিসটা নড়ে' উঠল। আরে, এ যে কার্তিক! সেই টাক, সেই কালো রং, সেই টেবো গাল, আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

তার ওই কালো মুখখানা হঠাৎ গোলাপ ফুলের চেয়ে সুন্দর মনে হ'ল।

"কি তাহলে ওগুলো—"

ঠাকুর যা বললেন তা আরও বিস্ময়কর।

ওই ছায়াপথ দিয়ে আসবে নাকি রাজপুত্র। তাই আলো জ্বালিয়ে রেখেছে দেবতারা।

গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল খোকন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে যা স্বপ্ন দেখলে তা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক।

······চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্ষত্রের মশাল জ্বলেছে। অসংখ্য জ্বলন্ত শিখার উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে চতুর্দিক। দূরে দূরে কালো মেঘের স্তূপ, তাতে আগুন লেগেছে যেন। বজ্রের বাজনা বাজছে। মেঘের পিছনে শোনা যাচ্ছে ঝড়ের গর্জন। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন লক্ষ লক্ষ শাঁখ বাজছে।······ ছায়াপথ দিয়ে রাজপুত্র আসছে···ওই যে···মাথায় সোনার মুকুট, হাতে তলোয়ার। নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে রাজপুত্র, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই···ওই আসছে···। কাছে এল যখন, তখন খোকন অবাক্ হয়ে গেল। রাজপুত্র অপর কেউ নয়, সে নিজেই। তারই মাথায় সোনার মুকুট, হাতে তলোয়ার, সে বেরিয়েছে দিগ্বিজয়ে।

পাখী

"এই, তোমার নাচ বন্ধ কর—"

সিংহ সগর্জনে আদেশ করলেন ময়ূরকে। কিন্তু ময়ূর নাচতেই লাগল, মনে হ'ল যেন পশুরাজের আদেশ শুনতেই পায়নি।

"বন্ধ কর তোমার নাচ। আমার রাজকার্যের বিঘ্ন হচ্ছে—"

ময়ূর নাচতে লাগল। কাছেই ময়ূরী রয়েছে, থামবে কি করে।

"বন্ধ কর।"

ময়ূর শোনে না।

সিংহের গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হ'য়ে উঠল।

"বন্ধ কর—বন্ধ কর—বন্ধ কর—"

ময়ূরের ভ্রূক্ষেপ নেই।

সিংহ এক লম্ফ দিয়ে তেড়ে গেল ময়ূরটাকে। ময়ূর ময়ূরী উড়ে গিয়ে বসল একটা উঁচু গাছের ডালে। ছোট একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছিল

www.boiRboi.blogspot.com

সেখান থেকে। সেই দিকে উড়ে গেল তারা। সেখানে চমৎকার উপত্যকা ছিল একটা চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের সানুদেশে ঘন সবুজ মেঘ নেমেছে যেন। ময়ূর আবার নাচ শুরু করল। ময়ূরী ঘুরতে লাগল আশেপাশে।

সিংহের আত্মসম্মানে কিন্তু আঘাত লেগেছিল ভয়ানক। মন্ত্রী ব্যাঘ্রকে ডেকে তিনি বলিলেন—"আমি রাজা, কিন্তু আমার কথা ওই সামান্য ময়ূর গ্রাহ্যই করল না! এতে ভয়ানক অপমানিত হয়েছি আমি। ওকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা কর—"

"নিশ্চয় করব। ওই ময়ূর জাতটাই বড় খারাপ। আমি যখন শিকার করতে বেরুই, চীৎকার করে' করে' সব প্রাণীদের সাবধান করে' দেয়। রাজন, আপনি যখন আদেশ করেছেন তখন এর ব্যবস্থা করব আমি।"

দুই

দিন দুই পরে এক শৃগাল এসে ময়ূরকে নমস্কার করল। ময়ূর মাঠে চরছিল, শৃগালকে দেখে সে উড়ে গাছের ডালে বসল।

শৃগাল সবিনয়ে বলল, "আপনি গুণী লোক, আপনার গুণের সমাদর করবার সামর্থ্য আমার নেই। তবু আমার সঙ্গে আপনাকে একবার আমার বাসায় যেতে হবে।"

"কেন?"

"আমার গৃহিণীর সম্প্রতি সন্তান হয়েছে। সন্তান হবার পর কেমন যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার। কাক আমাদের চিকিৎসক। সে বললে ওকে যদি ময়ূরের নাচ দেখাতে পার তা হলে উনি সেরে উঠবেন।"

ময়ূর কেকারবে হেসে উঠল।

তারপর বলল, "শৃগাল মহাশয়, আপনাকে এই বনের কে না চেনে? আপনার গৃহিণী অসুস্থ শুনে দুঃখিত হলাম। কিন্তু আপনি একটা কথা বোধ হয় জানেন না, আমি নাচি কেবল আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করবার জন্য। অন্য কোন কারণে আমি নাচতে পারি না, আমার নাচ আসেই না।"

শৃগাল ফিরে গেল। তার গর্তের কাছে যে জঙ্গলটি ছিল সেই জঙ্গলে আত্মগোপন করে বসেছিল বাঘ সিংহ দু'জনেই। তারা ভেবেছিল ময়ূর যখন শৃগালের গর্তের সামনে পুচ্ছ বিস্তার করে নাচবে, তখন তারা লাফিয়ে পড়বে তার উপরে। কিন্তু তাদের এ ষড়যন্ত্র বিফল হ'য়ে গেল!

www.boiRboi.blogspot.com

তিন

তার পরদিন গেল একটা সাপ।

সাপ ময়ূরের খাদ্য। তাকে দেখেই ময়ূর উদ্যত-চক্ষু-নখর হ'য়ে তেড়ে গেল। কিন্তু সাপটি ছিল ক্ষিপ্রগতি। সে ঘাসের ভিতর দিয়ে ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে আত্মগোপন করে' এগিয়ে যেতে লাগল। সোনার হরিণের পিছু পিছু রামচন্দ্র যেমন ছুটেছিলেন, সাপের পিছু পিছু তেমনি করে' ছুটতে লাগল ময়ূর। একটা বনের ধার দিয়ে একাগ্র মনে সে ছুটে চলেছে, এমন সময় হঠাৎ চতুর্দিকে প্রকম্পিত করে' গর্জন উঠল একটা। পরক্ষণেই সিংহ লাফিয়ে পড়ল ময়ূরের উপর। কিন্তু ধরতে পারল না ময়ূরকে। ময়ূর নিমেষের মধ্যে উড়ে গিয়ে বসল একটা গাছের উপর। তারপর সিংহকে সম্বোধন করে' বলল—"মহারাজ, আপনার এ রকম দুর্ব্যবহারের কারণ কি বলুন—"

"তুমি আমাকে অপমান করেছ—"

"আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করবার জন্যে আমি নেচে থাকি। এতে যদি আপনি অপমানিত বোধ করেন তা হলে তো আমি নাচার। আপনি সিংহিনীকে ভোলাবার জন্য যখন কেশর ফুলিয়ে, ল্যাজ নেড়ে গর গর গর্‌র্ শব্দ করেন—তখন তো আমি অপমানিত বোধ করি না।"

"আমি তোমাকে নাচতে মানা করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার মানা শোননি, তোমার রাজার আদেশ তুমি অমান্য করেছ, সে জন্যই আমি অপমানিত বোধ করছি—"

"কিন্তু মহারাজ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনি পশুদের রাজা। আমি পশু নই, পাখি—"

সিংহ স্তম্ভিত হ'য়ে রইল খানিকক্ষণ।

"তাহলে তুমি ভিন্ন দেশের প্রাণী আমার দেশে এসে রয়েছ? তোমার পাসপোর্ট কই, ভিসা কই?"

ময়ূর তার পাখা দুটি নেড়ে দেখাল।

তারপর বলল, "মহারাজ, আমাদের আপনি তাড়াতে পারবেন না। আমরা থাকবই। জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র বিচরণ করবার বিধিদত্ত অধিকার আমাদের আছে। এ কথা ভুলবেন না। আর একটা কথাও আপনাকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করছি। আপনি আজ আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন, এর প্রতিশোধ আমি নেব।"

"সামান্য একটা পাখি, তুমি প্রতিশোধ নেবে? হা হা হা—"

সিংহের অট্টহাস্যে বনস্থল প্রকম্পিত হ'তে লাগল।

www.boiRboi.blogspot.com

চার

কয়েকদিন পরে।

সিংহ একটি মেষশাবককে মেরে খাওয়ার যোগাড় করছে, এমন সময় আকাশ থেকে নেমে এল একটা প্রকাণ্ড ঝড়, ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল মেষশাবকটাকে। সিংহ সবিস্ময়ে দেখলে বিরাট এক ঈগল পক্ষ-বিস্তার করে স্থির হ'য়ে রয়েছে—আকাশ-পটে। তার পায়ের নখর থেকে ঝুলছে মেষশাবক।

ঈগল বলল, "পশুরাজ সিংহ, তোমরা স্থলচর জীব। অতিশয় সীমাবদ্ধ তোমাদের শক্তি। আমরা আকাশচারী, আমরা শিল্পী, আমরা কবি, আমরা যোদ্ধা। আমার একজন প্রজাকে অপমান করে' তুমি সমস্ত পক্ষীজাতিকে অপমান করেছ। তাই তোমাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আমি নীচ নই। পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খাই না। এই নাও তোমার খাবার—"

শূন্য থেকে মেষশাবকটা থপাস্ করে' এসে পড়ল বিস্মিত সিংহের সম্মুখে। সিংহ নির্বাক হ'য়ে বসে' রইল।

একালের রূপকথা

ছুটির দিন। রমেন একটা রূপকথার বই পড়ছিল শুয়ে শুয়ে। সেই পুরাতন চার বন্ধুর গল্পটা। পড়তে পড়তে তার মনে হচ্ছিল, "মন্তু, হাবুল, গণশা আর আমি, আমরাও তো চার বন্ধু, কিন্তু আমরা তো রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র আর পাত্রপুত্র নই! আমার বাবা কর্পোরেশনের ক্লার্ক, মন্তুর বাবা ডাক্তার, হাবুলের বাবা ওভারশিয়ার আর গণশার বাবা দালাল। আমাদের নিয়ে কি আর রূপকথা হয়? তাছাড়া আমরা অমন পক্ষিরাজই বা পাব কোথা? আকাশ-পথে অমন হু-হু করে উড়ে যাওয়া সে কি আর সম্ভব আমাদের পক্ষে? নাঃ, এ যুগে আর রূপকথা হয় না। হাবুলের ইচ্ছে এরোপ্লেনের পাইলট হবার, ও হয়তো কোন দিন আকাশ-পথে হু-হু করে উড়বে। কিন্তু সে ওড়া চাকরির ওড়া, তাতে কি আর রূপকথা হয়?"

এই সব ভাবতে ভাবতে রমেন ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুমের ভিতর রূপকথা এসে দেখা দিল স্বপ্ন হয়ে।

টেলিগ্রাম নয়, একটি ছোট্ট পরী এসে ঢুকল রমেনের পড়ার ঘরের কপাট ঠেলে।

www.boiRboi.blogspot.com

"আপনিই রমেনবাবু?"

"হ্যাঁ।"

"হাবুলবাবু চিঠি দিয়েছেন একখানা। মনুবাবু আর গণেশবাবু থাকেন কোথায় বলুন তো, তাঁদের নামেও চিঠি আছে।"

মনু আর গণেশের ঠিকানাটা বলে দিলে রমেন।

প্রজাপতির মতো ডানা মেলে পরী উড়ে চলে গেল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, রমেন এতে আশ্চর্য হ'ল না একটুও। টেলিগ্রাম, টেলিফোন বা রেডিও দেখে সে কি আশ্চর্য হ'ত? এ দেখেই বা হবে কেন? পরীরা উড়ে উড়ে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেককে চিঠি দিয়ে আসবে এইটাই তো বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার।

হাবুল লিখেছে—"রমেন, ক'দিনের ছুটি পেয়েছি। প্লেন নিয়ে বেড়াতে বেরোব। তোমাদেরও যেতে হবে। পরশু দিন সকাল বেলা আমাদের বাড়ির ছাতে তৈরী হ'য়ে থেকো। মনু আর গণেশকেও খবর পাঠালাম। তুমিও তাদের বলে দিও নিজে গিয়ে। যেতেই হবে সকলকে। আমি কেমন প্লেন চালাতে শিখেছি, দেখিস্। হিমালয় থেকে কুমারিকা আর গুজরাট থেকে আসাম চক্কোর দিয়ে আসা যাবে।"

আনন্দে নেচে উঠল রমেনের মন। এরোপ্লেনে চড়ে' ভারত-ভ্রমণ!

নির্দিষ্ট দিনে সকাল বেলা তিনজনে গিয়ে হাবুলের বাড়ির ছাতে গিয়ে বসে রইল। আজকাল এরোপ্লেনে চড়বার জন্যে এরোড্রোমে যাবার দরকার হয় না। ছাত একটু বড় হলেই তাতে এরোপ্লেন নামাতে পারে। আকাশের দিকে চেয়ে বসে' রইল তিনজনে। ওটা কি চিল? চিল কি অত বড় হয়? বোঁ বোঁ করে' ছাতের দিকেই তো ছুটে আসছে! গুররর্, গুররম্…শব্দও পাওয়া গেল ক্রমশ। দেখতে দেখতে এসে পড়ল হাবুল। বাঃ, কি চমৎকার প্লেনটি ওর, যেন জীবন্ত একটি রাজহংস! টুক করে এসে নাবল ছাতের উপর। নাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজহংস ডানা দুটি তুলে ধরল। হাবুল বসে আছে। আর তিনটি খালি সীট।

"দেরি করিস্ না, চট্ করে' আয়!"

www.boiRboi.blogspot.com

উঠে বসল তারা। রাজহংস ডানা মেলে উড়ল আবার। মাঠ বন নদী পাহাড় সমুদ্র মরুভূমি পার হয়ে উড়ে চলল, কখনও ভোরের আলোয়, কখনও চাঁদের আলোয়, কখনও মেঘের ভিতর দিয়ে, কখনও রামধনুর ভিতর দিয়ে, নক্ষত্রালোকে, সূর্যালোকে—কতদিন কতরাত্রি যে চলল তার ঠিক নেই। রমেনের মনে হতে লাগল, যুগযুগান্ত পার হয়ে গেল বুঝি! কোথায় চলেছে হাবুল?

"কোথায় যাচ্ছি ভাই আমরা?"

"নিরুদ্দেশ যাত্রা আমাদের।"

সামনের দিকে চেয়ে স্টিয়ারিং ধরে চুপ করে বসে রইল হাবুল। রমেন চেয়ে দেখলে, একটু নীচে পেঁজা-তুলোর বিরাট একটা স্তূপ শূন্যে ঝুলছে যেন!

"এই রে—"

হঠাৎ চীৎকার করে' উঠল হাবুল।

"কি হল?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

হু-হু করে নীচের দিকে নামতে লাগল রাজহংস।

"ক্র্যাশ্ হ'ল নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল চারজনেই। কিন্তু কি আশ্চর্য, কেউ মরল না। রাজহংস কিছুদূর নেবেই খুব আস্তে আস্তে নাবতে লাগল। শেষে মনে হ'ল কে যেন তাকে কোলে করে' নাবিয়ে নিলে! একটু শব্দ পর্যন্ত হ'ল না।

নেবে পড়ল চারজনেই। নেবে আরও অবাক্ হ'য়ে গেল, চারিদিকে মখমল বিছানো! অবাক্ কাণ্ড! এ কোথায় এসে হাজির হ'ল তারা? চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল—কেবল মখমল আর মখমল! ঘাস নেই, সবুজ মখমলের গদি কেবল! চুমকি-বসানো, জরি-বসানো, কত রকমের!

হাবুল বললে—"একটা 'নাট্' আলগা হ'য়ে পড়ে' গেছে মনে হচ্ছে। এখানে কি পাওয়া যাবে? চল খোঁজ করা যাক।"

হাঁটতে লাগল চারজন।

মনু বলল—"মখমলের উপর দিয়েই হাঁটবি? যা ময়লা জুতো আমাদের—"

গণেশ বললে—"তাছাড়া হাঁটাই যে যাচ্ছে না ভাল করে'। মখমলের গদির উপর দিয়ে হাঁটা যায় কখনও? শক্ত মাটির উপর হাঁটা অভ্যেস আমাদের।"

হাবুল বললে—"তবু হাঁটতেই হবে। 'নাট্' চাই একটা।"

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। না হলে বাবা বকবে ভাই! আমি বাড়িতে কিছু বলে আসি নি"—রমেন বললে অপ্রস্তত হাসি হেসে।

হাঁটতে লাগল তারা। হাঁটতে হাঁটতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল শেষে।

মন্টু বললে—"অনেক দিন আগে একবার বালির চড়া ভাঙতে হয়েছিল আমাকে। কষ্ট হয়েছিল খুব। কিন্তু এত হয় নি—বাপ্‌স্‌!"

মখমলের গদি মাড়িয়ে হেঁটে চলল তারা। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর একটা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড চোখে পড়ল তাদের। বড় বড় হীরের অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'টাকার দেশ'। কি উজ্জ্বল অক্ষরগুলো!

"দেখ দেখ ওটা কি"—মন্টু বলে উঠল হঠাৎ। সকলে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে আকাশচুম্বী বিরাট একটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত চকচক করছে যে চাওয়াই যায় না তার দিকে! মনে হচ্ছে বরফ, রুপো আর চাঁদের আলো গলিয়ে তৈরী হয়েছে সেটা। তার উপর পড়েছে সূর্যের কিরণ।

হাবুল বৈজ্ঞানিক লোক। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বললে—"প্ল্যাটিনামের তৈরী। চল, ওই দিকেই যাওয়া যাক। একটা গেটও আছে মনে হচ্ছে—"

"ওপাশে আরও একটা গেট আছে।"

"চল—"

আবার হাঁটতে শুরু করলে চারজনে।

সেই মখমলের তেপান্তর পার হ'য়ে প্ল্যাটিনামের প্রাচীরের কাছে পৌঁছতে যুগযুগান্ত কেটে গেল রমেনের মনে হ'ল। প্রাচীরের কাছে এসে তারা যখন পৌঁছল অবশেষে, তখন চারজনেই এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে যে আর কারো পা উঠছে না। মন্টু, গণেশ, রমেন তিনজনে বসেই পড়ল। হাবুলের বসতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সে কাজের লোক, ভাবলে একটা গেটের ভিতরে ঢুকে একটু খোঁজ করে' আসা যাক আগে। একটা 'নাট্' না পেলে তো ফেরাই যাবে না এখান থেকে।

"তোরা এখানে বোস, বুঝলি। আমি একবার ভিতরে ঢুকে একটু দেখে আসি কি ব্যাপার! 'নাট্' একটা যোগাড় করতেই হবে কোনও রকমে।"

"বেশী দেরি করিস না যেন!"

"আমরা আর পারছি না ভাই, একটু জিরিয়ে নিই।"

"বেশ, বোস তাহলে, আমি আসছি।"

হাবুল যখন যাচ্ছে তখন এক টুকরো আলো এসে পড়ল তার পায়ের কাছে।

কিন্তু সেটাকে লক্ষ্যই করলে না কেউ। হাবুল ডান দিকের গেটটা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

হাবুল ভিতরে ঢুকে অবাক্ হয়ে গেল। এটা এরোপ্লেনের কারখানা না কি? আশ্চর্য কারখানা! প্রকাণ্ড বড় বড় সোনার থালায় এরোপ্লেনের জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে রাস্তার দু'ধারে! অথচ মানুষ একটিও নেই!

একটু এগিয়ে সে দেখলে, যে 'নাট্' সে খুঁজছিল তা স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে একটা সোনার থালায়। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সে একটা তুলে নিলে। তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল একটা। হাবুল নিজেই 'নাট্' হয়ে সেই নাটের স্তূপে মিশে গেল!

অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও যখন হাবুল ফিরল না তখন মনু চিন্তিত হ'ল খুব। তার খুব পিপাসা পেয়েছিল। রমেন আর গণেশ মখমলের গদির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। গণেশের নাক ডাকছিল।

মনু ভাবলে, "ওদের আর ওঠাব না এখন, বেচারারা ঘুমুচ্ছে ঘুমুক। আমি দেখি ভেতরে যদি শরবত-টরবত পাওয়া যায়।"

মনু উঠে যখন যাচ্ছে তখনও তার পায়ের কাছে সেই আলোর টুকরোটা এসে পড়ল। কিন্তু সে গ্রাহ্য করলে না তত। সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল ডান দিকের গেটটায়, হাবুল একটু আগে যেটা দিয়ে ঢুকেছিল। ভেতরে ঢুকে সে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। তার মনে হ'ল এটা শরবতের দোকান না কি? বড় বড় সোনার থালায় স্ফটিকের গ্লাসে সারি সারি শরবত সাজানো রয়েছে। কি চমৎকার দেখতে, দেখলেই খেতে ইচ্ছা করে! কিন্তু লোকজন কোথাও কেউ নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আর সে স্থির থাকতে পারলে না। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল বেচারার। কিন্তু যেই সে একটি গ্লাসে হাত দিয়েছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে এক গ্লাস শরবত হয়ে গেল!

গণেশের ঘুম ভাঙল খিদের চোটে। সে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে—হাবুল, মনু নেই, রমেন ঘুমুচ্ছে।

"ওরে ওঠ, ওঠ, মনু আবার কোথায় গেল? হাবুলও এখনও ফেরেনি দেখছি!"

রমেন উঠে বসল।

গণেশ বলল, "বড্ড খিদে পেয়েছে ভাই! চল্, ওঠা যাক্। মনু কোথা গেল বলতো?"

"হাবুলকে খুঁজতে গেছে হয়তো।"

"চল, আমরাও যাই।"

দু'জনে উঠে পড়ল। একটু গিয়ে রমেন বলল, "আমাদের একজনের কিন্তু থাকা উচিত! ওরা যদি ফিরে আসে, আমাদের কাউকে না দেখতে পেলে আবার ভাবনায় পড়বে।"

"বেশ, তুই বোস তাহলে। আমি একটু ঘুরে আসি। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, দেখি যদি খাবার পাওয়া যায় কোথাও।"

"বেশ।"

গণেশ যখন যাচ্ছিল তখনও তার পায়ের কাছে সেই আলোর টুকরোটা এসে পড়ল, কিন্তু গণেশ সেটা দেখেও দেখলে না। গণেশ খাবারের স্বপ্ন দেখছে তখন। অন্য কিছু দেখবার তার অবসর কোথায়? ডানদিকের গেট লক্ষ্য করে' হন হন করে' এগিয়ে গেল সে।

গেটে ঢুকেই দেখলে কি আশ্চর্য, চারদিকেই যে খাবার! সোনার থালায় সাজানো নানা রকম খাবার। সন্দেশ রসগোল্লা তো আছেই, আরও কত রকম মিষ্টান্ন! যেমন রং তেমনি সুগন্ধ। শুধু কি মিষ্টান্ন? নিমকি কচুরি সিঙ্গাড়া চপ কাটলেট ডেভিল ফ্রাই—প্রচুর পরিমাণে থরে থরে সাজানো রয়েছে।

গণেশের মুখ লালায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু দোকানদার কই? কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গে টাকা রয়েছে, সামনে খাবার, কিন্তু···। যা থাকে কপালে বলে গণেশ রসগোল্লার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু যেই রসগোল্লায় হাত দিয়েছে আর অমনি সে নিজেই রসগোল্লা হয়ে গেল!

রমেন অনেকক্ষণ বসে রইল, কেউ আর ফেরে না। অন্ধকার হ'য়ে এল ক্রমশ। তার মনে হ'ল, আর তো এমন ভাবে অপেক্ষা করা উচিত নয়। খিদে পেয়েছে বেশ। উঠে পড়ল সে, ডান দিকের গেটের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল।

সেই আলোর টুকরোটাও আবার এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। অন্ধকার হয়েছিল বলেই হোক কিংবা যে কারণেই হোক, রমেন ভাল করে' চেয়ে দেখলে সেটার দিকে। টর্চ ফেলছে নাকি কেউ? চেয়ে দেখলে, একটা আলোর রেখা বাঁ-দিকের ভেতর থেকে আসছে।

আবার আলোর টুকরোটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে সে। এবার দেখতে পেলে, কি যেন লেখা রয়েছে আলোর অক্ষরে! ঝুঁকে দেখলে লেখা আছে—"ডান দিকের গেটে খবরদার ঢুকো না। বাঁ-দিকের গেটে এস।"

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

রমেন ইতস্ততঃ করে' বাঁ-দিকের গেটে ঢুকল গিয়ে। গেটের ভিতর ঢুকে দেখে, সামনেই একটি চমৎকার বাড়ি। সেই বাড়ির ছাতে প্রকাণ্ড টর্চ হাতে করে' একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটিকে দেখেই ভাল লাগল রমেনের। যেমন চোখ মুখ নাক, তেমনি রং, প্রশস্ত ললাটে যেন মহিমা জ্বলজ্বল করছে!

রমেনকে দেখতে পেয়েই ছেলেটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। সে রমেনকে হাতছানি দিয়ে ডেকে ছাত থেকে নেমে এল। রমেন কাছে যেতে আবার সে হাতছানি দিয়ে ডাকল। একটু অবাক্ হ'ল রমেন। ছেলেটি বোবা নাকি?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিতরে ঢুকে রমেন দেখতে পেল, ছেলেটি একটি বাংলা টাইপরাইটারে বসে খটাখট্ করে' কি যেন লিখে চলেছে। রমেন ঢুকতেই মুচকি হেসে ইঙ্গিতে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললে। বিস্মিত রমেন বসল। ছেলেটি টাইপ করতে লাগল দ্রুতবেগে। টাইপ করা হ'য়ে গেলে কাগজখানা বার করে' এনে রমেনের সামনে ধরে' দিল সে।

রমেন পড়তে লাগল—"আমার নাম সুবুদ্ধি। আমি বোবা নই, কিন্তু এদেশে আমার কথা কইতে মানা। এ কামনা-যক্ষিণীর দেশ! আমাকে এরা বন্দী করে' রেখেছে। হয় তো মেরেই ফেলত, কিন্তু আমি অমর, আমাকে নিঃশেষ করা যায় না। আমাকে ধরে' এনে এরা নানা রকম যন্ত্রণা দিচ্ছিল। যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে শেষে আমি এদের বললাম—"আমাকে যন্ত্রণা দিও না, আমাকে কি করতে হ'বে বল।" এরা বললে, "তুমি শুধু চুপ করে' থাক, আর কিছু চাই না।" আমি বললাম, "বেশ, আমি চুপ করে' থাকতে রাজী আছি, যদি তোমরা আমাকে সময় কাটাবার জন্যে বই খাতা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এনে দাও। চুপ করে' বসে থাকব কি করে'?" তাতেই তারা রাজী হ'ল। এই বাড়িতে আমার ল্যাবরেটরি আছে। লাইব্রেরিও আছে। ল্যাবরেটরিতে আমি অনেক জিনিস তৈরি করেছি। যে টর্চের আলো ফেলে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি, সেটাও আমারই তৈরী। এ ভয়ানক দেশ, এখানে যে যা কামনা করে' আসে, তাই হ'য়ে যায়, মানুষ থাকে না আর। হাবুল 'নাট্' হ'য়ে গেছে, মনু হয়েছে শরবত, গণেশ রসগোল্লা। আলো ফেলে ফেলে ওদের সাবধান করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওরা কেউ আমার ইশারা বুঝলে না। যাক, তুমি যখন আমার ইঙ্গিত বুঝে এখানে এসে পড়েছ তখন

তোমার আর ভয় নেই। এমন কি, হয়তো তুমি এদের সকলকে উদ্ধারও করতে পারবে।"

রমেন কাগজ পড়া শেষ করে' সুবুদ্ধির দিকে চাইলে। দেখতে পেলে সে একটা পেন্সিল নিয়ে বসে আছে, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে। তার বিস্ময় যদিও সীমা অতিক্রম করে' গিয়েছিল তবু সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়নি!

সে বললে, সবাইকে না পারি, হাবুল, মন্টু আর গণেশকে তো উদ্ধার করতেই হবে। আমাকে কি করতে হবে বলুন।"

সুবুদ্ধি লিখে উত্তর দিলে—"দুঃসাধ্য সাধন করতে হবে। কিন্তু সকলে এ দুঃসাধ্য সাধন ত করতে পারবে না! যে মিথ্যুক, যে চোর, যে পরশ্রীকাতর, তার দ্বারা এ কাজ হবে না।"

"আমি মিথ্যুক নই, চোর নই, পরশ্রীকাতর নই। কি করতে হবে আমাকে বলুন না!"

"অন্যমনস্ক হলেও চলবে না।"

"আমি মোটেই অন্যমনস্ক নই।"

"সাহসীও হওয়া চাই।"

"কি করতে হবে বলেই দেখুন না, আমি পারি কি না।"

"সে খুব শক্ত কাজ—"

"বলুনই না।"

"কামনা-যক্ষিণীর মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে হবে। কোনও সত্যবাদী সচ্চরিত্র লোক যদি তার মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই যক্ষিণীর মৃত্যু হবে। আর তার মৃত্যু হ'লে সবাই বেঁচে উঠবে।"

"তার মুখের মধ্যে লাফাব কি করে'?"

"তার মুখ মোটেই ছোটখাটো নয়, বিরাট মুখ, বহু যোজন বিস্তৃত, আর সে মুখ থেকে লকলক করে' আগুনের শিখা বেরুচ্ছে!"

"বলুন কোন্ দিকে আছে, আমি এখনই লাফিয়ে পড়ছি তার মধ্যে—"

"তার কাছে যাওয়াও খুব সহজ নয়। খুব সরু একটা রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, ক্ষুরের ধারের মতো সরু! খুব একাগ্র না হ'লে সে রাস্তা দিয়ে চলতে পারবে না।"

"ঠিক পারব।"

www.boiRboi.blogspot.com

"বেশ, যাও তাহলে—"

সুবুদ্ধি টর্চের আলোটা আকাশের দিকে ফেললে। রমেন দেখতে পেল খুব সরু তারের মতো একটা পথ চলে' গেছে—টেলিগ্রাফের তারের মতো। চুলের চেয়ে পাতলা সরু তার।

"ওখানে উঠব কি করে?"

"সিঁড়ি আছে।"

"আগুনের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে তোমার ভয় হচ্ছে না? মারা যাও যদি—"

"গেলামই বা। সবাই যদি বেঁচে ওঠে আমি একলা না হয় মারাই গেলাম।"

"বাঃ, তুমি ঠিক পারবে মনে হচ্ছে। কিন্তু একটি কথা মনে রেখ। তোমাকে অন্যমনস্ক করে' দেবার জন্যে তোমার দুপাশে সিনেমা, ক্রিকেট ম্যাচ, রেডিওর গান, ভাল ভাল ম্যাজিক, বড় বড় নেতার গালভরা বক্তৃতা, ফুটবল ম্যাচ—এই সব নানারকম হবে, একটু অন্যমনস্ক হলেই পড়ে' যাবে কিন্তু।"

"না, আমি অন্যমনস্ক হ'ব না।"

সুবুদ্ধি টর্চের আলো ধরে রইল, রমেন এগিয়ে গেল নির্ভয়ে। একটু গিয়ে সিঁড়ি দেখতে পেলে।

সরু তারের উপর দিয়ে রমেন চলেছে। রমেন যেন আর রমেন নেই, সে যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে অশরীরী আগ্রহে! তার চারিদিকে যে তুমুল কোলাহল ঘটছে, তা সে শুনতেই পাচ্ছে না, সরু তারটা ছাড়া দেখতেও পাচ্ছে না কিছু। কিছুক্ষণ পরে সে কামনা-যক্ষিণীর মুখের কাছে হাজির হ'ল এসে।

দিগন্তবিস্তৃত বিরাট একটা গহ্বর থেকে লকলক করে' আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। কত রকমের কত রঙের শিখা! লাল নীল সবুজ হলুদ—শত শত ইন্দ্রধনু যেন শিখায় পরিণত হয়েছে। আর তাতে লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ উড়ে উড়ে পড়ছে এসে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

রমেন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তাকেও পুড়ে মরতে হবে। তা হোক। লাফিয়ে পড়ল সে।

লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। আগুন নিবে গেল।

তারপর অসংখ্য লোকের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল। সবাই বেঁচে উঠেছে, ওই যে হাবুল মন্টু আর গণেশও আসছে তার দিকে ছুটে।

"রমেন, রমেন, ওঠ, এখনও ঘুমুচ্ছিস্? বি-টিমের সঙ্গে আজকে যে ম্যাচ আমাদের, মনে নেই? ওঠ্, ওঠ্।"

হাবুলের ডাকেই রমেনের ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে মন্টু আর গণেশও দাঁড়িয়ে আছে।

স্বাধীনতা

"স্বাধীনতা মানে কি?"—পণ্ডিতমশায় জিজ্ঞাসা করলেন সুবলকে।

সুবল উত্তর দিলে—"নিজের অধীনতা।"

নিজের অধীনতা বলতে কি বোঝ তুমি?"

ঈষৎ মাথা চুলকে সুবল বললে—"মানে, নিজে আমি যা খুশি করব তারই অধিকার।"

"তোমার নিজের যদি খুশি হয় চুরি করব, ডাকাতি করব, মাস্টার ঠ্যাঙাব, পড়াশোনা করব না, সকলের অবাধ্য হ'ব—তাহলে এইসব করবার অধিকার তোমাকে দেওয়ার নামই স্বাধীনতা?"

"না সার!"

"তাহলে?"

সুবল চুপ করে রইল। পণ্ডিতমশাই একে একে সব ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ সদুত্তর দিতে পারলে না। সুবলই ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে, সে-ই যখন পারলে না তখন আর কে পারবে?

পণ্ডিতমশায় বললেন—"এখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এখন আমাদের ভাল করে' বুঝতে হবে কথাটার মানে কি! সুবল, তুমি ঠিকই বলেছ, কথায় কথায় মানে করলে স্বাধীনতা মানে নিজের অধীনতাই বোঝায়। 'নিজের' কথাটার বিশেষ অর্থ আছে একটা। নিজের বলতে কি বোঝায়? তোমাকে যদি দুটো আম দেওয়া হয়, একটা পচা আর একটা ভালো, আর যদি বলা হয় ওর মধ্যে একটা তুমি নিজের করে' নাও, তাহলে কোন্‌টা তুমি নেবে? ভালোটাই নেবে নিশ্চয়! পশুরাও চায় যেটা ভালো সেটা নিজের হোক। মানুষ পশুর চেয়ে অনেক বড়, তাই সে শুধু নিজের ভালো চায় না, নিজেদের

ভালো চায়। সকলের ভালো হোক এইটাই সভ্য মানুষের কাম্য এবং সকলের ভালো করবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে। যারা পরাধীন জাতি, তারা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা সাহস করে' একটা ভালো কথা পর্যন্ত বলতে পারে না, যদি সেটা শাসক জাতির স্বার্থ-বিরোধী হয়। তাই স্বাধীনতা যাদের থাকে না, ভালো হবার অধিকারই তাদের থাকে না, কারণ সকলের ভালো হোক—কোনও বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের এ অভিপ্রায় কখনও হতে পারে না। দেশের ভালো হোক, দশের ভালো হোক, সকলের ভালো হোক, এই-ই হলো স্বাধীনতার লক্ষ্য। যখন তোমরা আর একটু বড় হবে তখন বুঝতে পারবে আমাদের সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন, 'স্ব' মানে ভগবান, তাই স্বাধীনতা মানে ভগবানের অধীনতা, যা মঙ্গলময় তারই অধীনতা।"

পণ্ডিতমশায়ের কথা মন দিয়ে সবাই শুনল, কিন্তু তাঁর কথার সমস্তটা বুঝতে পারল না সবাই।

স্কুলের ছুটি হ'য়ে গেল। সুবল পণ্ডিতমশায়ের কথাগুলোই ভাবতে ভাবতে বাড়ি যাচ্ছিল। পণ্ডিতমশায় যা বললেন, তা যেন বড্ড বেশী ঘোরালো গোছের। ভগবান-টগবান এনে এমন একটা ব্যাপার করলেন যে ঠিক বোঝা গেল না সবটা। সে স্বাধীনতার একটা সোজা মানে খুঁজছিল মনে মনে।

একটু পরেই হঠাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল তার কাছে। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সুবলের মা বেড়াতে যাচ্ছিলেন একজনের বাড়িতে। দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হ'ন তাঁরা, তাঁদের বাড়িতে কার যেন অসুখ করেছে। বেরোবার আগে মা সুবলকে বললেন—"ওরে, ভাঁড়ার ঘরের তাকে দুটো আম আছে। যদি খিদে পায় তো তুই একটা নিস্ আর মনুকে একটা দিস্।"

মনুও তাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়—মা-মরা ছেলে—তাদের আশ্রিত।

মা চলে' গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খিদে পেয়ে গেল সুবলের। পড়ছিল, তড়াক করে' উঠে ভাঁড়ার ঘরে চলে' গেল সে। গিয়ে দেখলে দুটো আম রয়েছে বটে, কিন্তু একটা ভালো, আর একটা একটু পচা। পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে পড়ল। তিনি এই আমেরই উদাহরণ দিয়েছিলেন। যা ভালো সেটাকেই নিজের করে' নেওয়া উচিত এবং সেইটে নেবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। পচা আমটা মনুকে দিতে

'কিছুতেই মন সরছিল না তার। ওকে দিলে ও নেবে ; কারণ, ও আশ্রিত। কিন্তু সেটা দেওয়া কি উচিত ?

পচা আমটাই নিলে সে, ভালোটা মন্টুকে দিলে।

একটা অদ্ভুত আনন্দে সমস্ত মনটা ভরে' উঠল সুবলের। পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি সুবলের বাড়ির কাছে। এক ছুটে সে চলে গেল পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি।

পণ্ডিতমশায় শোওয়ার আয়োজন করছিলেন।

"পণ্ডিতমশায়, স্বাধীনতার আর একটা মানে খুঁজে পেয়েছি। যা করলে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায় তাই করবার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে।" সুবলের মুখ উদ্ভাসিত।

পণ্ডিতমশায় হেসে বললেন—"ঠিক বলেছ।"

ফুলদানীর একটি ফুল

জিনিসপত্র বাঁধাছাদা হচ্ছে, ট্রেনের আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকী, মনে মনে বেশ উত্তেজিত হ'য়ে আছি, ফুলদানীর কথা মনেও ছিল না, এমন সময় হঠাৎ কার্তিক এসে ঢুকল। হাতে তার ফুলদানী।

'এই যে বৌদি, যাচ্ছেন তাহলে, একেবারে রেডি—'

গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন—'ফুলদানীটা কিনলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ। আপনি সেদিন আমাদের ফুলদানীটা দেখে বললেন না, যে আমিও যাবার সময় এই রকম একটা কিনে নিয়ে যাব। আমি জগুর কাছে খবর পেয়েছি আপনি কিনতে পারেন নি, কিনতে পারতেনও না, যা ভিড়, তাই আমি বেরিয়ে কিনে ফেললাম। আয়োডিন আছে ?"

'আছে। কেন, আয়োডিন নিয়ে কি করবেন—'

'হাতীবাগানে যা ভিড়। পা-টা মাড়িয়ে দিলে একজন'।

'জুতো খুলুন দেখি—' জুতো খুলল কার্তিক।

'ইস, আঙ্গুলটা থেঁতলে গেছে! কী দরকার ছিল আপনার ভিড়ে গিয়ে ফুলদানী কেনবার! এঃ, কাপড়টাও ছিঁড়েছেন দেখছি—'

কার্তিক হে হে করে' হাসতে লাগল।

'ফুলদানীটা কোথায় নেবেন ? বাক্সের মধ্যে ?'

'না, বাক্স তো শাড়ি কাপড়ে ঠাসা ?'

'তাহলে—'

'ওই বালতিটার মধ্যে নিতে হবে। ওতেও তো জিনিসপত্র ভর্তি একেবারে।'

'আমি দিচ্ছি ঠিক ক'রে।'

বালতির মধ্যে নানা রকম খুঁটিনাটি বিচিত্র আকারের জিনিস। গৃহিণী সমস্ত দুপুর চেষ্টা করে' নানা কৌশলে ভরেছেন সেগুলি বালতিতে।

'আপনি আবার ওসব বার করবেন? তার চেয়ে দিন, হাতে করেই নিয়ে যাব ওটা।'

তারপরই সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল।

'এই তো খালি নতুন কমোডটা যাচ্ছে। ওর ভিতর কাপড় মুড়ে বসিয়ে দেওয়া যাক—'

'সেই ভালো।'

কার্তিকই একটা কাপড় দিয়ে মুড়ে কমোডের প্যানে ভালভাবে বসিয়ে দিলে সেটা। তারই দায় যেন।

বাড়ি পৌঁছে দেখি বাগানে নানারকম গোলাপ ফুল ফুটেছে। লাল, সাদা, গোলাপী, হলদে, বাদামি। রংয়ের হাট বসে' গেছে যেন। নতুন ফুলদানী আমার মেয়ে মহা উৎসাহে সাজাতে বসল।

বললাম, 'খাবার ঘরের টেবিলে রেখে আয়। আমি আসছি—'

খাবার ঘরের টেবিলের সামনে বসে ফুলদানীর দিকে চেয়ে আমি কিন্তু ভয় খেয়ে গেলাম। চোখে আমার হেমারেজ হ'ল না কি? হওয়া বিচিত্র নয়, আমি ডায়াবিটিক লোক, খাওয়া-দাওয়ার কোনও মানা মানি না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ফুলগুলোর দিকে। ফুলগুলোর মাঝখানে কালো মতন ওটা কি? কাউকে কিছু বললাম না। সোজা চলে গেলাম চোখের ডাক্তারের কাছে। সে ভাল করে' পরীক্ষা করে' বললে, 'না, চোখ ত আপনার ঠিক আছে।'

'তবে কালো মতো ওটা কি দেখলাম?'

চশমায় ময়লা ছিল বোধ হয়।'

বাড়ি ফিরে এসে চশমাটা ভাল করে' পরিষ্কার করে' আবার দেখলাম। কিছু পরিবর্তন হয় নি। গোলাপফুলগুলোর মাঝখানে ঠিক সেইরকম একটা কালো জিনিস রয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে' বসে' রইলাম। হঠাৎ সেই কালো জিনিসটা নড়ে' উঠল। আরে, এ যে কার্তিক! সেই টাক, সেই কালো রং, সেই টেবো গাল, আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

তার ওই কালো মুখখানা হঠাৎ গোলাপ ফুলের চেয়ে সুন্দর মনে হ'ল।

———

www.banglabooks.blogspot.com